ভ্রমর

মাসিক পত্র।

“সারাদানং ষট্পদবৎ”

প্রথম খণ্ড।

১২৮১ শাল।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১।০

সূচিপত্র।

—০○০—

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

১ম খণ্ড।] বৈশাখ ১২৮১। [১ সংখ্যা।

ভ্রমর।

আমরা, এক সুচতুর শিল্পকরকে ভ্রমরের একটি চিত্র খোদিত করিতে অনুরোধ করিলে তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে, তিনি আমাদিগকে চিত্রের একটি আদর্শ দেখাইলেন। দেখিলাম, যে এক পদ্ম, পদ্মপত্র সহিত শোভিত, তাহার উপর বসিয়া—এক মৌমাছি! আমরা শিল্পকরকে বলিলাম, "এযে মৌমাছি?" তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে না, এই ভ্রমর।" আমরা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে আসিলাম। আমরাও বোধ হয় শিল্পকরের অনুকারী। আমরা বলিয়াছিলাম, ভ্রমর প্রকাশ করিব—হয়ত, আমাদেরও ভ্রমর মৌমাছি হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে, ভরসা করি পাঠক, সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে যাইবেন।

বালিকারা উপকথা বলিয়া থাকে, এক রাজার দুয়া সুয়া দুই রাণী। দুয়া রাণী রাজসংসর্গে বঞ্চিতা—প্রণয় সুখের সাধ মিটাইবার জন্য আপন পর্ণকুটীরে কুলকাঁটা স্থাপন করিয়া, তাহাতে আপন অঞ্চল বাঁধাইয়া বলিতেছিল, "ছি রাজা!

ছাড়।” আমরা এই কুরূপ মৌমাছিকে বঙ্গোদ্যানে ছাড়িয়া দিয়া, সাধ মিটাইবার জন্য বলিতেছি, ভ্রমর, একবার গুণগুণ কর! এই কুসুমকিরীটী বৈশাখে নানা ফুলের পরিমলগুরু মন্দ সমীরণে আরোহণ করিয়া, ঘরে২ গুণ গুণ করিয়া আইস। যেখানে দেখিবে বঙ্গশোভা কামিনীকুসুম অধরে মধু, নয়নে বিষ লইয়া ফুটিয়া আছেন, সেইখানে গিয়া গুণ গুণ করিয়া তাঁহাদের গুণ বলিয়া আইস। যেখানে দেখিবে, বঙ্গদেশের মহিরুহগণ, বিষয় রৌদ্রে তপ্ত হইয়া, ফলভরে অবনত হইয়া, বিমনা হইয়া আছেন, সেইখানে গিয়া তাঁহাদের ছায়ায় উড়িয়া গুণ গুণ করিয়া, তাঁহাদের গুণ গাইয়া আসিবে। আর যখন দেখিবে, যে বঙ্গসমাজের কেতকী, ঘন প্রাবৃট্ মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে সাতপুরু চিকণ কাপড়ের ঘোমটা দিয়া, অথচ গ্রীবা উন্নত করিয়া সেই ঘোমটা ঠেলিয়া ঈষৎ কটাক্ষ ক্ষেপণ করিতে করিতে কণ্টকময় জঙ্গলরূপ ধর্ম্ম সমাজে বসিয়া কাহার ধ্যান করিতেছেন, তখন ভ্রমর! তুমি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিও না। দূর হইতে দুখানি পাখা জড় করিয়া নমস্কার করিয়া সে কেতকীসমাজ পরিত্যাগ করিও; নহিলে তোমার ঐ ঢল ঢল ঘন রুচিরঞ্জন কৃষ্ণকান্তি তাহার প্রচুর পরাগ স্পর্শে ধূষরিত হইবে, তাঁহার কাঁটায় তোমার ঐ সূক্ষ্ম পত্রময় পক্ষদ্বয় ছিন্নভিন্ন হইবে, এবং হয়ত ভ্রমর! তুমি তাহার তীব্র গন্ধে একেবারে অন্ধীভূত হইবে। তুমি সেখানে যাইও না। তুমি বঙ্গীয় সম্বাদপত্রিকারূপিণী মধুমক্ষিকার মত, কোথায় মধু, কোথায় মধু করিয়া নিয়ত অন্বেষণ করিয়া বেড়াইও না। যে মধু সঞ্চয়ের প্রয়াস করে, সে মধুর অন্বেষণে রত রহুক; তুমি মধুকর, মধুকরে মধুসঞ্চয় করে না; তুমি বঙ্গের মধুকর, ফুলে ফুলে ভ্রমিবে, তাহাতেই তুমি ভ্রমর, আর নিয়ত গুণ গুণ করিবে সেইটিই তোমার

গুণপনা। যে মধুমক্ষিকা সেই মধুচক্র করুক, তুমি কোন চক্রে থাকিও না, সঞ্চয়ী লোকেই চক্রে থাকে।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামেশ্বর শর্ম্মার পঁচিস বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। তিনি পিতাকে বড় ভাল বাসিতেন। রামেশ্বরের পিতা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা সমুদয় রামেশ্বর তাঁহার শ্রাদ্ধে ব্যয় করিলেন। পিতার স্বর্গার্থে যে যাহা পরামর্শ দিল, তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। আত্মীয় কুটুম্বগণ স্ব স্ব গৃহে গেল। রামেশ্বর তখন জানিলেন যে তাঁহার আর কিছুই নাই। পরিবারের ভরণ পোষণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহার ঘরে, যুবতী ভার্য্যা পার্ব্বতী; এবং তিন বৎসরের পুত্র আনন্দদুলাল। এক দিবস সকলেই উপবাসী রহিল। শিশু আহারের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল; সন্তানের ক্রন্দন দেখিয়া পার্ব্বতীও কাঁদিতে লাগিলেন। রামেশ্বর কিছু খাদ্য সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন, নিষ্ফল হইয়া রিক্তহস্তে আসিয়া দেখিলেন উভয়ে তাঁহার প্রতীক্ষায় দ্বারে বসিয়া আছে। দ্বারের কিঞ্চিদ্দূরে ব্রাহ্মণ ভোজনের শুষ্কপত্র, ভাঙ্গা হাড়ি প্রভৃতির স্তূপমধ্যে গ্রাম্য কুক্কুরেরা আহার অন্বেষণ করিতেছে; শিশু একাগ্রচিত্তে তাহাই দেখিতেছে। রামেশ্বরকে দেখিয়া শিশু দৌড়াইয়া আসিল; জিজ্ঞাসা করিল "বাবা! আমাল জন্যে কি এনেস?"—রামেশ্বরের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; দেখিয়া পার্ব্বতীর চক্ষু জলে পুরিল; শিশুর মুখপানে চাহিতে সেজল উছলিয়া পড়িল; তখনই আবার মুখ তুলিয়া

স্বামীর মুখ পানে চাহিতে, উভয়েই কাঁদিয়া উঠিলেন; বালক, উভয়ের মুখপ্রতি দুই একবার চাহিয়া শেষ কাঁদিয়া উঠিল। তিন জনে একত্রে অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু নিদ্রা গেল। এই সময় প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে; রামেশ্বর উঠিলেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চলিলেন। একস্থানে দেখিলেন, বালজ্যোৎস্নার আলোকে এক দীর্ঘিকাতীরে কতগুলি অল্পবয়স্ক বাবু, তেড়ি কাটা কোট গায়ে, কৌমুদীদীপ্ত স্বচ্ছ বারির উপর পয়সা নিক্ষেপ করিয়া "ছিনি মিনি" খেলিতেছে। রামেশ্বর তাহাদের নিকট গিয়া, যোড় হাত করিয়া, কাঁদিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে চারিটি পয়সা যাচ্ঞা করিল। বাবুরা উচ্চৈর্হাস্য করিলেন; একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটা, তোরে দিতে গেলাম কেন?" রামেশ্বর কাতর হইয়া বলিলেন, "আমি অন্নাভাবে সপরিবারে মারা যাই, আপনারা পয়সা জলে ফেলিয়া দিতেছেন।" বাবুরা বলিলেন, "আমাদের পয়সা আমরা জলে ফেলিব, তোর কি রে শালা?" এই বলিয়া ঘুষা তুলিয়া, একজন রামেশ্বরকে মারিতে গেলেন। রামেশ্বর, শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দূর গিয়া মনে ভাবিলেন, "এই বানর গুলাকে এক একটা চড় মারিয়া পয়সা কাড়িয়া লইতে পারিতাম—কেন লইলাম না?" ক্ষুধার জ্বালায় রামেশ্বরের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ লুপ্ত হইতেছিল।

রামেশ্বর গ্রামান্তরে গেলেন। তথায় এক বাটীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। গৃহ মধ্যে সকলে নিদ্রিত বোধ হইল; আনন্দদুলালের সেই ক্ষুধাপীড়িত, কাতর, শৈশবসুকুমার মুখ মনে পড়িল; পার্ব্বতীর রোদন মনে পড়িল; আপনার জঠর জ্বালা অসহ্য হইল; ক্রীড়াশীল বাবুদিগের নির্দ্দয় ব্যবহার মনে পড়িল। ভাবিলেন, আমি একা ধর্ম্ম পথে যাইব কেন? তখন রামেশ্বর, গৃহস্থের গৃহপ্রবেশ করিয়া পেটারা হইতে পয়সা চুরি করিলেন।

পেটারায় তিনটি টাকা আর আট আনা পয়সা ছিল; রামেশ্বর কেবল সেই আট আনা পয়সা লইয়া আসিলেন। গৃহস্থেরা তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

রামেশ্বর আসিতে আসিতে ভাবিলেন, পয়সা হইল, চাউল লবণ কোথায় পাই? অতএব তাহা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আর এক গ্রামে গেলেন। নিকটস্থ পাঁচ সাত গ্রামের মধ্যে কেবল সেই গ্রামে এক খানি দোকান ছিল। রামেশ্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দোকানিকে পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন; দোকানি স্থানান্তরে ছিল, অতএব কোন উত্তর পাইলেন না। অগত্যা তিনি দোকানের দ্বার মোচন করিয়া প্রবেশ করিলেন এবং রাত্রোপযোগী চাউল লবণ দাল সংগ্রহ করিয়া বস্ত্রাগ্রে তাহা দৃঢ়বদ্ধ করিলেন; তাহার উচিত মূল্য সেই স্থানে রাখিয়া বহির্গত হইলেন। পথে অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু কোন বিঘ্ন ঘটিল না; বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। পার্ব্বতী পাক করিল; রামেশ্বর ও শিশু খাইল; পার্ব্বতী খাইল না। অল্প সামগ্রী আসিয়াছে—পার্ব্বতী খাইলে পরদিনের জন্য কিছু থাকে না। পার্ব্বতী উপবাস করিয়া, গোপনে নিজাংশ স্বামী পুত্রের জন্য হাঁড়িতে তুলিয়া রাখিল। রামেশ্বর তাহা জানিতে পারিলেন না।

পরদিবস রামেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া, নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া, ভাতিপুর গ্রামে সপরিবারে গেলেন। এই গ্রাম তাহার জন্মভূমি হইতে দুই দিবসের পথ দূর। এখানে তাঁহাকে কেহই জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, অতএব ভাবিলেন এখানে উগ্রক্ষত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া অনায়াসে ইতর লোকের ন্যায় শারীরিক শ্রম দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবেন। পার্ব্বতীও বলিলেন, তিনি কোন ভদ্র সংসারে দাস্যবৃত্তি করি-

বেন। এই পরামর্শ করিয়া তথায় ভদ্রাসন বিক্রয়লব্ধ অর্থে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন; কিন্তু অপরিচিত বলিয়া রামেশ্বরের অদৃষ্টে দাসত্বও ঘটিল না। যেখানেই যান সেইখানেই জামিনের প্রস্তাব হয়। তাঁহাদের জামিন কে হইবে। নিজ গৃহবিক্রয়ে যে কয়েকটি টাকা আনিয়াছিলেন, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই অবস্থায় রামেশ্বর একদিন গ্রামের নায়েবের নিকট আপন দৈন্য জানাইয়া একটি পিয়াদাগিরি কর্ম্মের প্রার্থনা করিলেন। নায়েব বলিলেন "সে কর্ম্ম এক্ষণে খালি নাই কিন্তু আপাততঃ উপার্জ্জনের এক উপায় আছে। তোমার স্ত্রী আমার অন্দরে গত কল্য আসিয়া ছিলেন, আমি তাঁহাকে সে কথা বলিয়া ছিলাম; কিন্তু সে তাহা শুনিয়া বড় রাগিয়া উঠিল। তুমিও রাজি হইবে বোধ হয় না। সেসব কাজ তোমা হইতে হইবে না। অতএব আর তাহা তোমাকে বলা বৃথা।"

রামেশ্বর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "পেটের জ্বালায় আমার অসাধ্য কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের মতামত সকল বিষয়েই অগ্রাহ্য, অতএব আমাকে বলুন, আমি তাহা বিবেচনা করিব।"

নায়েব বলিলেন "তুমি শুনিয়া থাকিবে প্রায় দুইমাস হইল, এই গ্রামে একটি স্ত্রী হত্যা হইয়াছিল, কিন্তু কে হত্যা করিয়াছিল তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই। দারোগা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, আমিও বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। হত্যাকারীর স্থির না হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব রুষ্ট হইয়া আমাদিগের অমনোযোগ অনুভব করিয়া জমীদারের একসহস্র টাকা দণ্ড করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই গ্রামে আবার একটি চুরি হইয়া গিয়াছে; তাহারও এপর্য্যন্ত কোন উপায় হয় নাই। দারোগা একটি লোককে সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু সে পলাইয়াছে।

তাহার উদ্দেশ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, শীঘ্র যে পাওয়া যাইবে এমত সম্ভাবনা নাই। শীঘ্র এক জন অপরাধী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট না পাঠাইলে আবার জমীদারের দণ্ড হইবে, অথবা হয় ত তাঁহার জমীদারী যাইবে, অতএব আসামি সাজাইয়া একজনকে পাঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যে আসামি সাজিবে তাহার বিশেষ ভয় নাই। সামান্য পানপাত্র চুরি হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত ঊর্দ্ধসীমা একমাস কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে, অধিক নহে। কর্ম্মান্তরে বিদেশে গেলে কখন কখন একমাসের অধিক কাল পরিবার ছাড়িয়া থাকিতে হয়। ইহাও সেইরূপ; অধিকন্তু একমাস বিদেশে গিয়া দশ মাসের উপার্জ্জন হইবে। জমীদার বলিয়াছেন যে, যে আসামি হইয়া যাইবে, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা নগদ দিবেন। অতএব এই এক লাভের পন্থা আছে। আবার তুমি জেল হইতে অব্যাহতি পাইলেই তোমাকে এই সরকারে উপযুক্ত কর্ম্ম দিব।”

নায়েবের এই প্রস্তাব শুনিয়া রামেশ্বর নিজকৃত চুরি মনে করিয়া শিহরিলেন। ভাবিলেন, বুঝি বিধাতা নিশ্চিতই কারাগারই আমার কপালে লিখিয়াছেন, নহিলে সে দিন আমি সেই পেটারা হইতে পয়সা চুরি করিতাম না। সে পাপের ফল এক দিন আমাকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে—তবে দুদিন অগ্র পশ্চাতে কি আসিয়া যায়? কেনই বা আপন ইচ্ছায় জেল খাটিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিব? আপন ইচ্ছায় এ প্রায়শ্চিত্ত করিলে, দেবতা কি প্রসন্ন হইবেন না? যাই হউক, উপস্থিত অন্নাভাব নিবারণের উপায় ইহা অপেক্ষা আর কি হইবে?

রামেশ্বর উঠিয়া বলিলেন, “আমি সম্মত, আমায় পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দাও।” নায়েব তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া বলিলেন, “আর একটি কথা আছে। জেলায় যাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের

নিকট এই চুরি করা স্বীকার করিতে হইবে; একবার না করিলে আবার আমাকে মিথ্যা প্রমাণ যোজনা করিয়া পাঠাইতে হইবে।”

রামেশ্বর উঠান হইতে মাথা নাড়িয়া নায়েবের কথার উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বাটী পৌঁছিয়া পঞ্চাশ টাকা গণিয়া স্ত্রীর হাতে দিলেন। পার্ব্বতী টাকা হস্তে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এ কোথায় পেলে” রামেশ্বর সবিস্তারে সকল বলিলেন।

পার্ব্বতী উহা শুনিবামাত্র টাকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বামীর পাদমূলে আসিয়া পদদ্বয় ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখে সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, “এমন কর্ম্ম কখন করিও না, ছার টাকার জন্য সাধ করিয়া কয়েদী হইও না, আমি ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব; তুমি এমন কর্ম্ম করিও না, এই বিদেশে আমায় রাখিয়া তুমি যাইও না, আমার নিমিত্ত না ভাব, ছেলের মুখ পানে চাও, ছেলের আর কে আছে? ছেলের রোগ হলে আমি কোথা যাব, কাহার দ্বারে দাঁড়াব?” এই বলিতে বলিতে পতিবক্ষে মুখ লুকাইয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিলেন। এইসময়ে শিশু দ্বারের নিকট কর্দ্দম লইয়া খেলা করিতেছিল, মার ক্রন্দনশব্দ তাহার কর্ণে গেল, ব্যস্ত হইয়া কর্দ্দম আপন অঙ্গে মুছিতে মুছিতে উভয়ের প্রতি চাহিতে লাগিল; শেষে “বাবা টুই মাকে মাল্লি?” এই বলিয়া মার অঙ্গের উপর ঝাঁপ দিয়া শত শত মুখচুম্বন করিল, আর বলিতে লাগিল, “মা টুমি কেঁডো না বাবাকে খুব মালবো অকুন।” অমনি পার্ব্বতী সকল ভুলিয়া গেলেন, পুত্রকে কোলে লইয়া বলিলেন, “কৈ ওঁরে মার আগে।” শিশু কোল হইতে উঠিয়া “এই মেলেসি!” বলিয়া ক্ষুদ্র হাতে বাপের পিটে মারিল, আবার তখনই গলা ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। পার্ব্বতী শিখাইয়া দিতে লাগিল, “আবার মার।”

শিশু তৎক্ষণাৎ "আবাল মেলেসি" বলিয়া আবার সেই কোমল অমৃত মাখা কর পিতার পৃষ্ঠে ফেলিল। এইরূপ পবিত্র সুখে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত হইলে রামেশ্বর উঠিয়া টাকা গুলিন একত্রিত করিয়া শয্যার উপর রাখিয়া চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতী সন্তান লইয়া অন্যমনে রহিলেন।

রামেশ্বর নায়েবের নিকট গিয়া বলিলেন, মহাশয় "আমায় চালান দিতে আর বড় বিলম্ব করিবেন না। বিলম্ব হইলে বুঝি আমার যাওয়ার ব্যাঘাত হইবে। স্ত্রীর কাতরতা আর একবার দেখিতে গেলে আমার বোধাবোধ থাকিবে না, অতএব যাহা হয় করুন, আমি এখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছি। নায়েব ব্যস্ত হইয়া দারোগাকে সংবাদ পাঠাইলেন। দণ্ডেক কালের মধ্যেই পদাতিকগণ রামেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া জেলায় লইয়া চলিল। তিনি আর স্ত্রী পুত্রকে দেখিয়া আসিলেন না।

তখন প্রথম রামেশ্বরের স্মরণ হইল এ যে জেলে যাইতেছি! জেল! যেখানে ব্রহ্মঘ্ন, নারীঘ্ন, গোঘাতক, পাপাত্মারা থাকে;—যেখানে ডাকাত, রাহাজান, ঠগ, ইহারা বন্ধু—সেই জেলে! যেখানে মানুষকে গোরু করিয়া ঘানি গাছে জোড়ে, সেই জেলে! যেখানে জাতি নাই, ব্রাহ্মণ মুসলমান একপংক্তিতে খায়, হাড়ি ডোমের সঙ্গে এক শয্যায় শুইতে হয়, সেই জেলে! যেখানে বিচার নাই, তৎপরিবর্ত্তে কেবল বেত্রাঘাত আছে, সেই জেলে! কি অপরাধে? অপরাধ, খাইতে পাই না—অপরাধ স্ত্রী পুত্রের অন্নাভাবে মৃত্যু দেখিতে পারি না—অপরাধ।

এমন সময়ে শূন্য মার্গ বিদীর্ণ করিয়া, বৃক্ষ লতা শাখা পত্র পুষ্পবিশিষ্ট গ্রাম্য প্রদেশ কম্পিত করিয়া, তীব্র করুণ মর্ম্মভেদী রোদন ধ্বনি রামেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, যে পার্ব্বতী প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে; কাঁদিয়া

বলিতেছে "একবার দাঁড়াও! তোমায় দেখি।" রামেশ্বর আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, দৌড়াইয়া ব্রাহ্মণীর নিকট আসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পদাতিকেরা আসিতে দিল না, ধাক্কা মারিয়া লইয়া চলিল। রামেশ্বর আর একবার ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন কয়েকটি গ্রামবাসী আসিয়া পার্ব্বতীকে ধরিয়া রাখিয়াছে, পার্ব্বতী ধূলায় পড়িয়া চীৎকার করিতেছে; আর তাহার কেশরাশি ধূলায় ধূষরিত হইতেছে। রামেশ্বর আর দেখিতে পাইলেন না; ক্রমে দূরতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল; বায়ুসঙ্গে পত্নীর ক্রন্দনধ্বনি মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিল। তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন সাগর উছলিতেছে, জগৎ কাঁদিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুলিসের পদাতিকগণ রামেশ্বরকে লইয়া গেলে পর রাত্রে দারোগা আর নায়েব উভয়ে আহারান্তে একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমত সময় একজন দাসী সংবাদ দিল যে রামেশ্বরের স্ত্রী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে। এক্ষণে যন্ত্রণা যে সহ্য করিতে পারিবে এমত বোধ হইতেছে। সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া আপনিও শুইয়াছে, কিন্তু এখনও ধীরে ধীরে কাঁদিতেছে।

নায়েব বলিলেন, "তাহার নিকট অদ্য যাহার থাকিবার কথা ছিল সে স্ত্রীলোকটি এখনও যায় নাই?" দাসী উত্তর করিল "সে সেখানে আছে, আমিও এপর্য্যন্ত ছিলাম। এইমাত্র আসিতেছি।"

দাসী এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে দারোগা বলিলেন। "যেরূপ শুনিয়াছি তাহাতে বোধ হয় আসামি পলাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া থাকিবে। একান্ত না পলাইতে পারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আর একরার করিবার সম্ভাবনা নাই।" নায়েব

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এক্ষণে উপায়?" দারোগা বলিলেন যে "আসামি একান্ত স্বীকার না করে তবে অন্য প্রমাণ দিতে হইবে। আসামীর ঘর হইতে চুরির মাল বাহির করিতে হইবে। অতএব পূর্ব্বাহ্ণে তাহা পুঁতিয়া রাখিয়া আসিতে হইবে। একটা জলপাত্র এই সময়ে আপনি স্বয়ং যাইয়া উহার স্ত্রীকে সম্মত করিয়া রাখিয়া আসুন।" নায়েব বলিলেন "অদ্য রাত্র হইয়াছে; কল্য প্রাতে তাহা করা যাইবে।" দারোগা বলিলেন, "তাহা কদাচ হইবে না, প্রাতে অন্যলোক দেখিলে সকল কথা রাষ্ট্র হইয়া যাইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে যাও।" নায়েব অগত্যা যাইতে স্বীকার করিলেন।

রামেশ্বরের অদৃষ্টশৃঙ্খল, চারিদিগ্ হইতে রামেশ্বরকে আঁটিয়া ধরিতেছিল। গভীর রাত্রে রামেশ্বর পদাতিকদিগের নিকট হইতে পলাইলেন, পাছে কেহ জানিতে পারে এই ভয়ে সংগোপনে আসিয়া গৃহের নিকট এক বৃক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। এইসময়ে পূর্ব্বদিগ্ হইতে এক ব্যক্তি আসিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া রামেশ্বর লুকাইয়া থাকিয়া, তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, চিনিলেন যে সে ব্যক্তি নায়েব। অতএব ভাবিলেন এই সময় নায়েবের নিকট গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া টাকা ফিরাইয়া দিই। স্ত্রীর সুখসাধন নিমিত্ত এই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদি তাহারই কষ্ট হইল তবে আর টাকায় প্রয়োজন কি। এই ভাবিতেছিলেন, এমত সময় দেখিলেন যে নায়েব তাঁহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। তখনও পার্ব্বতী অতি মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল। প্রতিবাসিগণ বলিল "ওগো একটু নিদ্রা যাও নতুবা পীড়া হইবে।" এই বলিবামাত্র পার্ব্বতী আরো অধিক কাঁদিয়া উঠিলেন। নায়েব দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া বলিল,

"মা একবার দ্বার খুলিয়া দাও, আমি তোমার স্বামীর কোন সংবাদ আনিয়াছি।" যেখানে, বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া রামেশ্বর সকল দেখিতেছিলেন, সেখান হইতে এসকল কথাবার্ত্তা কিছুই শুনা যাইতেছিল না—পার্ব্বতীর অনুচ্চ রোদন শব্দও শুনা যাইতেছিল না। পার্ব্বতী নায়েবের কথা শুনিবামাত্র দ্রুতবেগে দ্বার খুলিয়া দিলেন, ভালমন্দ কিছুই ভাবিলেন না। নায়েব গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "অনেক কথা আছে। প্রথমে উঠিয়া দ্বাররুদ্ধ কর, নতুবা কে শুনিতে পাইবে।" রামেশ্বর দূরহইতে দেখিলেন যে নায়েব দ্বারে আসিয়া দ্বার নাড়িতে লাগিল, অস্পষ্টস্বরে পার্ব্বতীকে ডাকিয়া কি দুইএকটি কথা বলিল, তাঁহার নিশ্বাস খরতর বহিতে লাগিল। আবার দেখিলেন অবিলম্বে পার্ব্বতী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, নায়েব গৃহে প্রবেশ করিলে আবার দ্বার রুদ্ধ হইল। রামেশ্বর মনে করিলেন তাঁহার বুঝিতে আর কিছুই বাঁকি রহিল না। ভাবিলেন, এই নিমিত্ত নায়েব আমাকে কৌশল করিয়া দারোগার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। অতএব ইহার প্রতিফল দিব, এই বলিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদের কথা বার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাইলেন। একবার ভাবিলেন, কি কথা হইতেছে শুনি; অমনি আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারে পদাঘাত করিলেন। গৃহাভ্যন্তর নিস্তব্ধ হইল। তখন মর্ম্ম যন্ত্রণায় একপ্রকার রুদ্ধ-স্বরে বলিলেন, "আমি আসিয়াছি, তুমি যাহার জন্য এত কাঁদিতেছিলে, সেই আমি আসিয়াছি—তোমার উপপতি তোমার ঘরে আছে, এখন আমি চলিলাম।" পার্ব্বতী এই স্বর শুনিল, আহ্লাদে কথা বুঝিতে পারিল না, উন্মত্ত হইয়া বহির্গত হইল। বহির্গত হইয়া প্রেমপূরিত স্বরে ডাকিতে লাগিল। রামেশ্বর বিস্মিত হইলেন। আর কিছুই না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পার্ব্বতী দ্বার খুলিয়া স্বামীকে না দেখিয়া ডাকিতে ডাকিতে উত্তর না পাইয়া, শেষে কাঁদিতে লাগিল।

রামেশ্বর আর কোন উত্তর না দিয়া ভাবিলেন অন্যাকে আর কষ্ট দিব না, আপনি আর কষ্ট পাইব না, এই ঘৃণিত পৃথিবী ত্যাগ করিব। এই সিদ্ধান্ত করিয়া চলিলেন। অপরাহ্নে যে ক্রন্দনধ্বনি মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই শব্দ পৈশাচিক বোধ হইতে লাগিল।

রামেশ্বর কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিলেন পদাতিকগণ ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদের সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, "আমাকে বন্ধন কর আমি আসিয়াছি।" রামেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয় পাইল। বন্ধন করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। তিনি বলিলেন "পরিবার দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহাই গিয়াছিলাম। এখন চল তোমাদের ভয় নাই। আমি নিজে আসিয়া ধরা দিয়াছি, তাহাই তোমাদের দারোগা আমাকে চালান দিতে পারিয়াছেন, নতুবা তাঁহার সাধ্য হইত না। সেদিবস খুন করিয়াছিলাম, আমি ধরা দিই নাই বলিয়া কেহ সন্ধান পায় নাই।"

ইহা শুনিয়া জমাদ্দার অতি আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল "সে খুন কি তুমি করিয়াছিলে?" রামেশ্বর উত্তর করিল, "হাঁ আমিই সে খুন করিয়াছি।" জমাদ্দার আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আদালতে ইহা স্বীকার করিতে পারিবে?" রামেশ্বর বলিল "অবশ্য স্বীকার করিব কাহারে ভয়?"

আর কেহ কোন কথা বলিল না, সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পর দিবস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনীত হইয়া রামে-

শ্বর উচ্চাসনে দাঁড়াইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি সেই খুনি মামলার একরারি আসামি?" রামেশ্বর "হাঁ" বলিয়া সেলাম করিলেন। তখন তাঁহার আন্তরিক যন্ত্রণা বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, কোনরূপে এ দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল, এই বিবেচনায় হত্যাকারী বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। জমাদ্দার আনুষঙ্গিক প্রমাণ যোগাড় করিয়া দিলেন। রামেশ্বর, দাওরা সোপর্দ্দ হইলেন। দাওরার বিচারে তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। কিছু দিন পরে নিজামত আদালত দণ্ড কমাইয়া দিলেন। তখন পিনল কোড ছিল না; বিশ বৎসরের নিমিত্ত রামেশ্বর দ্বীপান্তরে গেলেন।

এদিগে পার্ব্বতী, একবার স্বামীর কথার শব্দ শুনিয়া, আর উত্তর না পাইয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় তাহার সন্ধানে বনে বনে ছুটিতে লাগিল। কোথাও স্বামীর সাক্ষাৎ পাইল না, কত ডাকিল কোন উত্তর পাইল না। কত কাঁদিল, কেহ তাঁহাকে শান্ত করিল না। শেষে পদ্মা নদীর ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তখন হঠাৎ মনে পড়িল যে রামেশ্বর যখন চলিয়া যান, তখন তাঁহার কথায় কি একটি শব্দ ছিল—অতি নিষ্ঠুর অতি ভয়ঙ্কর, একটি কথা ছিল—পার্ব্বতী তখন আহ্লাদে তাহাতে কাণ দেয় নাই—তখন রামেশ্বরের কথার অর্থ বুঝিতে পারে নাই। এখন সেই কথাটি মনে পড়িল—এখন তাহার অর্থ বুঝিল—এখন বুঝিল, রামেশ্বর কেন পলাইয়াছে। বুঝিল তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, বুঝিল এসংসারে আর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তখন তাহার চক্ষে আকাশ, নক্ষত্র, জল সকলই আঁধার হইয়া আসিল। নদীজলের একটি শব্দ হইল; জলে তরঙ্গ উঠিল, ক্রমে মিলাইয়া গেল, শেষ সকল স্তব্ধ হইল।

পার্ব্বতী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেখানে আর নাই। পার্ব্বতী জলমগ্না হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই ঘোরনাদী সমুদ্রের অনন্ত বজ্রগম্ভীর কল্লোল শুনিতে শুনিতে বিশ বৎসর! এই বালুকাময় উপকূলারূঢ় নারিকেল বৃক্ষের সঙ্কীর্ণ ছায়ায়, কোদালি হাতে, বিশ্রাম করিতে করিতে বিশবৎসর! এই সাগরপ্রান্তব্যাপী ফেণবিকীর্ণ ধূমমধ্যে আনন্দ দুলালের হাসিভরা মুখের অন্বেষণ করিতে করিতে বিশবৎসর! স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত রামেশ্বর মনে করিয়াছিল, মরিব।—মরিতে পারিল না—বিশবৎসরের যন্ত্রণা ভোগ করিতে আসিল। আমরা মনে করি, এই করিব, আর একজন করেন আর। আমাদিগের কার্য্য, দৃষ্ট, তাঁহার কার্য্য, অদৃষ্ট!

যখন, বিশ্বাসঘাতিনীর কথা মনে করিয়া, রামেশ্বর মরিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ত আনন্দদুলালকে মনে পড়ে নাই। এখন দিবারাত্রি, এই নির্ব্বাসিতের বাসদ্বীপে, আনন্দদুলালের অকৃত্রিম, সরল, হাসিভরা মুখ, তাহার আধ২ কথা, তাহার খেলা মনে পড়িতে লাগিল। যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া, মৃদু মৃদু ডাকে, রামেশ্বর ভাবেন, আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে। যখন দূরে অস্পষ্টলক্ষ্য একটি তরঙ্গ উচু হইয়া নাচে, রামেশ্বর মনে করেন, আনন্দদুলাল নাচিতেছে। রামেশ্বর মনে করিয়াছিলেন, যে তিনি বিশ বৎসর বাঁচিবেন না—কিন্তু বিশ বৎসর বাঁচিলেন। কাল পূর্ণ হইলে, স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ভাতিপুরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সে কুটীর নাই—তাঁহার পত্নী নাই, কই আনন্দদুলাল ত নাই! কেহ তাহাদের কথা কিছু বলিতে

পারিল না। রামেশ্বর! রামেশ্বর কে? রামেশ্বরকে কেহ চেনে না।

কয়েক দিন সন্তানের নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমিলেন। এক দিবস রামেশ্বর হাটে যাইবার পথে বসিয়া থাকিলেন; ভাবিলেন, হয়ত তাঁহার সন্তান অদ্য হাট করিতে আসিবে; রামেশ্বর যুবা পথিক মাত্রই সকলকে অতৃপ্ত লোচনে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়া, রামেশ্বর শিহরিলেন; স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া বোধ হইল সে বেশ্যা; আকার দেখিয়া, রামেশ্বরের বোধ হইল সে পার্ব্বতী! রামেশ্বর যখন দ্বীপান্তরে যান, তখন পার্ব্বতীর বয়স বিশ বৎসর, এক্ষণে তাহার বয়স চাল্লিশ হওয়ার কথা; ইহার সেই বয়স। যাহাকে বিশ বৎসর বয়সের পর আর দেখি নাই, তাহাকে চল্লিশ বৎসর বয়সে সহজে চেনা যায় না। যে পার্ব্বতীকে, রামেশ্বর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, এ সে পার্ব্বতী নহে বটে, কিন্তু রামেশ্বর মনে বুঝিলেন যে, যে বৈষদৃশ্য দেখা যাইতেছে, তাহা বয়োপরিবর্ত্তনে ঘটিয়াছে। বেশ্যা রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিয়া শুষ্ক শ্বেত ফুলের মালা গলায় দিয়া তামাক খাইতে খাইতে এক জন মুসলমানের সহিত কথা কহিতেছে; দেখিবা মাত্র রামেশ্বর তাহার নিকট গিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার পুত্র কোথায়?" বেশ্যা আকাশমুখী হইয়া হাসিয়া উত্তর করিল "কে তোর, ছেলে?" রামেশ্বর বলিলেন "আনন্দ দুলাল।" নটী বলিল "মরণ আর কি! তোমার কি দড়ি কলসী যোটে না?" রামেশ্বর বলিলেন, "শীঘ্র যুটিবে; এক্ষণে আমায় বল আনন্দদুলালকে কোথায় পাঠাইয়াছিস্?" বেশ্যা উত্তর করিল "চুলায় পাঠাইয়াছি। নদীর ঘাটে তারে পুতিয়া আসিয়াছি। তাহার ওলাউঠা হইয়াছিল। সে গিয়াছে, এক্ষণে তুমিও যাও।" রামেশ্বর আর

সহ্য করিতে পারিলেন না; জোরে তাহার বক্ষে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

গেলেন কোথায়? কোথায় যাইতেছিলেন তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। দ্বীপান্তরে বসিয়া এই পুত্রের মুখ ভাবিতেন। কবে আবার তারে দেখিবেন, বসিয়া বসিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেন। এই আশা এ পৃথিবীর এক মাত্র গ্রন্থি ছিল। এক্ষণে সে গ্রন্থি ছিন্ন হইল। এক্ষণে আর কোথায় যাইবেন? অথচ গেলেন।

পথে দেখিলেন, আর এক জন স্ত্রীলোক একটি ছেলে কোলে করিয়া লইয়া যাইতেছে। রামেশ্বর, হঠাৎ তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া, তাহার ক্রোড় হইতে ছেলে কাড়িয়া লইয়া নামাইয়া দিলেন। স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। রামেশ্বর বলিলেন, "তোরা রাক্ষসীর জাত! ছেলে মারিয়া ফেলিবি—ছেলে ছেড়ে দে।"

রামেশ্বর সমস্ত দিন পথে পথে বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইলেন। রাত্রে বড় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। সম্মুখে এক দোকান দেখিলেন; দোকানি ঝাঁপ ফেলিয়া শুইয়া আছে। রামেশ্বর দোকানের ঝাঁপ ভাঙ্গিয়া, প্রবেশ করিয়া সম্মুখে যাহা পাইলেন, খাইতে আরম্ভ করিলেন। দোকানি উঠিয়া গালি পাড়িতে আরম্ভ করিল। রামেশ্বর, দোকানির গলদেশে হস্ত দিয়া দোকানের বাহির করিয়া দিলেন।

দোকানি ফাঁড়ির বরকন্দাজ ডাকিয়া আনিল; রামেশ্বর বরকন্দাজের লাঠি কাড়িয়া তাহার মাথায় মারিলেন; বরকন্দাজের মাথা ফাটিয়া গেল।

শীঘ্র রটিল, এক জন প্রসিদ্ধ দায়মালী, পিলো পিনাং হইতে ফিরিয়া আসিয়া, দেশ লুঠ করিতেছে, যাকে পাইতেছে, তাকে

মারিতেছে। পুলিষ শশব্যস্ত হইল; মাজিষ্ট্রেট রামেশ্বরের গ্রেপ্তারির জন্য দুই শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। রামেশ্বর দিন কত লুঠিয়া খাইয়া, মানুষ ঠেঙ্গাইয়া, লুকাইয়া থাকিয়া দিনযাপন করিল। সকলে বন্য পশুর ন্যায় তাহাকে তাড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যত বদমাস, ডাকাইত, তাহার প্রতাপ শুনিয়া, তাহার চারি পাশে জমিল। তখন রামেশ্বর ডাকাতের সর্দ্দার হইয়া, মনুষ্য জাতির উপর ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ তাহাকে ধরিতে পারিল না; কিন্তু একবার প্রায় ধরা পড়িয়াছিলেন। তিনি স্বদলে, বহু দূরে, এক ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন। গৃহ রক্ষকেরা সতর্ক, এবং বলবান্; রামেশ্বর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে বহিয়া আনিয়া গ্রামান্তরে এক জঙ্গলে ফেলিয়া গেল।

সেই গ্রামের লোক, পর দিন প্রাতে সভয়ে দেখিল, যে একজন মৃতপ্রায়, আহত ব্যক্তি বনে পড়িয়া আছে। তাহারা পুলিষে সম্বাদ দিতে যাইতেছিল। একজন তাহার নিকটস্থ নগর হইতে কোন ধনিব্যক্তির চিকিৎসা করিতে, সেই দিন সেই গ্রামে আসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা পশ্চাৎ পুলিষে সম্বাদ দিও; কিন্তু ও মুমূর্ষু। আমি আগে উহার চিকিৎসা করিয়া বাঁচাই; এক্ষণে উহাকে পুলিষে লইয়া গেলে, উহার মৃত্যু হইবে।" লোকে ডাক্তারের কথা শুনিল, পুলিষে তখন সম্বাদ দিল না। ডাক্তার, তৎক্ষণেই তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া, তাহার জীবন দান করিলেন। রামেশ্বরের উত্থান শক্তি হইলেই, সে ডাক্তারের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া পুলিষের হাত এড়াইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামু সর্দ্দারের ভয়ে দেশ কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু আনন্দ দুলালের শোক রামু ভুলিল না। শেষোক্ত ঘটনার চারি বৎসর পরে, একদিন রামু বা রামেশ্বর দলবল সঙ্গে এক ডাকাইতিতে যাইতে ছিল। রাত্র প্রায় দুই প্রহর। প্রান্তরে, বৃক্ষাগ্রে, নদী জলে চন্দ্র কিরণ কাঁপিতেছে। এক খানি পাল্কি ধীরে ধীরে নদীর ধার দিয়া যাইতেছে। পালকির মধ্যে বাবু শয়ন করিয়া আছেন। পাল্কিতে শয়ন করিয়া বাবু অন্যমনস্কে নানা বিষয় ভাবিতেছিলেন। গৃহিণী, কন্যা, ইটের পাঁজা, নূতন বাগান; নূতন বাগানের কেবলা মালীর দোরঙ্গা দাড়ী, তাহার মালিনীর খাঁদা নাক; তাঁহার চিন্তার ভাগী হইল। বাবু এই রূপ ভাবিতেছেন এমত সময় হঠাৎ পাল্কি দুলিয়া উঠিল। দুই এক পদ হটিল, শেষ ভূমিতে নামিল। বাবু পাল্কি হইতে মুখ বাহির করিলেন। শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন প্রায় ২৫।৩০টি তরবারি ফলকে চন্দ্রকিরণ জ্বলিতেছে এবং যাহাদের হস্তে সেই তরবারি ছিল তাহারা গম্ভীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। বাবু তখন সকল বুঝিলেন। দস্যুরা পাল্কির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে একজন হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক চুল ধরিয়া বাবুকে বাহির করিল। আর একজন মাথা সমান হস্ত তুলিয়া সড়কি সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতেছিল, এমত সময় রামেশ্বর সেই সড়কির ফলক ধরিয়া বাবুর প্রাণ রক্ষা করিল। এবং সকলকে বলিল "তোমরা একটু অপেক্ষা কর আমি একবার বিশেষ করিয়া দেখি, এই ব্যক্তিকে বুঝি কোথায় দেখিয়াছি।" যে সড়কি নিক্ষেপ করিতেছিল সে ক্রুদ্ধ ভাবে উত্তর করিল "তুমি সকলকেই দেখিয়াছ! সকলেই তোমার

আত্মীয় কুটুম্ব, তুমি একটু সরিয়া দাঁড়াও আমরা বাবুর পরিচয় লই।" রামেশ্বর তখন দর্পে তরবারি ঘুরাইয়া বলিলেন "যা সকলে তফাৎ যা, নহিলে কে পারিস, হাতিয়ার লইয়া এগো।" এই কথা শুনিয়া সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। তখন রামেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল "বাবু আপনি কি ডাক্তার?" বাবু বলিয়া উঠিলেন "আমি ডাক্তার। আমায় বাঁচাও আমি চিরকাল তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব।"

রামেশ্বর বলিল, "কোন ভয় নাই, আমিই তোমার ক্রীত দাস।" এই বলিয়া অন্য দস্যুদিগকে ডাকিয়া কি বলিল; তাহার অমত দেখিয়া শেষ যে উদ্দেশে তাহারা যেখানে যাইতেছিল, সেই দিগে চলিয়া গেল। তখন ডাক্তার বাবু দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে তুমি আমাকে চিনিলে আর কেনই বা আমাকে রক্ষা করিলে, ইহা সবিশেষ জানিতে অমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

দস্যু বলিল "কয়েক বৎসর হইল আমি জখম হইয়া এক জঙ্গলে পড়িয়াছিলাম—আপনি আমাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া, প্রাণদান করিয়াছিলেন। গ্রাম্য লোকের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, পুলিষে দেন নাই। আমি আপনার নিকট চিরকাল বিকাইয়া আছি। চলুন আমি আপনাকে ঘাঁটি পার করিয়া রাখিয়া আসি।"

ডাক্তার বাবু দস্যুর এরূপ কৃতজ্ঞতা দেখিয়া বলিলেন. "তুমি স্বভাবতঃ মহাত্মা—কেন এ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ?"

রামেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। দেখিয়া, ডাক্তার বাবু বুঝিলেন, এ ব্যক্তি কোন গুরুতর মনোদুঃখ পাইয়া দস্যু হইয়াছে—চেষ্টা করিলে ইহাকে কুপথ পরিত্যাগ করাণ যায়। মনে ভাবিলেন, এ আমার প্রাণরক্ষা

করিয়াছে—ইহার উদ্ধারের উপায় করা আমার কর্ত্তব্য। তখন ডাক্তারবাবু রামেশ্বরকে বলিলেন, "তুমি কে? কেন তোমার এ দস্যুবৃত্তি ঘটিয়াছে? তোমার বৃত্তান্ত জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমাকে পরিচয় দিয়া পরিতৃপ্ত কর। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"— দস্যু বলিল, "তুমিও একবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, অতএব তোমার দ্বারা যদি এক্ষণে সেই জীবনের কোন বিঘ্ন হয়, তাহাতেও আমার আক্ষেপ নাই।" এই বলিয়া আপনার পূর্ব্ব পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। শেষ চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "যদি আমার সন্তান জীবিত থাকিত, যদি তাহারে আর দেখিতে পাইতাম!" এই বলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। আবার তাহার চক্ষু দিয়া অজস্র জলধারা পড়িতে লাগিল। ডাক্তারও তাহার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, চক্ষের জল মুছিয়া ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন,

"আমি সেই ভাতিগ্রাম চিনি। সেখানে আমি চিকিৎসা করিতে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সবিশেষ আমি সেখানকার নায়েব ও অন্যান্য লোকের মুখে শুনিয়াছি। আপনার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ! সেইজন্য আপনি ভয়ঙ্কর ভ্রমে পতিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া দ্বীপান্তরে গিয়াছিলেন।

রামেশ্বর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সে কি?" ডাক্তার বলিলেন, "আপনি হাটের পথে যে বেশ্যাকে দেখিয়া পার্ব্বতী মনে করিয়াছিলেন, সে পার্ব্বতী নহে।"

রামেশ্বর বলিল, "না হউক—সমানই কথা। সে পাপিষ্ঠাও কোথায় বেশ্যাবেশে কাল কাটাইতেছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা না। তিনি আপনার শোকে পদ্মার জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।"

রামেশ্বর এ কথায় অশ্রদ্ধা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

যে প্রকারে হউক, ডাক্তার বাবু প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। নায়েব ও দারোগার পরামর্শ হইতে, পার্ব্বতীর পদ্মায় নিমজ্জন পর্য্যন্ত, প্রকৃত কথা রামেশ্বরের নিকট সবিস্তারে বলিলেন। শুনিয়া, রামেশ্বর আপন যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া, ডাক্তার বাবুর হাতে জড়াইয়া দিয়া, বলিলেন, "আমাকে প্রতারণা করিও না—শপথ করিয়া বল, এ কথা কি সত্য! মিথ্যা বল, তবে ব্রহ্ম হত্যার পাপী হইবে,—এসকল কথা সত্য?"

ডাক্তার বলিলেন, "এ সকল কথাই সত্য।"

তখন রামেশ্বর ধীরে ধীরে সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল কোমল শষ্পশোভিত তীরভূমিতে উপবেশন করিলেন। দুই করে মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন। ক্রমে তাঁহার দেহ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—ক্ষণকাল পরে রামেশ্বর, ভূমিতে লুটাইয়া, "পার্ব্বতি! পার্ব্বতি!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া ডাক্তার বাবু, তাঁহাকে শান্ত্বনা করিয়া, হাত ধরিয়া উঠাইলেন, বলিলেন,

"আপনি কাঁদিবেন না। এই দুঃখের সময়ে, আপনাকে আমি একটি সুসম্বাদ দিব। আপনার পুত্র মরে নাই।"

রামেশ্বর বিদ্যুদ্বৎ বেগে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার দুলাল জীবিত আছে? শীঘ্রবল সে আমার,কোথায়?"

"তোমার পুত্র তোমার পাদমূলে" এই বলিয়া ডাক্তার বাবু রামেশ্বরের পদতলে পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামেশ্বর প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না; ক্রমে বুঝিল। দুই হস্তে সন্তানের মুখ তুলিয়া দেখিতে লাগিল; চক্ষের জলে

কিছুই দেখিতে পাইল না; তখন সন্তানের মস্তক বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "সত্যই এই আমার আনন্দদুলাল।" ক্ষণেক বিলম্বে পিতার বক্ষ হইতে মাথা তুলিয়া সন্তান বলিলেন, "আপনি এই পাল্কিতে চড়িয়া আমার গৃহে চলুন, কি প্রকারে আমি প্রতিপালিত হইলাম, এবং লেখাপড়া শিখিলাম তাহার বিস্তারিত পরিচয় দিব।"

রামেশ্বর বুঝিলেন, তিনি এক্ষণে পুত্রের সঙ্গে গেলে পুত্রকে পদব্রজে যাইতে হইবে। অতএব বলিলেন,

"তুমি আগে চল। আমাকে তোমার বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া যাও, আমি কাল প্রাতে পৌঁছিব।" আনন্দদুলাল বিশেষ অনুরোধ করাতেও রামেশ্বর শুনিলেন না, সুতরাং পুত্র অগ্রসর হইলেন। রামেশ্বর সেই নদীতটে বসিয়া সাধ্বী পার্ব্বতীর জন্য রোদন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে, রামেশ্বর পুত্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া, পুত্রকে পুনরপি আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময়ে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃতা এক স্ত্রীলোক আসিয়া, রামেশ্বরের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়াই রামেশ্বর চমকিল—এ কার গলা? দুই হাতে তাহাকে তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া চিনিলেন—এই যে যথার্থ পার্ব্বতী!

তখন রামেশ্বর পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "সে কি? তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে, তোমার মাতা পদ্মায় ডুবিয়া ছিলেন।"

আনন্দদুলাল বলিলেন, "আমি সত্যই বলিয়াছি। মা, পদ্মার ঝাঁপ দিয়াছিলেন কিন্তু মরেন নাই—জালিয়ারা তুলিয়াছিল। সে সকল কথা পশ্চাৎ শুনিবেন।"

তখন তিনজনে, একত্রে আহ্লাদে রোদন করিতে করিতে, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল বিবৃত করিয়া পরস্পরকে শুনাইতে লাগিলেন।

নিদ্রা।

আলেকজণ্ডর বেন বলেন, আমাদিগের যত গুলি শারীরিক বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে নিদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। ইহার অর্থ আমরা ইহাই বুঝি, যে অন্যান্য শারীরিক বৃত্তি গণের চরিতার্থতা সাধন করা না করা, আমাদিগের ক্ষমতাধীন। আমরা ইচ্ছা করিলে, ক্ষুধা নিবারণ না করিলে না করিতে পারি; তৃষ্ণা পাইলে জল না খাইয়া থাকিতে পারি; তাহাতে কষ্ট হইবে, পীড়া হইবে, শেষে মৃত্যু হইবে, তথাপি সাধ্য বটে। কিন্তু নিদ্রাকর্ষণের পর ইচ্ছা করিলে জাগ্রত থাকিতে পারি না; অনেক যত্ন করিলেও আপন অজ্ঞাতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িব। নিদ্রা বোধ হয়, একাই অনিবার্য্য।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত বলা যায় না। চীনদেশে এক প্রকার অসাধারণ রাজদণ্ড প্রচলিত ছিল বা আছে—নিদ্রাহানির দ্বারা অপরাধীকে বধ করা। ১৮৫০ সালে আময় নগরে একজন বণিক্ আপনার স্ত্রীকে বধ করিয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতি এই ভীষণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল। দণ্ডসাধন জন্য, তাহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হইল। সেখানে তিন জন প্রহরী নিযুক্ত হইল; ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রহরী বদল হইত; তাহাদিগের কার্য্য অপরাধীর নিদ্রার বিঘ্ন করা। তাহারা পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্র উপস্থিত থাকিয়া, বন্দীকে এক পলক জন্য ঘুমাইতে দিল না। অষ্টম দিবসে কয়েদীর যন্ত্রণা এমন ভয়ানক হইয়া উঠিল যে সে

অনেক অনুনয় করিয়া প্রার্থনা করিল যে আমাকে গলা চাপিয়া বধ কর। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল।

স্মী সাহেব বলেন যে আমরা কিয়দংশে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিদ্রা আনিতে সক্ষম। আমরা হৃৎপিণ্ডের গতি মন্দীভূত এবং শারীরিক তাপ শান্ত করিয়া দিই; তাহা হইলেই নিদ্রা আইসে। শৈত্যের ফল যে নিদ্রা ইহা অনেকেই জানেন। যাঁহারা শীত প্রধানদেশে রাত্রে বরফে পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে সে অবস্থায় অনিবার্য্য নিদ্রার আবেশ হয়ণ সেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। যাঁহারা অনিদ্রায় কষ্টপান, তাঁহারা শীতল জল অঙ্গে সেচন করিয়া দেখিয়াছেন যে আশু অনিদ্রা দূর হয়। যাঁহাদের কোন ঔষধে অনিদ্রা দূর হয় নাই, মূর্দ্ধাপ্রদেশে শীতল জল ব্যবহারে শীঘ্রই তাঁহাদের নিদ্রা হইয়াছে।

কিন্তু ঘুম আনিবার আরও কতকগুলি কৌতুকাবহ কৌশল আছে। স্মী সাহেব বলেন, উত্তরশিয়রে শয়ন করিলে অনিদ্রা দূর হয়; পশ্চিমশিয়রে শুইলে নিদ্রার বিঘ্ন ঘটে। পার্থিব চৌম্বকাকর্ষণ কি ইহার কারণ ?

"মেস্মেরাইস্" করিলে ঘুম আইসে কেন ? কেহ কেহ বলেন, নিদ্রা আসিবে এই বিশ্বাস, এবং নিদ্রার প্রত্যাশা ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে মনের বিরতি। নিদ্রার প্রত্যাশায় অনন্যমনা হইয়া স্থির থাকিলে নিদ্রা আসে এ কথা সত্য বটে। অনেক সময়েই এই উপায়াবলম্বন করিয়াই আমরা সুষুপ্ত হই।

নিদ্রিতাবস্থায় সচরাচর অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয় উভয়েই ক্রিয়াশূন্য থাকে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম সর্ব্বদা ঘটে। কখন বা অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট, বহিরিন্দ্রিয় সচেষ্ট, কখন বা বহিরিন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট, অন্তরিন্দ্রিয় সচেষ্ট; দেখা যায়। নিদ্রিতাবস্থায় যে কেহ২ উঠিয়া বেড়ায়, কথা কয়, দন্তপেষণ করে, ইহা সকলেই জানেন।

অন্তরিন্দ্রিয়ের সুষুপ্তিকালে, বহিরিন্দ্রিয়ের সচেষ্টতার ইহা উদাহরণ। বহিরিন্দ্রিয়ের সুষুপ্তিকালে, মন যে কার্য্যতৎপর থাকে, স্বপ্ন তাহার উদাহরণ স্বরূপ সচরাচর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্বপ্নতত্ত্বের বৃত্তান্ত অতি কৌতুকাবহ, কিন্তু সচরাচর আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে তদ্বিবরণ সবিস্তারে পাওয়া যায়, এজন্য আমরা সে সকল কথার কোন উল্লেখ করিতে চাহি না। কিন্তু স্বপ্নাবস্থার যে মানসিক, বা শারীরিক কার্য্য সেসকল অপ্রকৃত; চক্ষু, দেখিতেছে না, অথচ বোধ হইতেছে যে দেখিতেছে; কর্ণ শুনিতেছে না, অথচ বোধ হইতেছে যে শুনিতেছে, ইত্যাদি। স্বপ্ন ভিন্ন আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে—নিদ্রাবস্থায় মনের প্রকৃত এবং স্বাভাবিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থাতেও জাগ্রতের ন্যায় নানাবিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান লেখকও অনেক সময়ে নিদ্রিতাবস্থাতেও এইরূপ চিন্তাক্ষম হইয়াছেন। তখন, চক্ষু দেখিতে অক্ষম, কর্ণ শুনিতে পায় না, স্পর্শ অনুভূত হয় না, কোন অঙ্গ চালনা করা যায় না, অথচ বেশ জানিতে পারা যাইতেছে যে আমি ঘুমাই নাই, এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে চিন্তা করিতেছি।

এখানে কেবল মনই সচেষ্ট, কিন্তু কখন কখন নিদ্রাকালে মন, এবং কতকগুলি বহিরিন্দ্রিয়ও সচেষ্ট থাকে—তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিদ্রিত। আমরা জানি একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, সাক্ষির জবানবন্দী লিখিতে লিখিতে কখন২ তন্দ্রাভিভূত হয়েন; তখন তিনি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যান, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ জোবানবন্দী লিখিতেছিলেন, সেইরূপ লিখিতে থাকেন, প্রায় কোন ভুল হয় না। সর্ উইলিয়ম হামিল্টন, একজন ডাকের হরকরার কথা লিখিয়াছেন, সেও মন্দ ব্যাপার নহে। ডাকের পুলিন্দা লইয়া সে প্রত্যহ চারি ক্রোশ যাতায়াত করিত। মধ্যে একটা

মাঠ—পথ নির্ব্বিঘ্ন। মাঠ পারে, একটি নদীর উপর অতি অপ্র শস্ত একটি সেতু ছিল। গোটাকত ভাঙ্গা ধাপে উঠিয়া সেই সে-তুতে উঠিতে হইত। বিশেষ অনুসন্ধান ও প্রমাণের দ্বারা স্থির হইয়াছিল, যে ডাকের হরকরা যতক্ষণ ঐ মাঠ পার হইত তত ক্ষণ সে ঘুমাইত; গমন, নিদ্রিতাবস্থাতেই হইত; এই নিদ্রিতা-বস্থাতেও সে কখন পথ ভুলিত না, ঠিক্ সেতুর দিগে যাইত: আর সেই ভাঙ্গা ধাপের কাছে গিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইত।

আমরাও শুনিয়াছি যে বহরমপুরে কোন আদালতে একজন আমলা ছিলেন, তিনিও এইরূপ নিদ্রায় পটু। তিনি আহা-রান্তে আপিসে যাত্রা করিতেন; রাস্তায় পদার্পণ করার পরেই তাঁহার নিদ্রারম্ভ হইত; কাছারীর নিকট তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হ-ইত। কিন্তু এবিষয়ের সত্যতা আমরা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না।

ইরাস্মসের পত্রাবলীতে নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তটি পাওয়া যায়। অপোরিনস্ নামে একজন তাঁহার বিদ্বান্ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে একদা এক পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একখানি পুস্তক সম্বন্ধে উভয়ের কৌতূহল ছিল, সে খানি অপোরিনসের সঙ্গে থাকায় তিনি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইরস্মস শুনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর পাঠ হইলে, ইরস্মস একটি শব্দ বুঝিতে পারিলেন না—তিনি তদ্বিষয়ে অপোরিনস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর না পাওয়ায়, প্রশ্ন করিতে করিতে জানিতে পারিলেন। যে অপোরিনস্ নিদ্রিত! নিদ্রিতাবস্থাতেই গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। ইরস্মস্ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, তখন অপোরিনস্ দেখিলেন যে তিনি কি পাঠ করিয়াছেন তাহার কিছু মাত্র মনে নাই। আমরা যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কথা বলিয়াছি অপোরিনস্ তাঁহারই দোসর।

অতএব নিদ্রা সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা নিশ্চিত বোধ হয় ;—

(১) নিদ্রাকালে সচরাচর সর্ব্বাঙ্গ ও মন নিশ্চেষ্ট হয়। ইহাই সম্পূর্ণ নিদ্রা।

(২) কখন ও কেবল সর্ব্বাঙ্গ নিদ্রিত হয়; মন জাগ্রত থাকে।

(৩) কখন কোন কোন অঙ্গ নিদ্রিত, কোন কোন অঙ্গ জাগ্রত থাকে।

(৪) নিদ্রিতাবস্থায় মন জাগ্রত থাকিলেও মনের সকল শক্তি জাগ্রত থাকে না। নিদ্রিতাবস্থায় যাহা লেখা যায় বা পড়া যায়, নিদ্রা ভঙ্গের পর তাহার কিছুই মনে থাকে না।

(৫) কোন কোন অঙ্গ অগ্রে, কোন কোন অঙ্গ পরে নিদ্রিত হয়। দেখা যায়, সচরাচর সর্ব্বাগ্রে চক্ষু মুদিত হয়।

জলে ফুল।

১

কে ভাসাল জলে তোরে কাননসুন্দরি!
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিলে কোন বনে,
নাচিতে পবন সনে, কোন বৃক্ষোপরি?
কে ছিড়িল শাখা হতে শাখার মুঞ্জরী?

২

কে আনিল তোরে, ফুল, তরঙ্গিণী-তীরে?
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডালা,
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে?
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে।

৩

ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে তারা।
কিম্বা কাদম্বিনী গায়, যেন বিহঙ্গিনী প্রায়,
কিম্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথ হারা।
কোথায় চলেছ, ধরি, তরঙ্গিণী ধারা?

৪

একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে!
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি,
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতূহলে?
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল নদী জলে!

৫

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে!
কাল স্রোতে তোরই মত, ভাসি আমি অবিরত,
কে ফেলেছে মোরে এই, তরঙ্গের ঘোরে?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে!

৬

শাখার মুঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল।
বোঁটা ছিড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি স্রোতে পড়ে,
আশার আবর্ত্ত বেড়ে, নাহি পাই কূল।
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল!

৭

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,
অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে।
চল যাই দুই জনে অনন্ত উদ্দেশে।

স্ত্রীজাতি বন্দনা।

হেদেবি! এবঙ্গভূমে তুমিই একা জাগ্রত; অতএবতোমাকে প্রণামকরি।

তুমি সর্ব্বব্যাপিনী! কেননা সকল ঘরে আছ। তুমি অন্নপূর্ণা! কেনন৷ তুমি আপনার উদর অন্নে পূর্ণ করিয়া থাক; তুমি অভয়া. কেননা তুমি পতির বাবাকেও ভয়কর না।

তুমি দিগম্বরী! যে অবধি শান্তিপুরে ধূতি উঠিয়াছে।

তুমি রক্ষাকালী! কেননা পতির পরমায়ুঃ তুমি বাম করে রক্ষা করিতেছ।

তুমি মহামায়া! কেননা জ্ঞানী কি অজ্ঞানী তুমি সকলকে ভুলাইয়াছ।

তুমিই পুরুষের চক্ষুঃ, তুমিই কর্ণ, তুমিই জ্ঞান; তাহারা আপন চক্ষে যাহা দেখে তাহা মিথ্যা; আপন কর্ণে যাহা শুনে তাহা বৃথা।

এসংসারে তুমিই কর্ণধার! কেননা তুমি সকলের কর্ণ ধরিয়া চালাইতেছে।

তোমার নিমিত্ত সকলে মোট বহিতেছে; তোমারই নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব ভিক্ষার ঝুলি বহিয়াছেন।

হে দেবি! তুমি স্পষ্ট করিয়া বল তোমার বীজমন্ত্র ওঁকার, না অলঙ্কার?

হে সুরুচি! তুমি স্বরূপ বল, মৎস্যের "নেজা" ভালবাস কি প্রতিবাসীর "মুড়া" ভাল বাস?

হে দেবি! তুমি মনে করিলে সকলের মুণ্ড ঘুরাইতে পার —কথায়; পৃথিবী ভাসাইয়া দিতে পার—রোদনে; পৃথিবীকে রসাতল পাঠাইতে পার—কলহে।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড।] জ্যৈষ্ঠ ১২৮১। [২ সংখ্যা।

দামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহুকাল হইল একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্তবৎসর বয়স্কা একটি বালিকা ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ লোচনে স্রোত স্তাড়িত দীপমালা দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল "আই! আমার দীপ ভাসিয়া গেল।" আই উত্তর করিলেন "তা যাক, এখন তুমি ঘরে চল, অন্ধকার হইল।" "আর একটু দেখি" বলিয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিল।

বালিকাটির নাম দামিনী। বৃদ্ধা মাতামহীব্যতীত দামিনীর আর কেহই ছিল না; সেই মাতামহীর সঙ্গে আসিয়া দামিনী এই প্রথমে দীপ ভাসাইল; দীপ ভাসিয়া গেল। অন্য বালিকার ন্যায় দামিনী হাসিল না; অন্য বালিকার ন্যায় "ঐ আমার দীপ যাইতেছে" বলিয়া আহ্লাদে সঙ্গিনীকে দেখাইল

না; কেবল গম্ভীরভাবে একদৃষ্টিতে সেই দীপে
রহিল।

নদী প্রশস্ত; অন্ধকারে সেই নদী আবার গভীর এবং অকূল বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেই অকূল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল। দামিনীর দীপ দামিনী আপনি ভাসাইয়াছে, এক্ষণে আর উপায় নাই; অতএব কাতর অন্তরে দামিনী বলিতে লাগিল "হে ঠাকুর! আমার দীপকে রক্ষা কর।"

অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল দেখিয়া মাতামহী দামিনীকে গৃহে লইয়া চলিলেন। দামিনী গম্ভীর ভাবে কেবল দীপের গতি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল। প্রাঙ্গণপার্শ্বে একটি কলসে জল ছিল; দামিনী সেই জলে আপন ক্ষুদ্র পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শয়ন ঘরে প্রবেশ করিল। শয়ন মাত্রেই নিদ্রা আসিল। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যেন মেঘ অন্ধকারে ভারি হইয়া নদীর উপর নামিয়া পড়িয়াছে। ঐ মেঘ দেখিয়া দামিনীর দীপ যেন ভয়ে অল্প অল্প জ্বলিতে জ্বলিতে পলাইতেছিল, এমত সময় পতনোন্মুখ ভয়ানক ভয়ানক তরঙ্গ আসিয়া তাহার চারিদিকে ঘেরিল। ঐ তরঙ্গের মধ্যে একটির চূড়ার উপর গম্ভীর ভাবে একটি বিড়াল বসিয়া আছে। দামিনী চিনিল যে সেইটি তাহাদের পাড়ার দুরন্ত বিড়াল; সেইটি তাহাকে দেখিলেই নখাঘাত করিতে আসিত। দামিনী তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল চক্ষু মুদিয়া চীৎকার করিত, কখন পলাইতে পারিত না। এক্ষণে তরঙ্গচূড়ায় সেই বিড়ালকে দেখিয়া দামিনী ভয়ে মাতামহীর অঞ্চল ধরিয়া চক্ষু মুদিল। বৃদ্ধা যেন ক্রুদ্ধা হইয়া আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া দামিনীর ক্ষুদ্র দেহ সেই অগাধ

জলে ঠেলিয়া ফেলিয়াদিলেন। দামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতামহী ভয়ে কি বলিয়া নিদ্রিত দামিনীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। দামিনী নিদ্রা ভঙ্গে "আমার মা কোথায়" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীর মা ছিল না; তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

পর দিবস প্রাতে দ্বাদশ বর্ষীয় একটি বালক পাঠশালায় যাইতেছিল; দামিনীর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া পক্ষিশাবকের নিমিত্ত পতঙ্গ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। দামিনী একা বসিয়াছিল, বালকের প্রশ্নে কেবল মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল। বালক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল জ্বর হইয়াছে কি? দামিনী আবার মাথা নাড়িল। বালক বলিল আইর উপর রাগ করিয়াছ? দামিনী কোন উত্তর দিল না। বালক বস্ত্রাগ্র হইতে কথক গুলিন পতঙ্গ দামিনীর নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

বালকটির নাম রমেশ। দামিনীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না; প্রতিবাসী বলিয়া দামিনী তাহাকে রমেশ দাদা বলিয়া ডাকিত। দামিনী রমেশের বড় অনুগতা ছিল। যে বিড়ালটিকে দামিনী বড় ভয় করিত, রমেশ তাহাকে দেখিলেই মারিত। স্নানের সময় রমেশ স্রোতে সন্তরণ করিয়া দামিনীর নিমিত্ত পুষ্প ধরিয়া আনিত; দামিনী তাহা লইয়া হাসিতে হাসিতে কেশে পরিত। পরা হইলে মাথা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিত "রমেশ দাদা, দেখ, হয়েছে?" রমেশ প্রায় ভাল বলিত, আবার মধ্যে মধ্যে মনোনীত না হইলে আপনি পরাইয়া দিত। রমেশ জানিত যে গ্রামের সকল বালিকার অপেক্ষা দামিনী শান্ত আর দুঃখিনী। আর দামিনী ভাবিত যে গ্রামের সকল বালক অপেক্ষা রমেশ-দাদা তাহার "আপনার জন" আর কেহ ত তাহার জন্য ফুল কুড়ায় না, পতঙ্গ ধরে না, বিড়াল মারে না। এই জন্য

রমেশ দাদাকে দেখিলেই দামিনী দৌড়িয়া নিকট যাইয়া দাঁড়াইত। হাসি মুখে সকল কথার উত্তর দিত। কিন্তু এই দিন রমেশকে দেখিয়া আর পূর্ব্বানুরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। দামিনী শৈশবে গম্ভীর হইয়াছে।

দামিনী শৈশবে এত গম্ভীরপ্রকৃতি কেন? যে সুখী, সেই চঞ্চল, যে দুঃখী, সেই শান্ত, সেই ধীর, সেই গম্ভীর। এক দারুণ দুঃখে দামিনী এই শৈশবে কাতরা! দামিনীর মা কোথা? তাহার মা কি মরিয়াছেন? তা হইলে লোকে বলে না কেন? পাড়ার সকল ছেলে, মার কোলে শোয়, মার হাতে খায়, মার কথা শোনে, মার মুখ পানে চায়, মার সঙ্গে গল্প করে, মার সঙ্গে কোন্দল করে, মার কাছে দৌরাত্ম্য করে, দামিনীরই কপালে এই সকল হলো না কেন? আয়ি আছে—আয়ি বেশ—মার মত ভাল বাসে—তবু মা! মার আদর কেমন! তিনবৎসর বয়সে দামিনী মা হারাইয়াছিল, দামিনীর মাকে একটু একটু মনে পড়িত। —একটু একটু—কেবল ছায়াটি—কেবল একখানি শরীর আর একখানি মুখ—তাতে আহ্লাদ আর হাসি—যেমন, যে বাল্যকালে দুর্গোৎসব দেখিয়াছে—আর কখন দেখে নাই—তাহার যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় সেই দুর্গা প্রতিমা মনে পড়ে—দামিনীর তেমনি মাকে মনে পড়িত। দামিনী কত সময়ে মনে মনে মাকে গড়িত—বসনে, অলঙ্কারে, মনে মনে সাজাইত,—তাহার উপর হাসিতে, আদরে, প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া সাজাইত—সাজাইয়া মনে মনে মা! মা! মা! বলিয়া ডাকিত!

আজি মার কথা ভাবিতে ভাবিতে মার কথা, দীপের কথা, স্বপ্নের কথা, রমেশের কথা, সব কেমন মিশাইয়া মনের ভিতর গোলমাল হইল। দামিনী ভাবিল, মরি ত বেশ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর পরে আর এক দিবস অপরাহ্নে একটি ক্ষুদ্র শয়নগৃহে দামিনী একা শয্যারচনা করিতেছিলেন। পশ্চিম দিকের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া সূর্য্য কিরণ শয্যায় পড়িয়া দামিনীর মুখকমলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তাঁহার নাসাগ্রে এবং কপোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষুদ্র মুক্তারাজির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। দামিনী একখানি সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী লইয়া গাত্র মার্জ্জনা আরম্ভ করিলেন।

দামিনী আর ক্ষুদ্র বালিকা নাই; এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক্ষণে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শরীরের গুরুত্বানুরূপ আবার অঙ্গচালনার গাম্ভীর্য্য জন্মিয়াছে। দামিনী স্বভাবতঃ গৌরাঙ্গী, এক্ষণে সেই বর্ণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইয়াছে।

গাত্র মার্জ্জন সমাধা করিয়া দামিনী একখানি দর্পণ তুলিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রাঙ্গণ হইতে একটি স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দামিনী অমনি চঞ্চল হইয়া দর্পণ ফেলিয়া দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বালিকাবয়সে যাঁহারে দামিনী রমেশ দাদা বলিতেন, তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আপনার বিমাতার সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রতি সস্নেহ লোচনে দামিনী চাহিয়া রহিলেন।

রমেশ দামিনীর স্বামী; দামিনীর সর্ব্বস্ব।

কথা সমাধা হইলে রমেশ আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শয্যায় দুই একটী পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া দামিনীকে বলিলেন "কোন চোরে আমার নামাবলী থেকে ফুল চুরি করেছে রে?"

দামিনী বলিল, "খুব করেছে। উনি ফুল এনে নামাবলীতে

বেঁধে রাখ্‌তে পারেন, আর লোকে চুরি কর্‌তে পারে না? খুব করেছে চুরি করেছে।

রমেশ বলিলেন, "খুব করেছে বই কি? চোরকে এক বার ধরতে পারলে বুঝিতে পারি।"

চোর আসিয়া ধরা দিল।

রমেশ দুই হস্তে দামিনীর দুই গাল ধরিলেন; দুই করে দামিনীর দুই কর্ণ আবরণকরিয়া মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দামিনী রমেশের দুই বাহু ধরিয়া ঊর্দ্ধ মুখে রমেশকে দেখিতে লাগিলেন। রমেশ দেখিতে দেখিতে বলিলেন "আমার সর্ব্বস্ব।" দামিনীর চক্ষু অমনি জলে পুরিয়া আসিল; দামিনী কাঁদিয়া উঠিলেন।

রমেশ দামিনীকে ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তুমি কি নিত্য কাঁদিবে?" দামিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি নিত্য আদর কর কেন?"

এই সময় দ্বারের পার্শ্বে ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ হইয়া উঠিল। যেন আর এক জন কেহ কাঁদিল। দামিনী ও রমেশ উভয়ে ব্যস্ত হইয়া সেই দিগে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, একজন অপরিচিতা অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছে। দামিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন; বহির্দ্বার পর্য্যন্ত দামিনী গেলে স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইল। দেখিয়া, দামিনীর যেন কি মনে পড়িল—কিন্তু কি মনে পড়িল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উন্মাদিনী হঠাৎ দামিনীর গলা ধরিয়া, তাহার বক্ষে মাথা দিয়া, "মা! মা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কত কি বলিল—কত আশীর্ব্বাদ করিল—দামিনী কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না,—কিন্তু, তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন

—কান্না দেখিলে কান্না পায় বলিয়া; কি কেন—তাহা জানি না।

দামিনী ধীরে ধীরে উন্মাদিনীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিমুক্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হাঁগা তুমি কে গা?"

উন্মাদিনী, কিছু বলিল না, "মা! মা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, দামিনী বলিলেন,

"কাঁদিতেছ কেন?"

উন্মাদিনী জিজ্ঞাসা করিল,

"তোমার মা আছে?"

দামিনী কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলেন, "বিধাতা জানেন," বলিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। পাগল বলিল,

"দেখ, তোমার মার নামেই তুমি কাঁদিতেছ,—আমি আজি আমার মা পাইয়াছি—আমি কাঁদিব না?"

একটি কথা সহসা বিদ্যুতের মত দামিনীর মনের ভিতর চমকিল—"এই আমার মা নয় ত?"

হাঁ সেই ত মা। দামিনীর মা স্বামীর শোকে পাগল হইয়া পলাইয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, কোথায় ছিল, তাহা কে জানে? দিনকত ভৈরবী হইয়া ত্রিশূল ধরিয়া বেড়াইয়াছিল। আবার বহুকাল পরে, সংসার মনে পড়িল—দামিনীকে দেখিতে আসিল—লুকাইয়া দামিনীকে দেখিতেছিল। দামিনীর মনে হঠাৎ উদয় হইল—"এই আমার মা নয় ত?

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রমেশের বিমাতা ডাকিলেন। দামিনী চমকিয়া ফিরিলেন। যেখানে পাগ্‌লী দাঁড়াইয়াছিল সে দিগে আবার দেখিলেন; পাগ্‌লী চলিয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলেন তাঁহার অনুসরণ করি; দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিলেন, রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"স্ত্রীলোকটি কে?" দামিনী অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে, উত্তর করিলেন "পাগল।"

রমেশ আর কোন কথা না বলিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। দামিনী শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিলেন। দুই একবার অস্ফুটস্বরে মা বলিয়া ডাকিলেন। শৈশবে মা হারাইয়াছেন, সেই অবধি মা বলিয়া ডাকেন নাই। এক্ষণে পাগলের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে বড় সাধ হইল। দামিনী বালিশে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে গ্রামে রমেশ বাস করিতেন, তাহার দক্ষিণ প্রান্তে ভাগীরথীতীরে একটি ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। প্রবাদ আছে পূর্ব্বকালে এক রাজা আপন মাতার গঙ্গাবাসের নিমিত্ত ঐ অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন দৈব ঘটনায় ঐ অট্টালিকায় একটি স্ত্রীহত্যা হওয়ায় রাজার মাতা উহা পরিত্যাগ করেন। সেই পর্য্যন্ত কেহ তথায় বাস করে নাই। অট্টালিকার ক্রমে ভৌতিক অপবাদ জন্মিল। শেষে দিবাভাগেও কেহ ঐ অট্টালিকার নিকট দিয়া গতিবিধি করিতে সাহস করিত না।

পাগল দেখিলেন যে এই ভয়ানক ভগ্ন অট্টালিকা তাহার বাসোপযোগী। অতএব গোপনে তথায় বাস করিতে লগালেন। দামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাগলের অনেক মতিস্থির হইয়াছিল; তথাপি মধ্যে মধ্যে দামিনীকে চুরি করিয়া এই গোপনীয় স্থানে আনিয়া একা দেখিবেন এই মনে মনে স্থির করিতেন। আবার পরক্ষণেই ইহার অকর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারিতেন। পাছে চাঞ্চল্য প্রযুক্ত আত্মপরিচয় দিয়া জামাতার কলঙ্ক রটান, এই ভয়ে আর দামিনীর বাটীতে যাই-

তেন না। একা ভগ্ন অট্টালিকায় বসিয়া আপনাপনি উদ্দেশে দামিনীকে আদর করিতেন, দামিনীকে কিরূপে রমেশ আদর করিতেছিল আবার তাহাই ভাবিতেন।

একদিবস রাত্র দুই প্রহরের সময় পাগল স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া ভগ্ন অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া অন্ধকারে কেশ শুকাইতেছিলেন। কেশরাশি নানাদিগে নানাভঙ্গীতে তুলিতেছিলেন, ফেলিতেছিলেন। এমত সময় পূর্ব্বদিগের অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে হঠাৎ এক অশ্বের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। দক্ষিণকরে কেশগুচ্ছ ধরিয়া অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃক্ষমূল প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন ক্রমে দুই একটী মসাল জ্বালিত হইল। এবং তদালোকে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক আর এক অশ্বারোহী পুরুষ দৃষ্ট হইল। পাগ্‌লী প্রথমে ভাবিল ইহারা ডাকাইত; পাছে ইহারা আমার দামিনীর ঘরে ডাকাতি করে এই আশঙ্কায় দ্রুতবেগে ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিয়া ডাকাইতদিগের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলেন। ফিরিয়া ঝটিতি গৃহে আসিয়া সহসা ভৈরবী বেশ ধারণ করিয়া, করাল ত্রিশূল হস্তে লইয়া সদর্পে চলিলেন। কথঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি পাল্কি দেখিয়া ভাবিলেন, ইহারা ডাকাত নহে ডাকাতের সঙ্গে পাল্কি থাকে না। ইহারা বরযাত্রী হইবে। পাগল তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। দামিনীর বিবাহ তিনি দেখিতে পান নাই, অতএব বিবাহ দেখিব মনে করিয়া পরম আহ্লাদপূর্ব্বক পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্ধকারে তাঁহাকে কেহই প্রথমে দেখিতে পায় নাই, শেষ কতক দূর গেলে এক জন শিবিকাবাহক তাঁহাকে দেখিয়া রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কেরে তুই এমত সময় আমাদের সঙ্গে যাইতেছিস?" পাগল "উত্তর করিলেন আমি তোমাদের সঙ্গে

বিবাহ দেখিতে যাইতেছি, তোমাদের সঙ্গে বাদ্যকর নাই কেন?।”

বাহক উত্তর করিল এবড় ভয়ানক বিবাহ, এবিবাহে বাদ্য থাকে না। পাগল একথায় মনোনিবেশ না করিয়া আপন ইচ্ছানুরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন “কাহার বাড়ীর বর, কাহার বাড়ির কনে ?” বাহক বলিল হিন্দুর কনে মুসলমানের বর। পাগল উত্তর করিল “মিছে কথা” বাহক দেখিল যে স্ত্রীলোকটি পাগল অতএব তাহার সঙ্গে রঙ্গ করিতে লাগিল। “কে বর” এই কথা উন্মাদিনী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় বাহক অশ্বারোহীকে দেখাইয়া দিল। উন্মাদিনী দেখিল অসম্ভব নহে, বয়স অল্প, জরির কাপড় পরিধান। আর কোন প্রশ্ন না করিয়া সঙ্গে চলিল।

সঙ্গীদিগের পরিচয় দিতে বাহকের প্রতি বিশেষ নিষেধ ছিল কিন্তু সে নিষেধ তাহার পক্ষে ক্রমে ভার হইয়া উঠিতে-ছিল। পাগ্‌লীকে পাইয়া বাহক মনে করিয়াছিল যে সে ভার নামাইবে কিন্তু পাগ্‌লী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায় তাহার আশা পরিতৃপ্ত করিবার ব্যাঘাত জন্মিল। শেষে বাহক পাগ্‌লীকে বলিল, তুমি স্ত্রীলোক আমাদের সঙ্গে যাওয়া ভাল নহে, এখনই কাটাকাটি হইবে অতএব তুমি পলাও। পাগ্‌লী বলিল, বিবাহ শুভ কর্ম্ম, ইহাতে কাটা কাটি হইবে কেন? বাহক উত্তর করিল এব্যাপার বিবাহের নহে; যিনি তাজ পরিয়া তরবারি লইয়া ঘোড়ার উপর যাইতেছেন উনি আমাদের ফৌজদারের পুত্র। এই গ্রামে একটি অদ্ভুত সুন্দরী আছে শুনিয়া তাহাকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছেন; তাই বলিতেছিলাম কাটাকাটি হইবে।

পাগ্‌লী শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার কন্যা লইয়া যাইবে? বাহক বলিল আমি সবিশেষ জানি না, শুনিয়াছি কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্রবধূ; যুবতীর স্বামী নাকি অদ্য কয়েক দিন হইল শিষ্যালয়ে গিয়াছে। সুন্দরীর নাম বুঝি দামিনী।

এই কথা শুনিবামাত্র পাগলী ফণিনীর ন্যায় বাহকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ করিলেন; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল তুলিলেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাহক ভয়ে বলিল, আমি দরিদ্র বাহক পেটের জ্বালায় সকল করি আমাকে মারিলে কি হইবে, আমি হিন্দু অত এব হিন্দুর অত্যাচার আমার ইচ্ছা নয়। এক্ষণে গোলযোগ করিলে এই যবনেরা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে অতএব আমার পরামর্শ শুন। তুমি অন্য পথ দিয়া দ্রুত যাইয়া গ্রামবাসীদিগকে জাগ্রত কর; সকলে একত্রে প্রতিবন্ধক হইলে সফল হইতে পারিবে নতুবা আর উপায় নাই।

পাগ্‌লী শুনিবামাত্র ছুটিলেন; গ্রামের মধ্যে যাইয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, হিন্দুর হিন্দুত্ব যায় সকলে উঠ; সতীর সতীত্ব যায়, একবার সকলে উঠ। অদিতি ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বনাশ হয় একবার সকলে উঠ। ফৌজদারের পুত্র আসিয়া তাহার পুত্রবধূকে হরণ করে একবার সকলে উঠ।

কেহই উঠিল না। কেহ বলিল "যাউক শত্রু পরে পরে।" কেহ বলিল "পরের নিমিত্ত মাথা দিবার আমার কি প্রয়োজন পড়িয়াছে?" কেহ বলিল "অদিতির সর্ব্বনাশ হয় যদি তাহাতে আমার কি ক্ষতি?"

ক্ষতি আছে। আমরা ভিন্ন তাহা অপর দেশীয় সকলে বুঝে। বিপদ অদ্য আমার কল্য তোমার; অত্যাচার এক ঘরে

প্রবেশ করিতে পাইলে সকল ঘরে পথ পায়। অগ্নি এক ঘরে লাগিলে সকল ঘর আক্রমণ করে। পরের ঘরের অগ্নি যে নিবায় কেবল সেই আপনার ঘর রক্ষা করে। এবোধ বাঙ্গালা হইতে অনেক কাল অন্তর্হিত হইয়াছে অতএব পাগ্‌লীর চীৎকারে কেহই উঠিল না।

দুর্বৃত্ত যবনের অত্যাচার কেহ নিবারণ করিল না; রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ একা, তাহে বৃদ্ধ; দামিনীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যবনেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া মূর্চ্ছিতা দামিনীকে লইয়া গেল।

পাগ্‌লী দেখিলেন কেহই উঠিল না, কেহই সহায়তা করিল না। রমেশের গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, সকল ফুরাইয়াছে; দামিনীকে লইয়া গিয়াছে। তখন পাগ্‌লীর কপোল মধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পাগ্‌লী পূর্ব্বমত উন্মত্তা হইয়া সিংহিনীর ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইলেন। শেষ ত্রিশূল তুলিয়া ছুটিলেন।

যবনেরা এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া দামিনীকে লইয়া যাইতেছিল। পাল্‌কির চারিদিগে অস্ত্রধারী পদাতিক। সর্ব্ব পশ্চাতে ফৌজদারপুত্র অশ্বারোহণে যাইতেছিল। পাগ্‌লী বায়ুবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূল ফৌজদার পুত্রের পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ঈষৎ দেখা দিল। ফৌজদার পুত্রের শরীর প্রথমে দুলিল, শেষে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িয়াগেল। পাগলী বিকট হাসি হাসিল; অশ্ব চমকিয়া উঠিল; পদাতিকেরা ফিরিয়া দেখিল।

পাগলী আবার বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে ছুটিল। দামিনীকে আর তাহার স্মরণ হইল না। সেই অবধি পাগলীকেও আর কেহ দেখিতে পাইল না

পদাতিকেরা দেখিল যে ফৌজদারপুত্র সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছেন অতএব তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পাল্কিতে তুলিল। পাল্কি হইতে দামিনীকে ফেলিয়া দিয়া গেল। দামিনী একা প্রান্তরে পড়িয়া রহিলেন। নবপল্লবিত পুষ্পিত লতা বৃক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া পথে ফেলিয়া গেলে যেমন বাতাসে তাহা উলটি পালটি করিতে থাকে, প্রান্তরে পড়িয়া দামিনীর সেইরূপ দশা ঘটিল। বাতাসে তাঁহার অঞ্চল উলটি পালটি করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্র প্রভাত হইল। রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ নামাবলী স্কন্ধে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। প্রাতঃসন্ধ্যা হয় নাই; দামিনী নাই, সন্ধ্যার আয়োজন আর কে করিয়া দিবে? বিশারদ অতি বিমর্ষভাবে একা বসিয়া রহিলেন; ক্রমে প্রতিবাসিগণ, গ্রামবাসিগণ, আত্মীয় কুটুম্বগণ আত্মীয়তা করিতে আসিতে লাগিলেন। কেহ আসিয়া বলিলেন "কি বিপদ, কি বিপদ!" কেহ বলিলেন "কখন কাহার কি ঘটে কে বলিতে পারে।" কেহ বলিলেন অদৃষ্টই মূল। অদিতি বিশারদ ইহার কোন কথাতেই উত্তর করিলেন না দেখিয়া গণেশচন্দ্র নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক স্থূলশরীর প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "পুর্ব্বে ইহার কি কোন সূচনা ছিল না? অর্থাৎ পূর্ব্বে কি মহাশয় কিছুই জানিতে পারেন নাই?" অদিতি বিশারদ ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিব তবে এমন ঘটিবেই বা কেন? রমেশকেই বা বিদেশে যেতে দিব কেন? এই রাত্রে রমেশ থাকিলে শৃগালের সাধ্য কি যে সিংহের গৃহে প্রবেশ করে?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন "রমেশের প্রয়োজন কি? আমরাই যে আপনার পুত্রবধূকে রক্ষা করিতে পারিতাম। তবে কি জানেন সকল সময় সাহস হয় না; যবনেরা প্রায় বিশজন আমরা একা; বিশেষতঃ তখন যদি সদর বাড়ীতে থাকিতাম তবে যা হয় এক-খানা করিয়া বসিতাম। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য বশতঃ অথবা রমেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি তখন অন্দরে শয়ন করিয়াছিলাম। শয়ন করিলে সহজে উঠা যায় না; তথাপি ব্রাহ্মণীর কথায় উঠি-লাম, ভালকরে কাপড় পরিলাম, সেই অন্ধকারে অনুসন্ধান করিয়া নস্য শম্বুক বাহির করিলাম, একটীপ বিলক্ষণ করিয়া গ্রহণ করি-লাম; এসকল কার্য্যে নস্য আবশ্যক। তাহার পর দেখি আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবর। এসকল কার্য্যে ঘর্ম্ম ভাল নহে; কি জানি পাছে যবনেরা পিছলে পলায় এই মনে করিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বিলক্ষণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিষ্কার করিলাম; সকল বিষয় এক-কালে স্মরণ হয় না গাত্রমার্জ্জনী রাখিলে অস্ত্রের কথা মনে প-ড়িল। আমি বলিলাম পুতির তক্তা আন। ব্রাহ্মণী বলিলেন তাহার কর্ম্ম নহে। শেষে একটি শিশু, আমার সপ্তম সন্তান, একটি ইট আনিয়াদিল, আমি সেই ইট হাতে করিয়া ছাদে আ-সিয়া দেখি, দুর্বৃত্তেরা তখন ফিরিয়া যাইতেছে; আমি অমনি সেই ইট ছুড়িলাম।

প্রতিবাসী এইরূপ আত্মবীরত্বের পরিচয় দিতেছেন এমত সময় একজন কৃষী আসিয়া বলিল যে ফৌজদার পুত্র পথে মারা পড়িয়াছে। কে তাহারে মারিয়াছে তাহার স্থির নাই।

গণেশচন্দ্র আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন তবে সে আমারই ইটে মরিয়াছে; নিশ্চয় বলিতেছি আমিই যবন মারিয়াছি। আমার অব্যর্থ সন্ধান।

আর একজন ঈষৎ হাসিয়া বলিল ওরূপ কথা মুখে আনা

ভাল নহে। যিনি মরিয়াছেন তিনি ফৌজদারের একমাত্র পুত্র; সে পুত্রকে যে মারিয়াছে তাহার অদৃষ্টে নিশ্চয় শূল আছে।

গণেশ অমনি ভয়ে জড়বৎ হইলেন। কম্পান্বিত স্বরে বলিতে লাগিলেন আমি উপহাস করিতেছিলাম; আমি তা বলি নাই; আমি কি বলেছি, কিছুই নহে। আমার দ্বারা হাকিমের অনিষ্ট হইবে, কখন সম্ভব নহে। আমি বরং বলেছি যে এত ডাকা ডাকি করেছে তথাপি আমি কথা কই নাই। রমেশ বড় না হাকিম বড়। এই বলিতে বলিত তিনি পলাইলেন।

যে ব্যক্তি ফৌজদারপুত্রের মৃত্যুসংবাদ আনিয়াছিল সে অদিতি বিশারদকে বলিল যে মহাশয়ের পুত্রবধূ বাড়ী ফিরে আসিতেছেন। এই কথা শুনিবা মাত্র বিশারদ সকলের মুখ প্রতি চাহিলেন। কেহ কিছু বলিলেন না। শেষে অদিতি বিশারদ আপনিই সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আমার পুত্রবধূ যবনস্পৃষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না? সকলে উত্তর করিল যে মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা আপনিই মীমাংসা করুন। অদিতী বিশারদ কিঞ্চিৎ ভাবিলেন, শেষে অন্দরে যাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন "সেই বউকে আবার ঘরে? তোমার ইচ্ছা হয় তুমি স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া সংসার কর।"

কর্ত্তা বলিলেন "কেন, তাহার ত কোন দোষ নাই।"

গৃ। দোষ তবে সকল আমার?

ক। না, তোমায় দোষ দিই নাই আমি জিজ্ঞাসা করি পুত্রবধূকে গ্রহণ করিলে কি দোষ হইতে পারে?

গৃ। দোষ অনেক। প্রথমে লোকে গালে কালি চূণ দিবে,

দ্বিতীয়তঃ শিষ্যেরা ত্যাগ করিবে, তখন আমার এই শিশু সন্তানের কি উপায় হইবে?

ক। কেন লোকেরা দোষ দিবে? আমাদের পুত্রবধূ কুলত্যাগী নহে, ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় নাই, যবনগৃহেও যায় নাই, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৃ। কুলত্যাগী নহে? ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় নাই, একথা তোমায় কে বলিল? তুমি সকল সম্বাদই প্রায় জান। কয় দিবস পর্য্যন্ত এক মাগি পাগলের বেশ ধরিয়া যাতায়াত করিতেছিল, সে দিবস সন্ধ্যার সময় বধূকে লইয়া পলাইতেছিল, আমি যাইয়া ফিরাইয়া আনিলাম। ফিরে এসে বালিশ মুখে দিয়া যে আবার মেয়ের কান্না! আমি কি সকল কথা তোমায় বলি। তোমার পুত্রবধূ যখন দেখিল যে আমি থাকিতে আর পলাতে পারিবে না, তখন এই পরামর্শ করিয়া লোক জন আনাইয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন, দুই একবার বলিলেন, "শাস্ত্র মিথ্যা হয় না, স্ত্রীচরিত্র কে বুঝিতে পারে?" শেষে বলিলেন "তুমি যাহা বলিলে তাহা আমার বিশ্বাস হইল, আমি কদাচ তাহাকে আর গ্রহণ করিব না।"

অদিতিবিশারদ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার ভ্রম হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম আমার পুত্রবধূ নির্দ্দোষী। এক্ষণে জানিলাম তাহা নহে; তোমরা আমার আত্মীয় তোমাদিগের নিকট বলিতে লজ্জা কি? আমার পুত্রবধূ কুলটা। অনেক দিন পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু গৃহিণীর সতর্কতা হেতু সফল হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমার এই ঘর দ্বার ভগ্ন হওয়া সে কেবল আমার কুলবধূর পরামর্শ ও কৌশলে হইয়াছে। সে যাহা হউক যদি তাঁহাকে

নির্দ্দোষী বলিয়া আমরা স্বীকার করি তথাপি তিনি যে যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন সে বিষয়েত আর সন্দেহ নাই। অতএব শাস্ত্রানুসারে তাঁহারে আর কেমন করিয়া গ্রহণ করি। শাস্ত্রে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপেরও অবশ্য আছে কিন্তু বধূকে গ্রহণ করিলে আর একটী বিপদ আছে। ফৌজদার মনে করিবেন যে, আমরাই তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিয়া বধূকে ঘরে আনিয়াছি। আমি কি? যে কেহ বধূকে আশ্রয় দিবে তাহারই প্রতি সেই সন্দেহ হইবে। অতএব আত্মরক্ষা মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম; শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এক্ষণে স্থির করিয়াছি পুত্রবধূ গৃহে আসিতে চাহিলে আর আমি তাঁহাকে স্থান দিব না। তোমরা এ পরামর্শে কি বল?"

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "এ ভাল যুক্তি করিয়াছেন, আমরাও এই পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব। আমরাও কেহ আপনার পুত্রবধূকে স্থান দিব না; অন্য কেহ স্থান দিতে চাহিলে নিবারণ করিব। কেন একটা পাপিষ্ঠার নিমিত্ত গ্রামস্থ সকলে বিপদ্‌গ্রস্ত হই। বিশেষতঃ কুলটাকে গ্রামে স্থান দেওয়া উচিত নহে, এখানে স্থান না পাইলে সে আপনিই অন্যত্র যাইবে।"

সকলে এই পরামর্শ করিয়া আপন আপন গৃহ সাবধান করিতে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকলে স্ব স্ব গৃহে গেলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে গৃহিণী কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমার দেশ উজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বল কুলবধূ আসিতেছেন এখন কি বলিতে হয় যাইয়া বল।" ইহা শুনিয়া

অদিতি বিশারদ খিড়কি দ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। দামিনী মুখ ঢাকিয়া অধোমুখে ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন, দ্বারে শ্বশুরকে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না কাঁদিয়া উঠিলেন, বড় যন্ত্রণা পাইয়াছেন। অন্যদিন হইলে সে ক্রন্দন দেখিয়া অদিতি বিশারদ আপনিও কাঁদিতেন কিন্তু এসময় তিনি কাঁদিলেন না; চক্ষে জল আসিয়াছিল স্ত্রীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া তাহা সম্বরণ করিলেন। পরে নস্য শম্বুক বাহির করিয়া দুই একবার তাহাতে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া শেষ দীর্ঘ টানে এক টিপ টানিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, "বৎসে! আমি সকল দিগ্ ভাবিয়া দেখিলাম তোমায় আর গ্রহণ করিতে পারি না; তুমি যবমস্পৃষ্টা হইয়াছ; ব্রাহ্মণগৃহে আর তুমি স্থান পাইতে পার না; অতএব স্থানান্তরে যাও।" এই বলিয়া অদিতি বিশারদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। দামিনী প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; ক্রমে শ্বশুরের প্রত্যেক বাক্য স্মরণ করিয়া অর্থ বুঝিলেন। কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিলেন না; ভাবিলেন ইহা স্বপ্ন হইবে। স্বপ্ন কি না স্থির করিবার নিমিত্ত চারিদিগ চাহিয়া দেখিলেন। নিকটে তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তাহার শুষ্ক ডালে একটি চিল বসিয়া আছে; খিড়কি পুষ্করিণীর কাল জলে ডাহুক সাঁতার দিতেছে, ঘাটের নিকট জলে উচ্ছিষ্ট পাত্র রহিয়াছে; যে দাসী তাহা জলে রাখিয়া গিয়াছে তাহার জলসিক্ত পদচিহ্ন সোপানে স্পষ্ট রহিয়াছে। শ্বশুর যে দ্বাররুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এখনও তাহা রুদ্ধ রহিয়াছে। দামিনী একবার সেই দ্বারে হাতদিয়া দেখিলেন পরে আপনার গাত্রে, চক্ষে হাতদিয়া দেখিলেন স্বপ্ন নহে—সকলই সত্য! গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ সত্য—দামিনী 'ব্রাহ্মণের অগ্রাহ্য' এই কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাও স্বপ্ন নহে। দামিনীর চক্ষে সূর্য্য নিবিয়া গেল, সকলই

অন্ধকার হইল, দামিনী পড়িয়া গেলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে পাড়ার অনেক গুলিন বৃদ্ধা, মধ্য বয়স্কা, যুবতী, বালিকা সকলে আসিয়া দামিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দামিনী তখনও মতিস্থির করিতে পারেন নাই। যেখানে পড়িয়া গিয়াছিলেন সেই খানে নতমুখে বসিয়া একটি দুর্ব্বাদল, নখদ্বারা অন্যমনস্কে ছিঁড়িতে ছিলেন। অন্যমনস্কে হউক, আর সমনস্কে হউক তাঁহার নয়ন হইতে বারিধারা বহিতেছিল।

প্রতিবাসীদিগের মধ্যে একটি বৃদ্ধা বলিলেন, "এমনও কপাল করে ভারতে এসেছিলে! আহা কি অদৃষ্ট! কি দুর্ভাগ্য!" দামিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বৃদ্ধার মুখপ্রতি ব্যথিতা হরিণীর ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন "এমুখপ্রতি পোড়া শ্বশুর একবার ফিরে চাহিল না। ধর্ম্ম বড় হল না, জাত বড় হল। আরে পোড়া বিধাতা! কপালে মন্দ লিখিতে আর কি লোক পেলে না! এই বয়সে এই কষ্ট! আহা! মরি মরি, মেয়েত নয়, যেন স্বর্ণ লতা!"

আর এক জন মধ্যবয়স্কা বলিলেন, "আহা! দামিনী আমাদের চিরদুঃখিনী; বুড়া মাতামহী দামিনীর বিবাহ দিয়া বলিয়াছিল যে 'এতদিনে আমার দামিনীর উপায় হইল, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।' আহা! যদি বুড়ি বেঁচে থাকিত, তবে দামিনী দাঁড়াইবার একটা স্থান পাইত। এখন আর দামিনীর দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

দামিনীর অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল; শেষে দামিনী মাতামহীর জন্য কাঁদিয়া উঠিলেন। উদ্দেশে মাতামহীকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "আয়ি! আমায় কার কাছে ফেলে আপনি চলে গেলে!" এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাঁহার

শ্বাশুড়ী রাগভরে সশব্দে খিড়কি দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। "বলি বউ! তোমার কেমন আক্কেল আচরণ! এই দুই প্রহর বেলা গৃহস্থের দ্বারে বসিয়া মরা কান্না আরম্ভ করিলে? জাননা কি যে এতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।" প্রতিবাসিনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর তোমাদেরই বা কি আচরণ! আপনার আপনার ঝি বউ ঘরে রেখে পরের বউ নাচাতে এলে। এখন সকলে সময় পাইয়াছ, ভাল, পরমেশ্বর আমাকেও একদিন দিবেন, আমিও একদিন পাব।"

কেহ কোন উত্তর করিল না; সকলেই একে একে চলিয়া গেল। দামিনীও চক্ষের জল মুছিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। প্রতিবাসিনীরা আপন আপন গৃহকার্য্যে গেল। তাঁহাদের মধ্যে একজন সমবয়স্কা একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশের বিমাতা পূর্ব্বমত দ্বাররুদ্ধ করিলে দামিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন "একবার উঠ ত।" দামিনী বলিলেন, আমি আর কোথায়ও যাব না; কোথায়ও যাইবার আর আমার স্থান নাই; কেহ আর আমায় স্থান দিবে না। সমবয়স্কা বলিল তবে কি এই খানে মরিবি? দামিনী উত্তর করিলেন এইখানেই মরিব আমার স্থান কোথা? তিনি আমায় এইখানে রাখিয়া গিয়াছেন আমি এইখানেই থাকিব। যতদিন তিনি না এসেন ততদিন যেমন করে পারি বাঁচিব। আমি তাঁরে না দেখে মরিতে পারিব না।

এই বলিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। সমবয়স্কা বলিলেন অন্যত্র না যাও এই বৃক্ষমূলে আসিয়া বস; রৌদ্র অসহ্য হইয়াছে আমরা আর দাঁড়াতে পারি না। দামিনী এই কথায় ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার গৃহে যাও, তোমার গৃহ আছে, গৃহে তোমায় না

দেখিলে তোমার মা ব্যস্ত হবেন, আবার বুড়মানুষ এই রৌদ্রে তোমায় খুঁজিতে আসিবেন।"

প্রতিবাসিনী গৃহে গেলেন, কিন্তু বিস্তরক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। অপরাহ্ন না হইতে হইতেই অদিতি ভট্টাচার্য্যের বাটীর পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দামিনী পূর্ব্বমত একা বৃক্ষমূলে বসিয়া অন্যমনস্কে একটি পক্ষী দেখিতেছেন। আর চক্ষে জল নাই।

প্রতিবাসিনী আসিয়া দামিনীর নিকটে বসিলেন। পরস্পর কেহই ক্ষণেকাল পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না। পরে দামিনী বলিলেন, "যদি এই রাত্রে তিনি আসেন।"

প্র। কে? তোমার স্বামী? তা আসেন ত ভালই হয়। যাহা হউক ভালমন্দ একটা স্থির হইয়া যায়।

দা। তিনি যদি আসিয়া পথ হইতে ফিরে যান?

প্র। সে কি! তাকি হইতে পারে?

দা। পারে। পথে যদি তাঁরে কেহ কোন কথা শুনায়। তিনিও কি আমায় ত্যাগ করিবেন।

প্র। কি জানি ভাই! পুরুষের মন কখন কেমন থাকে তা কে বলিতে পারে?

দা। তিনি আমায় কত ভাল বাসেন। আমায় দেখিতে দেখিতে কাঁদেন। আমায় দেখিবার তাঁর কত সাধ। দেখিবার নিমিত্ত কত ছল করে আমার কাছে আসিয়া বসেন। কত বার কতদিগে বসে দেখেন। আবার কপালে হাত দিয়া দেখেন; দাড়িতে হাত দিয়া দেখেন; ওষ্ঠে হাত দিয়া দেখেন; দেখিয়া আর তাঁহার পরিতৃপ্তি হল না। রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গে উঠিয়া আমার মুখের উপর চাহিয়া থাকেন, আমি পোড়া চক্ষু বুঝিয়া ঘুমাইয়া থাকি।

এই বলিতে বলিতে দামিনীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। দামিনী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী বলিলেন, সন্ধ্যা হইল, রাত্রি যাপন কিরূপে হইবে? কোথায় থাকিবে? দামিনী প্রথমে বলিলেন কি জানি, পরক্ষণেই বলিলেন এইখানেই থাকিব। কে আমায় স্থান দিবে?

প্রতিবাসিনী শিহরিয়া বলিলেন "তাকি স্ত্রীলোকের সাধ্য! এই অন্ধকার বনমধ্যে একা পুরুষে থাকিতে পারে না, তুমি কেমন করিয়াথাকিবে। রাত্রের নিমিত্ত ঘরে না হউক বাটীর অন্য কোন চালায় শ্বশুর শাশুড়ী কি স্থান দিবেন না? অবশ্যই দিবেন।"

দামিনীও সেই আশা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে রাত্রে কেহ না কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু রাত্র হইল প্রতিবাসিনী চলিয়া গেল। কেহ তাঁহার তত্ত্ব করিল না। খিড়কি দ্বার এতক্ষণ মুক্ত ছিল শেষে তাহাও রুদ্ধ হইল।

দামিনী একা অন্ধকারে বসিয়া রহিলেন। রাত্র ক্রমে গভীর হইল। দূরে যে দুইএকটি দীপালোক দেখা যাইতে ছিল তাহা একে একে নিবিয়া গেল। গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে নিদ্রা গেলেন, দামিনীর ভাবনা কেহ ভাবিল না। দামিনী আপনার ভাবনা আপনি ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই একবার ভয় পাইতে লাগিলেন, অন্ধকারে নানা দিগে নানা মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। একা থাকা বিষম হইয়া উঠিল। একে সমস্ত দিন অনাহার, তাহে আবার সমস্ত দিন কাঁদিয়াছেন, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। দামিনী ধূলায় শয়ন করিলেন, শীঘ্র নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে ডাকিল "মা!" স্বপ্নে যেন উত্তর দিলেন, "মা!" স্বপ্নে যেন বোধ

হইল, তাঁহার মা বলিতেছেন, "উঠ মা!—এ ঘরে আর কাজ কি?"।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া কেহ আর দামিনীকে দেখিতে পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দশ বারো দিবস পরে রমেশ বাটী আসিয়া সকল শুনিলেন। পিতাকে কিছু বলিলেন না, বিমাতার প্রতি দোষারোপ করিলেন না, কাহারেও কিছু না বলিয়া বাটীহইতে চলিয়া গেলেন। গ্রামে গ্রামে পথে পথে পাঁচ সাত দিবস ভ্রমণ করিলেন কোথাও দামিনীর সম্বাদ পাইলেন না। শেষে এক দিবস রাত্রশেষে বিষণ্ণভাবে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, নদীতীরে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া দাঁড়াইলেন। ভগ্ন অট্টালিকার অবস্থাসহিত আপনার সাদৃশ্য দেখিলেন। অট্টালিকার আলিসা ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে অশ্বথ বট প্রভৃতি বৃক্ষ, আপন আপন মূল বিদ্ধ করিয়া সাহঙ্কারে তুলিতেছে। দুর্ব্বল অট্টালিকা একা নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহা সহ্য করিতেছে।

রমেশ অগ্রসর হইলেন, দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার মুক্ত ছিল, গৃহ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমাগমশব্দে অসংখ্য চামচিকা বাদুড় অন্ধকারে উড়িতে লাগিল। ক্ষণকালপরে ক্রমে ক্রমে তাহাদের শব্দ থামিল। ঘর ভয়ানক গম্ভীর হইল। রমেশ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই কক্ষান্তরে মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত একটি মৃদু শব্দ শুনিলেন। রমেশের শরীর কণ্টকিত হইল। রমেশ সাবধানে নিঃশব্দে সেইদিগে গেলেন। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন মৃত্যুশয্যায় একটি রুগ্ন মনুষ্য দেহ একা পড়িয়া রহিয়াছে।

রমেশ কি ভাবিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। নরদেহ একেবারে সংজ্ঞাহীন হয় নাই, তাহার কণ্ঠস্বর আবার অল্পে২ নিঃসৃত হইতে লাগিল। "আয়ি! এলে? বসো, আর বিলম্ব করিব না, কেবল একবার রমেশকে দেখে আসি।"

রমেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "দামিনি, দামিনি! আমি এসেছি, আর কখন তোমা ছাড়া হব না।"

দামিনী কোন উত্তর দিলেন না। রমেশ আছড়াইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "আবার কথা কও; অনেক দিন কথা শুনি নাই; আবার কথা কও।" আর কোন উত্তর নাই সকল নিঃশব্দ। রমেশ কথক বুঝিলেন, রুদ্ধশ্বাসে গ্রামমধ্যে গেলেন। তথা হইতে দীপ জ্বালিবার দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিলেন। দেখিলেন সেখানে আর একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া দামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। দামিনী এজন্মের মত চক্ষু মুদিয়াছেন।

রমেশকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, সে ভীষণ হাসি দেখিয়া রমেশের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বৃদ্ধা উঠিল, দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে রমেশের দিগে চাহিয়া রহিল। রমেশ চিনিলেন যে এই পূর্ব্বপরিচিত পাগলী।

পাগলী একবার ওষ্ঠে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চুপ, আমার দামিনী ঘুমাইতেছে; ঘুমাইতেছে;" পরক্ষণেই আবার বিকট হাসি হাসিয়া রমেশের উপর পড়িয়া রমেশের গলদেশ বজ্রবৎ টিপিয়া বলিল, আমি চিনিয়াছি তুই রমেশ; তোর জন্যই আমার দামিনী মরিয়াছে।"

রমেশের শ্বাস রুদ্ধ হইল; চক্ষুর শিরা সকল উঠিল। রমেশ বাক্যরহিত, শক্তিরহিত, শেষে দামিনীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন।

পাগলিনী আবার রমেশের গলদেশ পূর্ব্বমত ধরিল। এবার সকল ফুরাইল।

জলজ—সুন্দরী।

১

নলিনী।

(১)

বিজন কানন স্থলে, সরসীর কাল জলে,
একটী নলিনীমাত্র অই দেখ ফুটেছে।
নিবিড় পল্লব দিয়া, ভয়ে ভয়ে প্রবেশিয়া,
প্রভাতে সোণার ভানু তাহে গলে পড়েছে।
রাঙা গায়ে রবি আল, নলিনী সেজেছে ভাল,
চারিধারে পাতাগুলি ভেসে ভেসে রয়েছে।
বিজনে এমন শোভা, নহে কার মনোলোভা,
রাত্রে যেন ক্ষণ-প্রভা গতি হীনা হয়েছে।

(২)

নলিনি তোমার কাছে, ও নলিনী কোথা আছে,
এজগতে কারে নাহি রূপে তুমি জিনেছ।
তব চারু নেত্র তলে, কত ক্ষণপ্রভা খেলে,
তুমি কি ও রাঙা গায়ে অভরণ দিয়েছ।
স্বর্ণ তব অঙ্গে বাজে, স্বর্ণ কি তোমার সাজে,
শশাঙ্কে রজত শোভা কোথা বল শুনেছ।
সরসী-হিল্লোল দলে, কিবা সে চন্দ্রিকা খেলে
তাহে কি মধুর হাসি হাসিয়ে না দেখেছ।
তব রূপ গুণ যত, সেই জানে আছে কত,
যাহার হৃদয় মাঝে একবার ভেসেছ।

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।

নূতন জীবের সৃষ্টি।

পূর্ব্বকালে যত প্রকার জীব ছিল, অদ্যাপি তত প্রকার আছে, কি তাহার অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে এই কথা যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা হইলে কি উত্তর সম্ভবে? বোধ হয়, প্রথম সৃষ্টিকালে যাহা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা ভিন্ন সচরাচর অনেকেই বলিবেন যে এক্ষণেও তত প্রকারই আছে আর কোন নূতন জীবের সৃজন হয় নাই।

যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহারা বোধ হয় এক প্রকার স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে প্রথম প্রথম পরমেশ্বর পাঁচ সাত দিন এই পৃথিবীতে বসিয়া স্বহস্তে নানা জীব জন্তু সৃজন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আর তিনি পৃথিবীতে আইসেন না, কাজেই আর কোন নূতন প্রকারের জীবসৃজন হয় না।

কিন্তু আর এক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বর আর এ পৃথিবীতে আসুন বা না আসুন, নিজহস্তে আর সৃষ্টি করুন বা না করুন, নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি হইতেছে এবং এই রূপ চিরকাল হইতে থাকিবে। যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহারা দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেক গুলিন সঙ্কর জন্তু দেখাইয়া দেন। গর্দ্দভের গর্ভে আর ঘোড়ার ঔরসে যে স্বতন্ত্র আকৃতির জন্তু জন্মে, তাহাকে তাঁহারা নূতন জন্তু বলেন। এই জন্তু পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় ছিল না; ইহা গর্দ্দভ ও ঘোড়া সৃষ্ট হইলে পর হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর আসিয়া এই জন্তুর সৃষ্টি করেন নাই অথচ ইহার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সঙ্কর পশুটির যেরূপে জন্ম সেইরূপে আর অনেক পশু পক্ষীর জন্ম হইয়াছে। পায়রা আর ঘুঘু সংযোগে যে নূতন

প্রকারের পক্ষী জন্মিয়াছে তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন।

যিনিই ইচ্ছা করেন তিনিই যত্ন পাইলে সঙ্কর জীবের উদ্ভাবন করাইতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পশু কি পক্ষীর মধ্যে যদি আকৃতি প্রকৃতি ও গঠনের বিশেষ বৈলক্ষণ্য না থাকে তবে তাহাদের একত্রে রাখিলে নূতন জীবের উদ্ভাবন হইতে পারে। অনেকেই তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের মহারাজের পশুশালায় একটি নূতন জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় উহা গর্দ্দভ ও গোজাতি দ্বারা উদ্ভাবন করা হইয়াছে।

কতক গুলিন বিজ্ঞান ব্যবসায়ীরা বলেন যে কি ভূচর কি খেচর এখনকার অধিকাংশ প্রধান জন্তু নূতন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় ছিল না, পরে জন্মিয়াছে।

প্রায় সকল দেশের সকল শাস্ত্রের মত যে প্রথমে পৃথিবী জলময় ছিল, কোথায়ও উচ্চভূমি ছিল না। এই কথা যদি সত্য হয় তবে সেই অবস্থায় পৃথিবীতে কোন জন্তু থাকিলে তাহারা জলে বাস করিত। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে অগ্রে জলচর জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। ভূচর জন্তু তখন ছিল না; ভূচরেরা অপেক্ষাকৃত নূতন জন্তু। যদি তাহা হয় তবে প্রথমে আমরা যে কথার প্রস্তাবনা করিয়াছিলাম তাহার এক প্রকার মীমাংসা হইল অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় যত প্রকার জন্তু সৃজন হইয়াছিল এক্ষণে তদ্ব্যতিরেকে অনেক নূতন প্রকার জন্তু জন্মিয়াছে। পৃথিবীতে প্রথমে কেবল জলজন্তু ভিন্ন অন্য কোন জন্তু যে ছিল না তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিজ্ঞানবিদেরা পাইয়াছেন। এস্থলে সে সকল প্রমাণের উল্লেখ করা গেল না। তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে এক্ষণে মনুষ্য যেমন সমুদয় জীবদিগের

মধ্যে প্রধান, সেই রূপ এক সময় পৃথিবীর মধ্যে মৎস্ত প্রধান ছিল। তখন পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদির সৃষ্টি হয় নাই। ক্রমে হইল।

মৎস্যের পর মৎস্ত ও চতুষ্পদ জীবের মধ্যবর্ত্তী কোন জীব জন্মিয়াছিল, তাহার পর বোধ হয় বানরের আবির্ভাব হয়, বানর চতুষ্পদ অথচ দ্বিপদের সদৃশ এবং অঙ্গুলিবিশিষ্ট, বানরের পর মনুষ্য জন্মিয়া থাকিবে।

মৎস্যের পর কি রূপে কোন জীব জন্মিল, আবার তাহার পর কিরূপে মনুষ্যের উৎপত্তি হইল এই সকল বৃত্তান্ত পর্য্যায় ক্রমে নির্দ্দেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সাধ্যও নহে। যে সকল বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান বিশারদেরা এই বিষয়ে চেষ্টা পাইয়াছেন তাঁহারাও যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন এমতও বোধ হয় না।

মৎস্যের পরে চতুষ্পদ তাহার পর মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা কেবল সাহেবেরা যে বলেন এমত নহে। আমাদিগের দশাবতারে এ কথার অল্প ছায়া আছে।—

দশ অবতারের অন্য যে অর্থ থাকুক আমরা ইহা দ্বারা প্রধান প্রধান জীবের পর্য্যায়ক্রমে সৃজনের পরিচয় বুঝিয়াছি।

নারায়ণ প্রথমে মৎস্য অবতার হইলেন। তখন সর্ব্বত্র জল।

পরে নারায়ণ কূর্ম্ম অবতার হইলেন। চতুষ্পদের সূত্রপাত হইল। মৎস্যের চারি ডানার স্থলে চারিটি পদের অল্প গঠন হইল। কূর্ম্ম মৎস্য নহে অথচ সম্পূর্ণ চতুষ্পদও নহে; উভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

অনন্তর নারায়ণ বরাহ হইলেন। এই সম্পূর্ণ চতুষ্পদের আরম্ভ হইল। তখন স্থানে২ ভূমি দেখা দিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় নাই, প্রায় কর্দ্দম ময়।

পরে নারায়ণ নরসিংহ হইলেন। পূর্ব্বে পশুশ্রেষ্ঠ সিংহের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এবার নরের আবির্ভাব হইবে এই মধ্যসময়ে নরসিংহ অবতার। কতক পশু কতক নর। (এই কি Gorrilla গরিলার সৃষ্টি ?)

পঞ্চমবারে নারায়ণ বামন অবতার হইলেন। এই প্রথম মনুষ্য সৃষ্টি হইল, কিন্তু তাহার গঠন এখনও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। পরে মনুষ্য অবতারে তাহা হইল।

অন্য অবতারের উল্লেখ করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। উপস্থিত প্রস্তাবনায় প্রথম ছয় অবতারের পরিচয় আবশ্যক হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা গেল। অবতারের আমরা যে অর্থ বুঝিয়াছি তাহা যদি সঙ্গত হয় তাহা হইলে, সৃষ্টিসম্বন্ধে ইউরোপীয় তত্ত্ববিৎ দিগের অনুভব আমাদের শাস্ত্রের সহিত অনৈক্য নহে। প্রথমে জলজন্তু শেষে অন্যান্য পশুর পর মনুষ্যের সৃষ্টি ইহা উভয়ের মত।

উভয়ের মতানুসারে আর একটি কথা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীতে ক্রমে উন্নত জীবের সৃজন হইতেছে। মৎস্য হইতে ক্রমে ক্ষমতাবান্ বুদ্ধিমান্ জীবের সৃজন হইয়া আসিয়া এক্ষণে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে যদি আরও উন্নত জীবের সৃষ্টি হয় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে মনুষ্য অপেক্ষা ক্ষমতাবান্ ও বুদ্ধিমান্ জীবদিগের সৃষ্টি হইতে থাকিবে। এক্ষণে মনুষ্যের তুলনায় মৎস্য যেরূপ হীন এক সময় মনুষ্য আবার কোন ভাবী জীবের তুলনায় সেইরূপ হীন, বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ক্রমেই যে উন্নত গঠনের জীব সৃষ্ট হইবে এমতও বিজ্ঞানবিদেরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে উন্নতি অধোগতি এতদুভয়েই সম্ভব। তাঁহারা প্রমাণ পাইয়াছেন যে কখন কোন পশুশ্রেণীর আকৃতি

প্রকৃতি সম্বন্ধে ক্রমে উন্নতি হইয়াছে, আবার কখন তাহাদের ক্রমে অধোগতি হইয়াছে। আবার হয়ত কোন পশু পৃথিবী হইতে একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে, সে সকল পশুর অস্থি অদ্যাপিও মৃত্তিকার মধ্যে পাওয়া যায়।

এইরূপ নূতন নূতন জীবের এপৃথিবীতে কেনই বা আবির্ভাব হয় আবার কেনইবা সে জাতির তিরোভাব হয় তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় পরমেশ্বর স্বয়ং এই সৃজন বিসর্জ্জন ব্যাপারে আর লিপ্ত নহেন, তিনি আর স্বয়ং কোন জাতি সৃজন করেন না কিম্বা তাহাদিগকে পৃথিবী হইতে উচ্ছেদ করেন না। এ সকল তাঁহার নিয়মাধীন, নিজের অধীন নহে।

—0○0—

ভারত ভাণ্ডারি।

এক দিবস ভারত ভাণ্ডারি নদীতীরে বসিয়া নৌকা গণিতেছেন এমত সময় একজন আসিয়া বলিল তুমি এখানে বসিয়া কি করিতেছ? শীঘ্র ঘরে যাও তোমার মুনিবের সর্ব্বনাশ হইল তাঁহার ধান্যের গোলায় আগুন লাগিয়াছে। ভারত ভাণ্ডারি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কেমন করে আগুন লাগিবে? গোলার চাবি যে আমার কাছে।"

একবার জনেক বিধবা ভারতের হস্তে একটি টাকা দিয়া বাজারে পাঠাইলেন। ভারত যথাকালে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বিধবাকে দিয়া বলিল, আতব চাউল আট আনার, ঘ্রত চারি আনার, সৈন্ধব দুই আনার এই চৌদ্দ আনার দ্রব্য লও। বিধবা কহিল, "আর দুই আনা?"

ভারত কহিল, "আমি যে তোমার টাকা ধারি, তাহার সুদে কাটান গেল।"

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড।] আষাঢ় ১২৮১। [৩ সংখ্যা।

বৃষ্টি।

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু, একা এক জনে যূথিকা কলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষলক্ষ, কোটি কোটি,—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্দ্ধ পথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে, এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব। নির্ঝর পথে স্ফাটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগের রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের

উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু? ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষা যুদ্ধে, বায়ু ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে, স্থলে জলে এককরি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানলা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। যুবতীর যত্ন নির্ম্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই—সুষুপ্ত সুন্দরীর গায়ের উপর গা ঢালি। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্য ক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে; নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে—তৃণ লতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল কাদম্বিনি! বৃষ্টি কুল প্রসূতি! আয় মা দিগ্মণ্ডল ব্যাপিনি সৌরতেজঃ সংহারিনি! এসো, গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এসো ভগিনি সুচারু হাসিনি চঞ্চলে! বৃষ্টি কুল মুখ আলো কর! আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে, ভূতলে নামি। তুমি বৃত্রমর্ম্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না—এ উৎসবে তোমার মত বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল গর্ব্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও। এই ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্যমধ্যে পড়িও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গ ভাঙ্গ; পোড়াও, ত ঐ উচ্চ দেবালয় চূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধানা ক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাসা চসিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেণেবউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পালাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা! তুই এক খানা রেখে যানা—আমরা খাব। দে মাগির কাপড় ভিজিয়ে দে!

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গ রস জানি। লোকের চাল ফুটা করিয়া ঘরে উকি মারি—দম্পতীর গৃহে ছাদ ফুটা করিয়া টু দিই। যে পথে সুন্দর বৌ জলের কলসী লইয়া যাইবে, সেই পথে পিছল করিয়া রাখি। মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া, ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি মুড়কির দোকান দেখিলে, প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরাণী কাপড় শুকুতে দিলে, প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। ভণ্ড বামুনের জন্য আচমনীয় যাইতেছে দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা কি কম পাত্র! তোমরা সবাই বল— আমরা রসিক।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ পর্ব্বত, কন্দর, দেশ প্রদেশ, ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ নির্ম্মাণ করিব। বিশীর্ণা সূত্রাকারা তটিনীকে, কূলপ্লাবিনী দেশমজ্জিনী অনন্ত দেহধারিণী অনন্ত রঙ্গ রঙ্গিণী জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে!

মানুষ! তুমিও আমাদের মত ক্ষুদ্র! তুমিও, মনে করিলে আমাদের মত বলবান্ হইতে পার। ইহার এক মন্ত্র ঐক্য। একা নামিও না—প্রচণ্ড রৌদ্রে শুকাইয়া যাইবে।

কণ্ঠ মালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিন অপরাহ্নে ছাদে বসিয়া জনেক নাপিতানী একটি অল্পবয়স্কা গৌরাঙ্গীর পদে অলক্তক পরাইতেছিল। নাপিতানী চিত্রকরের ন্যায় অতি সাবধানে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছিল। যুবতী একাগ্রচিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন; উভয়েই নিস্তব্ধ; অনেকক্ষণপরে নাপিতানী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "হয়েছে"। সুন্দরী ঈষৎ বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন "বাঁচলাম, আল্‌তা পরা এত দায়?" নাপিতানী উত্তর করিল "কি করিব মা, কালো পা হলে শীঘ্র আল্‌তা পরা হয়, কিন্তু তোমার মত সুন্দর বর্ণ হলে আল্‌তার রেখা সাবধানে টানিতে হয়; একটু বাঁকা হলে লোকে বলিবে নাপিতানীর চক্ষু ছিল না।"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন "আমার বর্ণ কি এত সুন্দর?"

নাপিতানী বলিল "সে কথা তোমার নিকট আর কি বলিব, আমরা ঘরে বসে সর্ব্বদা বলাবলি করে থাকি। এমন সুন্দর বর্ণ কখন দেখি নাই; এমন সুন্দর গঠনও কখন দেখি নাই; পা দুখানি যেন ননীতে গড়া; চাঁপাফুলের বর্ণ, তাতে আল্‌তার সঙ্গে কত শোভা হয়। ইচ্ছা করে তুমি দুগাছি হীরা কাটা নতুন মল পর; আমরা দেখে চক্ষু সার্থক করি। এই গড়ন, এই বর্ণ, তাতে যদি আল্‌তার উপর মল ঝলমল করে তবে যে কত শোভা হয় তা আর কি বলিব"।

সুন্দরী অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া বলিলেন "তা আর এজন্মে হয়েছে নিত্য যে অন্ন পাই এই যথেষ্ট। আবার হীরাকাটা মল কোথা পাব"।

নাপিতানী বলিল "তা হবে না মা হীরাকাটা মল তোমাকে পরিতেই হবে; তুমি একবার বাবুকে বলিও"। এই বলিয়া নাপিতানী বিদায় হইল। নিকটে একখানি পুরাতন দর্পণ ছিল। যুবতী কি ভাবিতে ভাবিতে দর্পণখানি সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, পরে গাত্র মার্জ্জনী লইয়া ওষ্ঠাধর আর একবার মার্জ্জন করিলেন, অল্প পূর্ব্বে কেশ বিন্যাস করিয়াছিলেন কেশ পূর্ব্বমত বিন্যস্ত আছে তথাপি দর্পণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আরএকবার দুই এক গাছি কেশ উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। তাহা সমাধা হইলে দর্পণ হাতে করিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন; দাঁড়াইয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া স্কন্ধোপরি দিয়া গুল্‌ফ রঞ্জিত অলক্তক রাগ দেখিতে লাগিলেন; দেখিবার নিমিত্ত বাম গুল্‌ফ ঈষৎ তুলিতে হইল, শরীর অল্প বাঁকাইতে হইল বক্ষ ঈষৎ উন্নত হইল ওষ্ঠাধরে অল্প হাসির রেখা খেলিতে লাগিল।

এই ভঙ্গীতে তিনি যাহা দেখিলেন তাহা সুন্দর; এই ভঙ্গীতে তাঁহাকে যে দেখিল সে ও ভাবিল সুন্দর। নিকটস্থ অন্য একটি ছাদে বিলাস বাবু দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন যুবতী তাহা জানিতে পারেন নাই! অলক্তক রাগ তাঁহার দেখা হইলে তিনি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন; পাছে অলক্তক রাগ মুছিয়া যায় এই জন্য পদ প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে বিলাস বাবুর মনে হইল যেন বিদ্যুৎ খেলাইতে খেলাইতে এক খানি গম্ভীর মেঘ চলিয়া গেল।

সুন্দরীর নাম শৈল। বয়স উনবিংশতি বৎসর। তিনি আপনার গৃহে একা ফুটিয়া থাকিতেন, স্বামী ভিন্ন আর কেহ গৃহে ছিল না; স্বামীর নাম বিনোদ, বয়স বত্রিশ বৎসর, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বলিষ্ঠ আমোদ প্রিয়। কোন কারণ প্রযুক্ত পিতৃত্যক্ত অর্থ অনেক দিন

হইল নষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে যে সামান্য আয় ছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন। কষ্ট তিনি সবিশেষ জানিতে পারিতেন না। সাংসারিক অপ্রতুলতা জনিত যত যন্ত্রণা, তাহা প্রায় শৈল একা ভোগ করিত। বিনোদ কেবল আহারের সময় আসিয়া আহার করিতেন কোন বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন না। অপ্রতুলের কোন প্রতীকার করিতে পারিবেন না বলিয়া কোন তত্ত্ব লইতেন না।

শৈল অলক্তক পরিয়া ছাদ হইতে নামিলেন। শয়ন গৃহে স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন "বেলা যে শেষ হইল এখনও স্নান করিতে গেলেনা।" বিনোদ প্রত্যহ অপরাহ্নে স্নান করিতেন; অপরাহ্ন হইয়াছে শুনিয়া গ্রন্থ রাখিয়া উঠিলেন, উঠিলে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল; বিনোদ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসাকরিলেন, "কোথায় রক্ত মাড়াইলে?" শৈল বলিলেন "আলতা পরিয়াছি বলে উপহাস করিতেছ, তবে আমি ধুয়ে ফেলি"

বিনোদ বলিলেন "ধুতে হবে না বড় সুন্দরদেখাতেছে; তোমায় কিসে না সুন্দর দেখায়! সে দিন দৈতোর মার উপর রাগ করিয়া যখন তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলে তখন তোমাকে কত সুন্দর দেখাইতেছিল। সিংহীর ন্যায় কেশ রাশি ফুলাইয়া ঈষৎ বাঁকাভাবে দাঁড়াইয়াছিলে আমি কত সুন্দর দেখিলাম। আর এক দিন একখানি পাঁচিধূতি পরিয়া শরীর কুঞ্চিত করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে সেই কাপড় টানিতেছিলে শরীর ঢাকা পড়ে কিন্তু ঢাকা থাকে না; তুমি লজ্জা পাইতেছিলে লজ্জার হাসি অধর পার্শ্বে টিপিতেছিলে, এক একবার আমার দিকে চুপি চুপি চাহিতেছিলে; আমি তোমার সেই মূর্ত্তি কত সুন্দর দেখিয়াছিলাম।"

শৈল বলিল "আর এক দিন আর এক মূর্ত্তি দেখ; পাঁচিধু-

তিতে সুন্দর দেখিয়াছিলে, আর একদিন বানারসি শাড়ী আর তাহার উপযুক্ত গহনা পরাইয়া দেখ কেমন দেখায়।”

বিনো। কোথায় পাব ?

শৈ। তুমি কোথায় পাবে তা আমি কি জানি? বানারসি শাড়ী না পাও দুগাছা ডাইমন কাটা মল দেও আমার মল পরি- তে বড় সাধ হয়েছে।

বিনো। “এসাধ নিতান্ত অসঙ্গত নহে এসাধ পূরাইতে অধিক ব্যয়ও আবশ্যক নাই কিন্তু” এই কথা বলিয়া একটু বিমর্ষ হইলেন।

শৈল। কিন্তু কি? তুমি যাহা ভাবিতেছ আমি তাহা বুঝি- য়াছি। তোমায় আর ভাবিতে হবে না, আমি মল সত্য সত্য চাই না, মল পরিয়া আমার কি সুখ বাড়িবে? লোকে বলিবে বেশ সুন্দর দেখাতেছে, তাহাতে আমার কি লাভ ? মল না পরিলেও ত তুমি আমায় সুন্দর দেখ, সেই আমার স্বর্গ। মলের কথা লইয়া আমি উপহাস করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম দেখি তুমি কি বল।

বিনো। মল তুমি না পরিতে সাধ কর আমার পরাতে সাধ হয়েছে। আমায় কিছু কালের নিমিত্ত ছুটি দেও, আমি একবার বিদেশে যাই।

শৈল। সে কি! এমন কথা মুখে এননা; আমায় কার কাছে রেখে যাবে, আমার কে আছে? আমি কবে একা থাকিয়াছি? তুমি এই গ্রামে বেড়াইতে যাও একদণ্ড আসিতে বিলম্ব হইলে আমি কাঁদি; তুমি বিদেশে যাবে আর আমি ঘরে নিশ্চিন্ত থাকি- ব? তোমার মত নিষ্ঠুর পুরুষ আর ভারতে নাই; তুমি অনায়াসে স্ত্রীহত্যা করিতে পার; তুমি একথা কি রূপে মুখে আনিলে? আমার টাকায় কাজ নাই, আমার গহনায় কাজ নাই; তুমি আমার

টাকা, তুমি আমার গহনা; তুমি ঘরে থাক আমি দিবা রাত্র দেখি।

বিনো। লোকে কি স্ত্রী ফেলে বিদেশে যায় না?

শৈ। যায় সত্য, কিন্তু সে সকল স্ত্রী ফেলে যাবার উপযুক্ত। আমাকে যদি সেই রূপ ভাব, তবে আমার মরণ ভাল: আমায় অগ্রে মেরে তাহার পর বিদেশে যেও: তোমার পায়ে পড়ি তুমি বিদেশে যাইও না; বিদেশে ভাবিতে গেলে আমার বুকের ভিতর কেমন করে।

স্ত্রীর কাতরতা দেখিয়া বিনোদ বড় ব্যস্ত হইলেন; পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিলেন যে আর কখন বিদেশে যাইবার কথা মুখে আনিবেন না। তাহার পর একখানি গাত্রমার্জ্জনী স্কন্ধে ফেলিয়া শৈলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শৈল তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ভগ্ন স্বরে বলিলেন "কোথায় যাইতেছিলে,যাও, বড় বিলম্ব করিওনা।" বিনোদ ধীরে ধীরে শৈলের একটি হাত আপনার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলেন। শৈলের মুখপ্রতি চাহিতে চাহিতে ক্ষুদ্র অঙ্গুলি গুলি আদরে টিপিলেন। আবার হাতখানি যে খানে ছিল সেই খানে যত্নে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে প্রাঙ্গণ হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন। শৈল তখনও বিমর্ষ ভাবে দ্বারে মাথা হেলাইয়া বিনোদের প্রতি চাহিয়া আছেন। বিনোদের চক্ষে জল আসিল, বিনোদ চলিয়া গেলেন। তিনি দৃষ্টির বাহির হইলে শৈল হাসিয়া উঠিলেন; দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেঁতোর মা, সকল পুরুষ কি এই রূপ নির্ব্বোধ?" দেঁতোর মা উত্তর করিল "একজন ব্যতীত প্রায় সকলেই এই রূপ।"

শৈল। সে কে?

দেঁত। এখন বলিবনা, পরে তুমি আপনিই চিনিতে পারিবে।

এখন সে কথা যাক, বাবু বিদেশে যেতে চাইতেছিলেন, তুমি আবার বারণ করিলে কেন ?

শৈল। অন্যমনস্কে উত্তর করিলেন "আমার ইচ্ছা" এই বলিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে ঘরে গেলেন, পালঙ্কে শয়ন করিলেন; অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মৃৎ পুত্তলিকার ন্যায় পড়িয়া রহিলেন; তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেঁতোর মাকে চুপি চুপি কি বলিলেন। দেঁতোর মা জিজ্ঞাসা করিল "কবে বলিব?" শৈল বলিলেন "এখনই, আর মনে থাকে যেন যে, গহনা হউক আর না হউক তাহার নিমিত্ত ভাবনা চিন্তা নাই।"

দেঁতোর মা ঝাঁটা ফেলিয়া চলিয়া গেল। শৈল কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেন, দুই একবার প্রাঙ্গণে নামিলেন; অকারণে সিন্দুক খুলিলেন। শেষ রেবতী ঠাকুরঝি আসিলে পাড়ার নানা কথা আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গাত্রমার্জ্জনী স্কন্ধে ফেলিয়া বিনোদ বহির্গত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন " শৈলের স্নেহ কি অসীম। আমি তাহার স্নেহের প্রতিশোধ করিবার কোন চেষ্টা করি না অথচ এই ভালবাসা। শৈল কেন এত আমায় ভাল বাসে? আমার ন্যায় অর্থহীন ব্যক্তিকে যে ভালবাসে সে স্বার্থহীন। তাহার ভালবাসা অকৃত্রিম। স্ত্রী মাত্রেই স্বামীকে ভাল বাসে, কিন্তু শৈলের ভালবাসা সচরাচর স্ত্রীর মত নহে। ইহার কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে; এ ভালবাসা সকলের অদৃষ্টে ঘটেনা আমি ভাগ্যবান্। যাহার স্ত্রী এরূপ সুশীলা পতিপরায়ণা সে অবশ্য সুখী।"

এই রূপে সুখানুভব করিতে করিতে যাইতে ছিলেন এমন সময় বিলাস বাবু ডাকিয়া বলিলেন, " ওহে বিলম্ব কর না সন্ধ্যার

পরই তাস আরম্ভ করিতে হইবে।” বিনোদ হাসিয়া উত্তর করিলেন “আচ্ছা”। আবার কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই আর একজন সমবয়স্ক ডাকিয়া বলিলেন “দেখ হে শীঘ্র এসো, অদ্য সন্ধ্যা হইতে কেবল টপ্পা।” বিনোদ হাসিয়া উত্তর দিলেন “আচ্ছা।” আবার কতক দূর গেলে গোপাল বাবু বৈঠকখানা হইতে বলিলেন “শীঘ্র শীঘ্র গা ধুইয়া আইস, এইখানে কাপড় ছাড়িতে হইবে।” বিনোদ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এখানে কি আহারের দৌরাত্ম্য আছে?” গোপাল বাবু বলিলেন “আছে; গুটি কতক খইচুর পাইয়াছি, ভাবিলাম যে অপাত্রে ফেলিব।” বিনোদ বলিলেন “ উত্তম ভাবিয়াছ, এখন দুইএকটা নমুনা পাইতে পারি?” এই সময় কতকগুলিন শিশুর কোলাহল শব্দ গোপাল বাবু শুনিয়া বলিলেন “বুঝেছি ছেলেদের জন্য নমুনা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু তাহা উহাদের দেওয়া বৃথা। ছেলেরা এসব জিনিসের আস্বাদন বুঝিতে পারেনা।” বিনোদ ভাবিলেন “আমিই কোন পারি।” এই সময়ে শিশুরা আসিয়া বিনোদকে ঘেরিল; কেহ পৃষ্ঠের উপর উঠিল, কেহ গলা ধরিল, কেহ কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। তিনি একে একে সকলকে বুকে তুলিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। “আমি আগে, আমি আগে,” বলিয়া অনেক ছেলে হাত তুলিতে লাগিল। গোপাল বাবুর দেড় বৎসরের একটি পুত্র তাহার অষ্টম বর্ষীয়া ভগিনীর ক্রোড়ে আসিয়া বিনোদবাবুর সম্মুখে হেলিয়া পড়িল। বিনোদ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন; শিশু ভগিনীর প্রতি চাহিয়া মাথা হেলাইয়া হাসিতে লাগিল যেন ভগিনীকে বলিতে লাগিল “ দেখিলি? আমি কোলে উঠেছি।” আবার বিনোদ বাবুর দিকে ফিরিয়া সহাস্য বদনে চাহিতে লাগিল; তাঁহার ওষ্ঠের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল “এই কাকা।”

সে স্থান হইতে বিনোদ চলিলেন। শিশুরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে এই শিশুর পল্টন দেখিয়া ছাগীরা দুগ্ধস্থলী দোলাইতে দোলাইতে, পলাইতে লাগিল। তাহাদের একটি বৎস ধরা পড়িল। একটি উলঙ্গ ছেলে বৎসটিকে পেটের উপর তুলিল; আর এক জন কোলে লইতে পারিল না বলিয়া পা ধরিয়া টানিতে লাগিল। গোপাল বাবুর সন্তানটি ভগিনীর ক্রোড় হইতে হেলিয়া পড়িয়া ছাগশিশুর মুখে অঙ্গুলি দিয়া ভগিনীকে দেখাইতে লাগিল "এই ব্যা" বিনোদ বহুযত্নে ছাগশিশুকে অব্যাহতি দিয়া পদ্ম পুষ্করিণীর দিকে চলিলেন। ছেলেরাও সঙ্গে চলিল। পুষ্করিণীর কূলে দাঁড়াইয়া কে কোন পদ্মটি লইবে তাহা দেখাইয়া দিতে লাগিল। বিনোদ বাবু জলে নামিলেন। জলের পক্ষীরা চারিদিক্ হইতে কোলাহল করিয়া এক স্থান হইতে উড়িয়া আর এক স্থানে পড়িতে লাগিল, পাপড়ি ভাঙ্গিতে লাগিল, পাতা ছিঁড়িতে লাগিল। বিনোদ তাঁহাদের গালি দিতে লাগিলেন; ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে গালি দিতে লাগিল। জলে চলিতে চলিতে বিনোদ বাবু জল দোলাইতে লাগিলেন। জলের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মেরা দুলিয়া উঠিল। ভ্রমরগণ পদ্ম ছাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া পদ্ম বেড়িয়া উড়িতে লাগিল। পদ্ম অস্থির দেখিয়া শেষ অন্যদিগে বেগে উড়িয়া গেল। বিনোদ হাসিয়া গাইতে লাগিলেন।

"ও বঁধু যেও না হে যেও না,
রাগ করে যেও না।"

সঙ্গে সঙ্গে শিশুরাও গাইয়া উঠিল।

"দেও না দেওনা আগ কলে দেও না"

বিনোদ বাবুর সকল গীত, সকল শ্লোক ছেলেরা জানিত; বিনোদ গাইলে তাহারাও গাইত। বিনোদ পদ্ম তুলিয়া এক

একটি সকলের হাতে দিলেন, আনন্দে ছেলেরা নাচিতে লাগিল; এক জন কাঁদিয়া উঠিল, বলিল " আমার পদ্ম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেও।" পদ্মকলি জলে মাথা তুলিয়াছিল; শিশুর হাতে আসিয়া তাহার মাথা হেলিয়া পড়িল। ক্রোড়স্থ শিশুর নিদ্রা আসিলে যেরূপ মার স্কন্ধে মাথা হেলিয়া পড়ে, পদ্মকলির মাথা সেইরূপ হেলিয়া পড়িয়াছিল। বালক কাজেই মনে করিল আমার পদ্ম ঘুমাইয়াছে। বিনোদ সেই ঘুম ভাঙ্গাইতে নানা কৌশল করিতে লাগিলেন।

এদিকে রেবতী ঠাকুরঝি, শৈলের সঙ্গে বিনোদ সম্বন্ধে বিতণ্ডা আরম্ভ করিয়াছিলেন। রেবতী বলিতেছিলেন বিনোদ নির্ব্বিরোধী। শৈল তাহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন; বলিতেছিলেন, " যে, তাঁহার বিরোধের জ্বালায় আমার বিড়াল প্রায় বাড়ী ছাড়া হইয়াছে, বাছা পুকুর ধারে বনের ভিতর বসিয়া আমায় ডাকে।" রেবতী বলিলেন " বিনোদ যথার্থ সুখী।" শৈল উত্তর করিলেন " তাঁহার সুখের কথা ছেড়ে দেও, তিনি যে কিসে সুখী না হন তাহা বলিতে পারি না; পূর্ণিমায় বলেন ' দেখ কেমন পৃথিবী হাসিতেছে, এ পৃথিবীতে লোকে আবার কেমন করে অসুখী হয়, জ্যোৎস্না সুন্দর, শাদা ফুলগুলিন সুন্দর, তুমিও সুন্দর আমি কেন সুখী না হইব।' আবার অমাবস্যার রাত্রে বলেন ' দেখ, দেখ, রাত্র কেমন অন্ধকার; মরি, মরি, এ অন্ধকার যে না দেখিল সে এ পৃথিবীর কিছুই দেখিল না।"

এইরূপ কথা হইতেছে এমত সময় বিনোদ বাবু গোপালের শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পুরবি আলাপচারি করিতে করিতে গৃহ প্রবেশ করিলেন। রেবতী উঠিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিবস অপরাহ্নে শয়নকক্ষে বসিয়া শৈল সুন্দরী কেশ বিন্যাস করিতেছেন, নিকটে দেঁতোর মা বসিয়া আছে। কেশ বিন্যাস করিতে করিতে শৈল অন্যমনস্ক হইলেন; দক্ষিণ হস্তে কেশগুচ্ছ ধরিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটী করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন; কিঞ্চিৎ পরে দেঁতোর মার প্রতি অতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সকালে আমায় যে কথা বলিতেছিলি তা কি সত্য?" দেঁতোর মা সভয়ে উত্তর করিল "মিথ্যা বলে আমার কি ফল; আমি কবে তোমার নিকট মিথ্যা বলেছি? আমি তোমার খাই, তুমি যা বল তাই করি, তোমায় যে যা বলিতে বলে আমি তখনই আসিয়া তাই বলি।"

শৈ। "সে কেমন পুরুষ? ছেলের গলা হতে একখানা গহনা খুলে নিতে পারিলে না, ছি, ছি, সে আবার পুরুষ?"

দেঁ। "তিনি বলেন যে আমার ভয় করে।"

শৈ। "ভয় করে? তার মুণ্ডু করে! সকল পুরুষই কি জন্তু? এমন আকার, এমন শরীর, পোড়া! তার ভিতরেও কি ভয়? বুঝিলাম পুরুষমাত্রেই ভীত—আজন্মভীত। তাহারা ছেলেবেলা মার আচল ধরে বেড়ায়; যৌবনে স্ত্রীর আঁচল ধরে; বুড়া হলে মেয়ের আঁচলে মরে। বোকার জাত! দেবতার পুরুষেরাও নাকি এইরূপ জন্তু ছিল। তাহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না; মহিষাসুর দেখিলেন অমনি পালিয়ে স্ত্রীর আঁচল ধরিলেন; শুম্ভ নিশুম্ভ এলো অমনি দৌড়। শেষ তাহাদের স্ত্রী আসিয়া অসুর দমন করিয়া দিত, তখন দাঁত বার করে স্তব করিতেন, 'আপনি সাক্ষাৎ শক্তি, আদ্যাশক্তি, রক্তারক্তি।' মরণ আর কি! জন্তুর জাত! এই সকল দেখে শুনে

কালী আর থাকিতে না পেরে শেষ শিবের বুকে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; খুব করেছিলেন।”

দৈ। “আমরা ছোটলোকের মেয়ে— এ সকল কি জানি না; তোমরা ভদ্রলোকের মেয়ে পাঁচটা শাস্ত্র জান। আমরা কেবল এই বুঝি যে দেঁতোর বাপ বেঁচে থাকিলে আমি আজ দাসী হতেম না।”

শৈ। “সে কথা সত্য; আমাদের সেবা করিবার জন্য একটা আধটা পুরুষ আবশ্যক; সংসার করিতে যেমন গোরু পুষিতে হয়, তেমনি আবার পুরুষ পুষিতে হয়; আমাদের যখন যা চাই তখনই তা আনিয়া দিবার জন্য পুরুষগুলার আবশ্যক। যে অকর্ম্মা সে সকল আনিয়া দিতে পারে না—তারে আমাদের কাজ নাই।”

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমত সময় বিনোদ বাবু গৃহে আসিলেন; শৈলকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। শৈলের ভয় হইল; সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন হাসিলে?” বিনোদ কোন উত্তর না করিয়া হাসিয়া বলিলেন “আমার পাশে বসে তোমার ঐ সুন্দর অঙ্গুলিগুলিন আমার মাথায় দেও—আমি শয়ন করে তোমায় দেখি।”

শৈ। এ আবার কি?

বি। কে জানে কেন, আমার এ সাধ গিয়াছে। এই সাধ হল বলে তাস খেলিতে খেলিতে উঠে এলেম।

এই কথা শুনিয়া শৈলের ভাবনা গেল, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন “আমার কত ভাগ্য যে তোমার এ সাধ হয়েছে। তোমার গায়ে পায়ে হাত বুলাইব এই আমার চির-সাধ; কিন্তু তোমার দেখা আমি কোথা পাইব? তুমি সর্ব্বদা অস্থির; কেবল পাড়ায় তাস খেলে গান বাজনা করে বেড়াও;

যদি ঘরে এস এমনি সময় বুঝে এস যে আমি সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকি, তোমার পদসেবা করিতে পারি না। আমার অদৃষ্টে থাকিলে ত আমি পতির পদসেবা করিতে পাব।

বি। তুমি ইচ্ছা করিলেই আমি কোন্ তোমায় পদ সেবার যন্ত্রণা দিই, আমি ত সত্য সত্য দেবতা নই যে সিংহাসনে বসে তোমার সেবা খাব আর তুমি এই আমার বাঁকা পা পূজে পুণ্য জমাবে।

এই সময় গোপাল বাবুর কন্যা আপনার সহোদরকে ক্রোড়ে করিয়া বিনোদ বাবুকে ডাকিতে আসিল। বিনোদ বাবু অনিচ্ছায় উঠিয়া গেলে শৈল শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

প্রহরেক রাত্র অতীত হইলে পর দেঁতোর মাকে ডাকিয়া শৈল বলিলেন "সেই কা পুরুষকে তুই বলে আয় যে সে যাতে ভয় পাইয়াছিল আমি তাহাতে ভয় পাই নাই। আমি গহনা সংগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে আর যা করিতে হয় সে তা করে।"

দেঁ। "সে কি! গৃহস্থের বউ হয়ে এমন কর্ম্ম? বিনোদ বাবুর পরিবার হয়ে এ দিগে তোমার মন কেন গেল? গহনা নাই বা পরিলে? এত লোকের গহনা নাই তাদের কি দিন যায় না?"

শৈ। "মর্ নেকি! তোর আবার ভয় হলো, কিসের ভয়? আমি কণ্ঠ মালা লইয়াছি তা কে দেখেছে যে তোর ভয় হলো? বিপদ পড়ে, জানিস্ নে যে, ঘরে একটা পুরুষ বাঁধা আছে; সকল বালাই তার ঘাড়ে যাবে।"

দেঁ। "এসকল পাপ কর্ম্ম। একবার পরকাল দিগে দেখিতে হয়।"

শৈ। "মর মাগি! আমায় আবার পরকাল দেখাতে এলো; আমার খাবি, আবার আমায় গালি দিবি; জানিস না

যে ঝাঁটা পেটা করিব! পাপ হয় আমার হবে, না হয় একদিন গঙ্গাস্নান করে আসিব, কি জগন্নাথ দেখে আসিব, তা হলেই ত তোদের কাছে ধার্ম্মিক হব। এখন যা আমি যাহা বলিতে বলিলাম তাহা বলিয়া আয়।”

দেঁতোর মা অগত্যা ধীরে ধীরে বিলাস বাবুর বাটীতে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে প্রাঙ্গণপার্শ্বে বসিয়া বিনোদ মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন এমত সময় দুই জন কনেষ্টবল আসিয়া খড়কি দ্বারে দাঁড়াইল। সেই সঙ্গে অপর দ্বার দিয়া আর কতকগুলিন কনেষ্টবল ও পুলিস দারোগা, গোপাল বাবু বিলাস বাবু প্রভৃতি আসিলেন। বিনোদ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন। শেষ তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইলে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?”

দারোগা উত্তর করিলেন, “স্বপ্ন নহে, যাহা দেখিতেছেন তাহা প্রকৃত বটে; পাড়ায় একটা চুরী হইয়াছে, সেই চুরীর দ্রব্য অনুসন্ধান করিতে আমি আপনার বাড়ী আসিয়াছি। গোপাল বাবুর বালিকা কন্যা বৈকালে তাহার ছোট ভাইকে কোলে লইয়া আপনার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। রাত্রে ঘরে গেলে গোপাল বাবুর পরিবার দেখিলেন, শিশুর গলায় কণ্ঠমালা নাই। প্রাতে আমি সেই সম্বাদ পাইয়া তদন্ত করিতে আসিয়াছি, অতএব বিলম্ব করিবেন না; আপনার পরিবার ও দাসীকে এই পাকশালায় শীঘ্র আসিতে বলুন।” বিনোদ বাবু উঠিলেন, একবার গোপালবাবুর দিকে চাহিলেন। গোপাল

বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আমি কি করিব ভাই, চুরী গিয়াছে, পুলিষে জানাইতে হয়, আমি জানাইয়াছি। এত-দূর হইবে অনুভব করিতে পারি নাই। আমি ইতস্ততঃ করিয়া-ছিলাম, কিন্তু বিলাস বাবু জেদ করিলেন, বলিলেন, ফৌজদারি আইন শক্ত, পুলিষে সম্বাদ না দিলে আবার হয় ত কি ঘটিবে। অতঃপর এই হইল যে কেহ কাহারও সন্তানকে আদর করিবে না, ঘরেও আসিতে দিবে না।"

বিনোদের পরিবার পাকশালায় আসিল। দারোগা প্রথমে ভস্মস্তূপ, নাউমাচার তলা, এদিক্ সেদিক্ সকল সন্ধান করি-লেন। শেষ সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। বিলাস বাবু এই সময় একটু হাসি, ওষ্ঠপ্রান্তে দমন করিতেছিলেন, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

দারোগা প্রথমে দুই একটি সিন্ধুক পেটারা সন্ধান করিলেন; তাহার পর একটি ক্ষুদ্র বাক্স বিনোদকে খুলিতে বলিলেন। বাক্সটি শৈলের; বিনোদ তাহার নিকট হইতে চাবি চাহিয়া আনিয়াছিলেন; সেই চাবিদ্বারা বাক্স খুলিয়া দিলেন। দারোগা দুই একটি জিনিস তুলিবামাত্রই চোরা কণ্ঠমালা বাহির হইল। তাহা দেখিবামাত্র বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন, এক দৃষ্টিতে কণ্ঠ-মালার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে দুই একটি পূর্ব্বকথা তাঁহার স্মরণ হইল; অলঙ্কারের নিমিত্ত শৈলের পূর্ব্ব উত্তেজনা মনে পড়িল। আবার এখনই যে শৈলকে কনেষ্টবলেরা লইয়া যাইবে, তাহাকে উপলক্ষ করিয়া পথে কত রসিকতা করিবে, হয়ত ধাক্কা মারিবে, এই সকল আশঙ্কা শেলবৎ বিনোদের হৃদয়ে আসিল। দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাক্স কাহার?" বিনোদ পরিষ্কার স্বরে বলিলেন, "বাক্স আমার।" দারোগা

কহিলেন, "কিরূপে কণ্ঠমালা এ বাক্সে আসিল?" বিনোদ উত্তর করিলেন, "আমি রাখিয়াছিলাম।"

দা। আপনি তবে চুরি একরার করিতেছেন?

বি। একরার করিতেছি।

তাহার পর আর কেহ কোন কথা বলিলেন না, সকলে নিঃশব্দে গৃহহইতে বাহির হইলেন। পথে আসিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন। "দারোগা তোমার হাতকড়ি কই?"

দারোগা বলিলেন, "হাতকড়ি ইতর লোকের নিমিত্ত।"

বিনোদ বলিলেন "আমি ইতর লোক, আমায় শীঘ্র হাতকড়ি দেও, আমার অসহ্য হইয়াছে।"

জমাদার কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া হাতকড়ি পরাইতে লাগিলেন।

বিনোদ। জোরে, আরও উপরে,

বিনোদ বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলে তাঁহার আদরের স্ত্রী পাকশালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। সকলে গিয়াছে দেখিয়া দেঁতোর মাকে বলিলেন "ওলো শীঘ্র আয়; এই বেলা আমরা কাঁদিতে বসি, নইলে পাড়ার পোড়া লোকেরা কি মনে করিবে।" এই বলিয়া উঠানের মধ্যস্থানে সাবধানে বসিলেন, পাছে বস্ত্রে ধূলা লাগে এই জন্য সাবধানে বসিলেন। বসিয়া রীতিমত সুর করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন "ওগো আমার কি হলো গো।"

দেঁ। কি হলো গো।

শৈ। অকস্মাৎ এ বজ্রাঘাত কেন হলো গো। কে এমন করিলে গো।

দেঁ। সোণার চাঁদ বাবুর দশা কি হলো গো।

শৈ। আমর মাগি, সত্য সত্যই যে কাঁদলি।

দেঁ। কে জানে, আমার প্রাণের ভিতর কেঁদে উঠিতেছে। বাবু শাদা শিদে। এ সব কিছুই জানেন না। তিনি যে তোমায় বড় ভালবাসেন; তুমিই তার এই দশা করিলে! তাঁর প্রাণের ভিতর কি হতেছে ভাব দেখি।

শৈলের চক্ষে সত্য সত্যই একটু জল আসিল। এই সময় প্রতিবাসীরা আসিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। সকলেই অমঙ্গল সূচক কান্না নিষেধ করিল। শৈল আর চক্ষের জল ফেলিলেন না।

যে গ্রামে বিনোদের বাস, তথা হইতে মেজেষ্টরি কাছারি প্রায় তিন ক্রোশ পথ। মধ্যাহ্নকালে মেজেষ্টর বসিয়া কাছারি করিতেছেন এমত সময় দারোগা বামাল সমেত আসামীকে হাজির করিলেন। গোপাল বাবু চুরীর এজাহার দিলেন। বিনোদের বাক্স হইতে চুরীর দ্রব্য যে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে। দাস বাবু ও আর একটি ভদ্রলোক সাক্ষ দিলেন। শেষ বিনোদ স্বয়ং চুরী স্বীকার করিলেন। বিনোদের প্রতি এক বৎসর সশ্রমে কারাবাসের আজ্ঞা হইল। কিন্তু হুকুম দিবার সময় মেজেষ্টর বলিলেন যে "এই আসামীর কোন পরিচয় আমি জানি না; ইহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। কিন্তু দেখিবা মাত্র, ইহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইহার মুখের প্রতি অঙ্গে নির্ম্মলতা, সরলতা অঙ্কিত রহিয়াছে। যে মেজেষ্টরেরা মুখ দেখে বিশ্বাস করেন তাঁহারা যে কত ভুল করেন, তাহা এই মুখ দেখে বুঝিতে পারিলাম।"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলে আসামীর প্রতি চাহিল। বিনোদ তখন অধোমুখে কি ভাবিতেছিলেন; মেজেষ্টরের কথা শুনেন নাই। তাঁহার মুখে অভিমান দৃষ্ট হইল। এই অভিমান শৈলের প্রতি হইয়াছিল।

মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে এক জন কনেষ্টবল তাঁহার

গাত্রে হাত দিয়া বলিল " চল।" বিনোদ অন্যমনস্কে চলিলেন। পরে জেলখানার দ্বারে আসিয়া কনেষ্টবলগণ দাঁড়াইল। জেলের লৌহনির্ম্মিত ভীম কবাটের ভীষণ ঘর্ষণ শব্দ হইল; বিনোদ চাহিয়া দেখিলেন জেলখানা। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কত দিনের মেয়াদ হইয়াছে?" এক জন কনেষ্টবল বলিল "এক বৎসর।" বিনোদ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন গোপাল বাবু অতি বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারে কোন কথা বলিলেন না, পরস্পরে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ গোপাল বাবুর চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল; তাহা দেখিয়া বিনোদ বলিলেন " আমি চলিলাম! আপনি ঘরে যান, তথায় সকলে আপনার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে। আমার বাড়ীতে বলিবেন 'শৈ—" আর বলিতে পারিলেন না, বিনোদ কাঁদিয়া উঠিলেন; শেষকিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বলিলেন " দাদা, আমার শৈলকে দেখ,—অল্প বয়স, এতটা বুঝিতে পারে নাই—এতক্ষণ বুঝিয়াছে —তার আর কেহ রহিল না" শেষ কথাগুলিন অতি ধীরে ধীরে অন্যমনস্কে বলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ছয় মাস অতীত হইল। বিনোদ বাবু জেলখানায় আছেন; উৎকট পরিশ্রমে উৎকট পীড়া জন্মিয়াছে। আর সে গৌর কান্তি নাই, আকার আর সরল নাই—ঈষৎ নত হইয়াছে। স্কন্ধাগ্র উচ্চ হইয়াছে, গলদেশ যেন দেহমধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, দৃষ্টি বিকট হইয়াছে, কপোলে রেখা পড়িয়াছে চক্ষুপার্শ্বে শিরা উঠিয়াছে। মুখ কেবল অস্থিময় হইয়াছে।

বিনোদবাবু এই অবস্থায় একদিন অপরাহ্নে একটি স্তম্ভে মাথা

ঠেশদিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন; পার্শ্বদ্বয় উঠিতেছে পড়িতেছে। নিকটে একটি ঘানি, ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে, তিন চারিজন কয়েদী তাহা বহুশ্রমে ঘুরাইতেছে। এই কয়েদীদিগের মধ্যে শম্ভুনামে একজন নিকটে আসিয়া মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু, কষ্ট কমিয়াছে?" বিনোদ উত্তর করিলেন "অনেক।" কয়েদী প্রসন্ন বদনে ফিরিয়া ঘানিতে বুক দিল। ঘানি এবার অপেক্ষাকৃত শীঘ্র চলিতে লাগিল।

ক্ষণেক বিলম্বে বিনোদ বাবু সুস্থ হইয়া ঘানি ফিরাইতে গেলেন। সঙ্গীরা ঘানি স্পর্শ করিতে দিল না, বলিল "আবার পরিশ্রম করিলে আর বাঁচবে না" বিনোদ বলিলেন, "আমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে ওবারসিয়ার বাঁচাবেনা।" শম্ভু বলিল "তার সঙ্গে আমি বুঝিব।"

এই কথা বলিতে বলিতেই ওবারসিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদ বাবুর প্রতি অতি তীব্র দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে কৃষ্ণঠাকুরের মত দাঁড়াইয়া আছ?" বিনোদ বলিলেন, "বড় পীড়া বোধ হইয়াছে তাই একটু দাঁড়াইয়াছি।"

ওবা। পীড়া হইয়া থাকে ডাক্তরকে বলিও, আমার কাছে সে কথা খাটিবে না। কেন? ডাক্তার যে বড় মোটা দরমাহা খায়, পীড়া ভাল করিতে পারে না! আজ তোমায় রাত্র একপ্রহর পর্য্যন্ত ঘানি চালাইতে হইবে; একা চালাইতে হইবে; না পার পিঠের ছাল যাবে।

শম্ভুকয়েদী এতক্ষণ কিছু বলে নাই; শেষ এই কথা শুনিয়া ওবারসিয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীর ভাবে বলিল "বিনোদ বাবুকে আমি কাজ করিতে দিই নাই, আর তুমি যদি মনুষ্যের জাত হতে, তুমিও কাজ করিতে দিতে না। বিনোদ বাবুর আকার দেখ, তাহার পর হুকুম জারি করিও।"

ওবা। চোর আবার বাবু হলো কবে?

শম্ভু। সাবধানে কথা কও, বিনোদ বাবুকে যদি অমান্য কর, তবে নিশ্চয় তোমার মরণ। তার নমুনা দেখ এই বলিয়া এক চড়।

ওবারসিয়ার বসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রাগভরে চলিয়া গেল। বিনোদ ধীরে ধীরে বলিলেন "কর্ম্ম ভাল হইল না।"

কর্ম্ম যে ভাল হয় নাই তাহা এক ঘণ্টার মধ্যে জানা গেল। সন্ধ্যার সময় একজন প্রহরী আসিয়া বিনোদকে জেল দারোগার নিকট লইয়া গেল। জেল দারোগা একজন ইতর সাহেব। তিনি কতক হিন্দি কতক ইংরাজিতে বলিলেন, "তুমি অদ্য কর্ম্ম কর নাই বলিয়া তোমার নামে রিপোর্ট হইয়াছিল, তোমার প্রতি চারি বেতের হুকুম আসিয়াছে, অতএব প্রস্তুত হও।" বিনোদ বাবু অধোবদনে রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না; হুকুম তামিল হইল।

রাত্র দুই প্রহরের সময় বিনোদের চেতন হইল; দেখিলেন কে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বাজন করিতেছে। ভাবিলেন, "এ শৈল" অতএব মৃদুস্বরে বলিলেন "শৈল, তোমার হাতে ব্যথা হবে; শৈল, রাত্র অনেক হয়েছে।" পার্শ্বে যে বসিয়াছিল সে ব্যক্তি বলিল, "আমি শৈল নই, শৈল তোমার কে?" বিনোদ উত্তর করিলেন। "শৈল আমার সর্ব্বস্ব! তুমি কে?" পার্শ্ববর্ত্তী বলিল "আমি শম্ভু।"

বিনোদ দুই একবার মুখে বলিলেন, "শম্ভু! শম্ভু! শম্ভু কে? আমি তবে কোথায়?" শম্ভু উত্তর করিল, "তুমি জেলখানায় শুয়ে আছ।"

বিনোদের সকল মনে পড়িল, মর্ম্ম পীড়ায় একটি অস্ফুট শব্দ করিয়া চুপ করিলেন। অনেক ক্ষণ আর কোন কথা কহি-

লেন না। ক্রমে নিদ্রা আসিল, কিন্তু নিদ্রা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। বেত্রাঘাতে অঙ্গে বেদনা হইয়াছে শয়ন অসাধ্য হইল; ধীরে ধীরে হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিলেন, "শম্ভুখুড়া, আমায় তোল; আমি আর পারি না।" শম্ভু বিনোদকে তুলিল, কিন্তু বিনোদ বসিতে পারিলেন না, পশ্চাৎভাগ বড় বেদনা। বলিলেন, "আমায় দাঁড় করাও।" কিন্তু বিস্তরক্ষণ দাঁড়াইতেও পারিলেন না, শরীর কাঁপিতে লাগিল, বসিতেও ভয় হইল, শয়নের ত কথা নাই, অবস্থা বিষম হইয়া পড়িল। তখন শম্ভুর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বিনোদ কাঁদিয়া বলিলেন "শৈল! কেন এমন কাজ করেছিলে?"

অনেকক্ষণ পরে শম্ভু জানিতে পারিল বিনোদ বাবু অচেতন হইয়াছেন তখন তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখিল।

ক্রমশঃ

জলে আলো।

১

সুখের কার্ত্তিক মাস—প্রদোষ সময়,
স্থির বায়ু, স্থির পত্র—স্থির সমুদয়।
নিথর জাহ্নবী-জলে,
একটী আলোক জ্বলে,
একটী নক্ষত্র যেন ভাসে বোধ হয়;
বিস্মিত হইয়া নীরে,
যায় চলে ধীরে ধীরে—
ক্রমেতে হতেছে রাত্রি অন্ধকারময়;
চারি দিকে বারি রাশি,
তাহাতে যেতেছে ভাসি,

এখনি নিবিবে মনে হতেছে সংশয়,
কেজ্বালিল জলে আলো—অবোধ-হৃদয়?
নিবে নিবে যায় যায়,
তবু না নির্ব্বাণ পায়,
আবার পূর্ব্বের মত,
স্থির রশ্মি শত শত,
নাজানি এরূপ ভাবে কতক্ষণ রয়—
অই জলেতে আলো জ্বলে শোভাময়।

২

গগনে অসংখ্য তারা উদয় হইয়া
কেনরে দেখিছ রঙ্গ হাসিয়া হাসিয়া?
তোরাত বিমানবাসী
ভূমণ্ডল দেখ হাসি
বল দেখি স্রোতোভরে কত দূর গিয়া
নিবিবেক অই আলো-আঁধার করিয়া?

৩

এখনো নিশ্চল বায়,
জলে ভেসে আলো যায়,
কিন্তু যবে তটিনীর বিশাল হৃদয়
তরঙ্গে আকুল হবে
কে আলো রাখিবে তবে
কেতারে যতন করি দিবেক আশ্রয়।
দেখিতে দেখিতে আলো,
দৃষ্টি পথ ছেড়ে গেল,
আমি সেই তীরে বসি
আলো কোথা গেল ভাসি
চারিদিক্ অন্ধকার দেখি সমুদায়!
মরি কি জলেতে আলো জ্বলে শোভাময়!

৫ কার্ত্তিক ১২৮০। শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড।] শ্রাবণ ১২৮১। [৪ সংখ্যা।

কণ্ঠমালা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে বিনোদ বেত্রাঘাতে আহত হইয়া জেলখানায় অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সেই রাত্রে গোপাল বাবু আপন শয়নঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার সন্তানেরা নিদ্রা যায় নাই; কেহ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, কেহ বসিয়া বলিতেছে "আমি ঘুমাইব না।" এই সময় কেহ তাহারে শয়ন করিতে বলিলেই সে কাঁদিয়া উঠিতেছে। তাহাদের গর্ভধারিণী নিকটে বসিয়া আদর করিয়া ভুলাইতেছেন।

এই সময় গোপাল বাবুর সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানটি মাকে জিজ্ঞাসা করিল "কাকা কুতা?"

গোপাল বাবুর পরিবার বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে কাকা?"

শিশু বলিল "সেই কাকা?"

গৃহিণী বলিলেন "কোন কাকা?"

শিশু ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটি উচ্চ করিয়া বলিল "সেই।" তথাপি গর্ভ-

এখনি নিবিবে মনে হতেছে সংশয়,
কেজ্বালিল জলে আলো—অবোধ-হৃদয়?
নিবে নিবে যায় যায়,
তবু না নির্ব্বাণ পায়,
আবার পূর্ব্বের মত,
স্থির রশ্মি শত শত,
নাজানি এরূপ ভাবে কতক্ষণ রয়—
অই জলেতে আলো জ্বলে শোভাময়।

২

গগনে অসংখ্য তারা উদয় হইয়া
কনরে দেখিছ রঙ্গ হাসিয়া হাসিয়া?
তোরাত বিমানবাসী
ভূমণ্ডল দেখ হাসি
বল দেখি স্রোতোভরে কত দূর গিয়া
নিবিবেক অই আলো-আঁধার করিয়া?

৩

এখনো নিশ্চল বায়,
জলে ভেসে আলো যায়,
কিন্তু যবে তটিনীর বিশাল হৃদয়
তরঙ্গে আকুল হবে
কে আলো রাখিবে তবে
কেতারে যতন করি দিবেক আশ্রয়।
দেখিতে দেখিতে আলো,
দৃষ্টি পথ ছেড়ে গেল,
আমি সেই তীরে বসি
আলো কোথা গেল ভাসি
চারিদিক্ অন্ধকার দেখি সমুদায়!
মরি কি জলেতে আলো জ্বলে শোভাময়!

৫ কার্ত্তিক ১২৮০। শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড।] শ্রাবণ ১২৮১। [৪ সংখ্যা।

কণ্ঠমালা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে বিনোদ বেত্রাঘাতে আহত হইয়া জেলখানায় অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সেই রাত্রে গোপাল বাবু আপন শয়নঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার সন্তানেরা নিদ্রা যায় নাই; কেহ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, কেহ বসিয়া বলিতেছে "আমি ঘুমাইব না।" এই সময় কেহ তাহারে শয়ন করিতে বলিলেই সে কাঁদিয়া উঠিতেছে। তাহাদের গর্ভধারিণী নিকটে বসিয়া আদর করিয়া ভুলাইতেছেন।

এই সময় গোপাল বাবুর সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানটি মাকে জিজ্ঞাসা করিল "কাকা কুতা?"

গোপাল বাবুর পরিবার বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে কাকা?"

শিশু বলিল "সেই কাকা?"

গৃহিণী বলিলেন "কোন কাকা?"

শিশু ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটি উচ্চ করিয়া বলিল "সেই।" তথাপি গর্ভ-

ধারিণী বুঝিতে পারিলেন না দেখিয়া শিশুটি কাঁদিয়া উঠিল। শিশুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী নিকটে ছিল; সে বলিল, "খোকা বিনোদ কাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে।"

গোপাল বাবুর পরিবার সস্নেহে সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "আমার সোণার চাঁদ তুমি তাঁরে ভুল নাই। তাঁরে সকলে ভুলে গেছে। যার জন্য তিনি জেলে গেলেন সে পর্য্যন্ত তাঁরে ভুলে গেছে।"

গোপাল বাবু এই সময় অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমি বিনোদকে ভুলি নাই; এজন্মে ভুলিতে পারিব না। যে পর্য্যন্ত বিনোদ গিয়াছে সে পর্য্যন্ত আমি বৈঠকখানায় আলো জ্বালিতে দিই নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে গোপাল বাবুর চক্ষে জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীও কাঁদিলেন; নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, তিনি বলিলেন "এমন কালসাপিনী ঘরে আসিয়াছিল।"

গোপাল বাবু বলিলেন "কিন্তু বিনোদ এখনও স্ত্রীকে ভালবাসে; জেলখানায় প্রবেশ করিবার সময় আমায় কত বিনীত ভাবে কত কাতর স্বরে বলিয়াছিল, 'দাদা আমার শৈলকে দেখ, তার অল্প বয়স কিছু বুঝিতে পারে নাই, তার অপরাধ মার্জ্জনা করিও।' এই কথাগুলিন আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে; কি অকৃত্রিম ভালবাসা!"

গোপালের স্ত্রী বলিলেন পোড়াকপাল অমন ভালবাসার।

গো। পোড়াকপাল নহে; এই ভালবাসাই সুখের। বিনোদের ভালবাসায় ভ্রম আছে সত্য, কিন্তু কানা না হইলে ভালবাসা জন্মে না, যে দোষ দেখিতে পায় সে কখন ভালবাসিতে পারে না; ভ্রমই এই পৃথিবীর সুখ।

গোপাল বাবুর পরিবার আর কোন উত্তর না করিয়া শিশুকে

ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া দোলাইতে লাগিলেন। শিশুকে এতক্ষণ তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিনু কাকার কথা বলিয়া ভুলাইতেছিল; বিনোদের নিমিত্ত শিশু অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শেষ ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে মাতৃক্রোড়ে দুলিতে দুলিতে নিদ্রাসক্ত হইল। শিশুকে দোলাইতে দোলাইতে মাতা অতি মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন "ঘুম আয়রে ঘুম আয়।" শিশু ক্ষুদ্র হস্তে মাথা কণ্ডূয়ন করিতে করিতে, নিদ্রাবেশে দুলিতে দুলিতে, মাতার স্বরের সঙ্গে বলিতেছে "কাকা আয় লে আয়!"

গোপাল ভাবিতে লাগিলেন, বিনোদের জন্য অজ্ঞান শিশুর এই কাতরতা। কি আশ্চর্য্য!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে জেলখানায় ডাক্তার সাহেব আসিলে শম্ভু তাঁহার নিকট যাইয়া অতি বিনীতভাবে বিনোদের অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত করিল। ডাক্তার সাহেব সদয় হইয়া যে ঘরে বিনোদ পড়িয়াছিলেন সেই ঘরে আসিলেন। পরীক্ষা করিয়া অতি বিমর্ষ হইলেন। বলিলেন, "রোগ সাংঘাতিক।" পরে জেল দারগাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমার অনবধানতা প্রযুক্ত এই লোকটি মরিতে বসিয়াছে। তুমি তত্ত্ব লইলে আর আমাকে সময়ে জানাইলে, এতদূর ঘটিত না।" ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে জেল দারগা নেটিব ডাক্তারকে ভৎ র্সনা করিয়া বলিল "তুমি সময়ে চিকিৎসা করিলে এরূপ হইত না।"

বেলা দুই প্রহরের সময় মেজেষ্টর সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার সাহেব আবার আসিলেন। তখন বিনোদ কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন। উভয় সাহেব একত্রে তাঁহার অবস্থা পরীক্ষা

করিয়া তাঁহাকে শ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়া গেলেন। মেজেষ্টর সাহেব কাছারীতে গিয়া বিনোদকে খালাস দিবার রিপোর্ট করিলেন। কিছু দিন পরে রিপোর্ট মঞ্জুর হইয়া আসিল। প্রাতঃকালে জেলদারগা স্বয়ং আসিয়া বিনোদকে সে সংবাদ দিয়া গেল।

বিনোদ আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিলেন। সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শম্ভুর অনুসন্ধান করিতে গেলেন। শম্ভু এ সম্বাদ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল অতএব বিনোদকে দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ করিলেন না; কেবল বলিলেন "তোমায় পাইয়া অবধি আমি সংসারের যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম; তুমিই আমার সংসার হইয়া পড়িয়াছিলে।" বিনোদ বলিলেন "এখনও তুমি আমার জন্য যন্ত্রণা পাবে। আমায় মনে পড়িবে আর তুমি কাতর হইবে। সত্য করে বল শম্ভুখুড়া তুমি কাতর হবে না?"

শম্ভু গম্ভীর হইলেন কোন উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আর কে আছে? শৈল তোমার কে? অনেক দিন অবধি এইটি জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা করি নাই, এখন না জিজ্ঞাসা করে থাকিতে পারিলাম না।"

বিনোদ বলিলেন "শৈল আমার স্ত্রী—শৈল ব্যতীত আমার আর কেহ নাই; আর আমি ব্যতীত শৈলের আর কেহ নাই। শৈল আমাকে বড় ভালবাসে, এক দণ্ড আমাকে না দেখিলে অস্থির হয়, এত দিন আমাকে না দেখিয়া সে কেমন করে প্রাণ ধরে আছে জানি না।"

শম্ভু। সে বিষয় তোমার চিন্তা করিতে হবে না। পুত্রশোক যাহারা সহ্য করিতে পারে, তাহারা যে বড় অধিককাল পর্য্যন্ত তোমার জন্য ভাবিবে এমন মনে করিও না। এখন কথা

এই যে, তুমি পীড়িত, তোমার চিকিৎসা আবশ্যক, সেবা আবশ্যক, এ সকল তোমার স্ত্রীর দ্বারা সম্পন্ন হবে?

বি। হবে। সে বিষয়ের কিছু ভাবনা নাই। তুমি জান না শৈল কত যত্ন জানে। স্ত্রীজাতি রত্নবিশেষ।

শ। স্ত্রীজাতি ইদানীং রত্ন হয়ে থাকিবে, কিন্তু আমি যখন জেলে আসি নাই, তখন এ রত্ন বড় দেখিতে পাই নাই। আমি ভাল মন্দ কতক বুঝিতে পারি, আমার পূর্ব্বাবস্থা আর একরূপ ছিল। এক সময় আমি বিজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি ত শৈলের কারণে কয়েদ হও নাই?

বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন বলিলেন "হ্যাঁ—না—মিথ্যা কথা।"

শম্ভু উঠিয়া গেলেন। বিনোদ অনেকক্ষণ বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শম্ভু আবার আসিয়া আর একটি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনোদ সে পরিচয়টি দিবা মাত্র শম্ভু শিহরিয়া উঠিলেন, অতি দ্রুত পাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। শম্ভুর সহিত আর বিনোদের সাক্ষাৎ হইল না।

অন্যান্য কয়েদীরা আসিয়া বিনোদের সহিত মিষ্ট সম্ভাষণ করিল। "রোগ শীঘ্র আরোগ্য হউক" বলিয়া সকলেই দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে স্বস্ব কর্ম্মে চলিয়া গেলে বিনোদ একা বসিয়া বাটী যাইবার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। "আজ শৈলকে দেখিতে পাব। শৈল এখনও জানিতে পারে নাই যে আমি আজ বাড়ী যাব। আমায় হঠাৎ দেখিয়া সে কিরূপ করিবে? আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিবে। না—না—আহ্লাদে নহে। দুঃখে কাঁদিয়া উঠিবে আমার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিবে 'আমি তোমার পায়ে কত অপ-

রাধীনি—আমার জন্যে কত কষ্ট পেয়েছ।' আবার এই রুগ্ন শরীর দেখিয়া আরও কাঁদিয়া উঠিবে, আমি তখন কি বলে তারে শান্ত করিব? আমি তখন তার মুখখানি আমার কাঁধে লইয়া চক্ষুর জল মুছাইতে মুছাইতে তারে দেখিব; ছয় মাস দেখি নাই চোক পূরে দেখিব, আর তারে প্রবোধ বাক্যে বলিব ভয় নাই, আমি শীঘ্র আরোগ্য হইব।" বিনোদ এইরূপ সুখানুভব করিতেছেন এমত সময়ে একজন কনেষ্টেবল আসিয়া বিনোদকে জেল দারগার নিকট লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে পর বিনোদ বাবু জেলখানা হইতে মুক্তি পাইলেন। যে বস্ত্র পরিধানে জেলখানায় আসিয়াছিলেন সেই বস্ত্র পরিয়া একটি যষ্টির উপর ভর দিয়া জেলখানার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাচীরে, বৃক্ষে, আকাশে শত শত পক্ষী আহ্লাদে কোলাহল করিতেছে। পথে ছেলেরা হাসিতেছে, খেলিতেছে। যুবতীরা কলসী কক্ষে সুখের কথা কহিতে কহিতে ঠমকে ঠমকে চলিতেছে; পৃথিবী পূর্ব্বমতই আছে। বিনোদের কষ্টে দেশের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; কেহই বিমর্ষ হয় নাই। পরিবর্ত্তন কেবল বিনোদের শরীরে হইয়াছে, যদি কেহ বিমর্ষ হইয়া থাকে বিনোদ ভাবিলেন সে কেবল শৈল হইয়াছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে২ বিনোদ ধীরে ধীরে চলিলেন। বাজারে প্রবেশ মাত্রই আরসী, চিরুণী, ফিতা, প্রভৃতি শৈলের প্রীতিকর সামগ্রী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। লাঠিটী মৃত্তিকায় রাখিয়া বিনোদ ধীরে ধীরে একখানি দোকানের সম্মুখে বসি-

লেন। আসিবার সময় জেলদারগার নিকট হইতে যে কয়টি পয়সা পাইয়াছিলেন তাহা দোকানীকে দিয়া একখানি চিরুণী বাছিয়া লইলেন। বহু যত্নে সেইখানি আবার বস্ত্রাগ্রে বাঁধিয়া যষ্টির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন।

নগর অতিক্রম করিয়া অল্প দূর গিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিলেন। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, আর চলিতে অক্ষম। জেলখানা হইতে যখন বহির্গত হয়েন তখন আপন দুর্ব্বলতার বিষয় কিছুই ভাবেন নাই। শৈলকে দেখিবার স্পৃহা বলবতী হইয়াছিল অতএব চলিবার কষ্ট ভাবেন নাই। এক্ষণেও সেই স্পৃহা বলবতী রহিয়াছে, অতএব শৈলের মুখ মনে করিয়া আবার উঠিলেন; কিন্তু কতক দূর গিয়া আর যাইতে পারিলেন না। বসিয়া পড়িলেন।

এই সময় এক জন কৃষক নগরে ধান্য বিক্রয় করিয়া বাটী ফিরিয়া যাইতেছিল। বিনোদ তাহাকে কাতর স্বরে অবস্থা জানাইলেন। কৃষক যত্ন করিয়া বিনোদকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল। বিনোদ গাড়ীতে উঠিয়া নিজগ্রামের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন।

চন্দ্রোদয় দেখিবে বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ গুলিন পূর্ব্বদিকের আকাশ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল; মেঘতরঙ্গসীমা স্বর্ণরেখায় মণ্ডিত হইতে লাগিল। দুই একটি অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী আকাশ পথে উড়িতে লাগিল। তালপত্র কাঁপিতে লাগিল, শেষ তাহার অন্তরাল হইতে চন্দ্র উঠিতে লাগিল, পৃথিবী আলোকে ভাসিল। আনন্দে কৃষক গীত আরম্ভ করিল—

"মাথা তোল পদ্ম মুখি চাঁদের আলোয় মুখ দেখি।"

গীত সমাপ্ত হইলে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কে আছে?" কৃষক উত্তর করিল "সংসারে আমার সকলেই আছে,"

বি। তোমার স্ত্রী আছেন?

কৃ। আছে; না থাকিলে আমি চাষ আবাদ করিতে পারিতাম না; এখন আমি ভাবি যাহাদের স্ত্রী নাই, তাহারা কেমন করে পৃথিবীতে থাকে!

বিনোদ আর কোন উত্তর করিলেন না কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে এতক্ষণ জানেলা দিয়া চন্দ্রের আলো শৈলের গাত্রে লাগিয়াছে; শৈল শয়ন করিয়া আমার যন্ত্রণা ভাবিতেছে। ক্ষণেক পরে কৃষক বলিল, এই স্থানে নামিতে হইবে আমি অন্য পথে যাইব। বিনোদ নামিলেন।

কৃষক আপনার গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেলে, বিনোদ একা পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। নিজ গ্রাম আর অধিক দূর নাই, গ্রামের বৃক্ষাদি দেখা যাইতেছে। সেই সকল বৃক্ষের নিকটেই শৈল আছে—তথায় গেলেই তাহারে দেখিতে পাইবেন—সকল যন্ত্রণা যাবে, এই মনে করিয়া বিনোদ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু আবার পদ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল তবু চলিতে লাগিলেন; শরীর কাঁপিতে লাগিল তবু চলিতে লাগিলেন; মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষে আর ভাল দেখিতে পান না তথাপি চলিতে লাগিলেন: শেষ পড়িয়া গেলেন।—কিন্তু অচেতন হইলেন না। গ্রামের আলোকপ্রতি চাহিয়া পড়িয়া রহিলেন।

দুই একবার কাসিলেন, রক্ত উঠিল। চিকিৎসার কৌশলে প্রায় সপ্তাহ রক্ত উঠে নাই এবং সেই অবধি শ্বাস রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই; এক্ষণে সে রোগও উপস্থিত হইল। আর পড়িয়া থাকিতে পরিলেন না, ধীরে ধীরে উঠিলেন। মৃত্তিকায় জানু রাখিয়া নক্ষত্রেরদিকে মুখ তুলিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন; চক্ষু বড় হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু এই অবস্থা অধিকক্ষণ রহিল না; ক্ষণেক পরেই শ্বাস মন্দীভূত হইয়া

আসিল। বিনোদ ক্লান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্র মৃত্তিকায় আবার এলাইয়া পড়িলেন। মৃত্তিকায় পড়িবার সময় একবার বলিলেন "মরণ হল না!"

ক্ষণেক পরে নিদ্রা আসিল। নিদ্রাবেশে বিনোদ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন শৈল আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে "এখন ওঠ, আমি এসেছি, চল তোমায় বুকের ভিতর করিয়া লইয়া যাই; তোমায় কত দিন দেখি নাই; কত দিন তুমি আমায় আদর করে ডাক নাই; এখন চল—তোমার ঘর অন্ধকার হইয়া পড়ে আছে; একবার দেখিবে চল; তুমি আসিবার সময় যেখানে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছিলে সেইখানেই তাহা পড়িয়া আছে, আমি তাহা তুলি নাই তুলিতে পারি নাই, তুলিতে গেলে তোমায় মনে পড়ে।" শৈলের স্নেহ দেখিয়া নিদ্রাবস্থায় বিনোদ কাঁদিয়া উঠিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে বিনোদ দেখিলেন শৈল নাই। নিকটে একটি শৃগাল দাঁড়াইয়া আছে; মৃত দেহ ভাবিয়া সে আসিয়াছিল কিন্তু বিনোদকে কাঁদিতে দেখিয়া শৃগাল ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। বিনোদ উঠিয়া বসিলেন, একে একে সকল স্মরণ করিলেন, আবার উঠিলেন, ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু অধিক চলিবার সাধ্য নাই; কখন চলেন, কখন বসেন। ক্ষণেক পরে আর চলিতে পারিলেন না বসিতেও পারিলেন না, কাতরে বলিয়া উঠিলেন "শৈলরে আর বুঝি দেখা হল না!"

ভালবাসার অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার মোহিনী বলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিনোদ বাটী পৌঁছিলেন। শয়ন ঘরের নিকটেই খড়কী দ্বার। তথায় যাইয়া ডাকিলে, শৈল শীঘ্র শুনিতে পাইবেন এই প্রত্যাশায় বিনোদ সেই দিকে কোন মতে গেলেন। খড়কী দ্বার স্পর্শ মাত্রে খুলিয়া গেল; বিনোদ আহ্লাদে বলিবার

চেষ্টা করিলেন "শৈলরে আমি এসেছি" কিন্তু বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না—কণ্ঠ হইতে কেবল একটা বিকট শব্দ নির্গত হইল মাত্র। বিনোদের ব্ক্যরোধ হইয়া আসিয়াছিল; সর্ব্বাঙ্গের ক্রিয়া রোধ হইতেছিল। বিনোদ শয়ন ঘরের নিকট আসিয়া পড়িয়া গেলেন। আর কোন অঙ্গ সঞ্চালনের সাধ্য রহিল না। শৈলকে আর ডাকিতে পারিলেন না। কোন শব্দ দ্বারা আগমন বার্ত্তা জানাইতে পারিলেন না কেবল তৃষিতলোচনে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন "শৈল একবার উঠ আমি তোমার দ্বারে পড়ে। শীঘ্র উঠ নইলে বুঝি আর দেখা হল না!"

শৈল শীঘ্র উঠিল। বিনোদ গৃহ প্রবেশ মাত্র যে শব্দ করিয়াছিলেন শৈল তাহা শুনিয়াছিল। কি শব্দ হইল জানিবার নিমিত্ত শৈল প্রদীপ হস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিল। বিনোদ তাঁহাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইলেন; শৈল আরও সুন্দর হইয়াছে ডাইমনকাটা মল পরিয়াছে, গলায় চিক্ দিয়াছে, শান্তিপুরে ধুতি পরিয়াছে। শৈল এ সকল কোথা পাইল এই মনে করে বিনোদ একাগ্র চিত্তে শৈলের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শৈল মাথা ফিরাইয়া "এসো না?" বলিয়া এক জনকে ডাকিল। "যাইতেছি" বলিয়া ঘরের মধ্য হইতে একজন পুরুষ আসিয়া শৈলের পশ্চাতে দাঁড়াইল। বিনোদ চিনিলেন যে সে "বিলাস বাবু!" বিনোদ অমনি চক্ষু মুদিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু চক্ষু মুদিত হইল না। কোন অঙ্গই তাঁহার আর বশ নহে, চাহিয়া থাকিতে হইল।

শৈলের কথামত বিলাস বাবু খড়কী দ্বারে শব্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেন। যাইতে তাঁহার দক্ষিণ পদ বিনোদের বুকে পড়িল; বিলাস চমকিয়া উঠিলেন; ফিরিয়া দেখেন,

একটা মনুষ্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে; শৈলকে প্রদীপ আনিতে বলিলেন, দীপালোকে চিনিতে পারিলেন। শৈল জিজ্ঞাসা করিল "কে?" বিলাস বাবু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মন্ত্র-মুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শৈল আপনি প্রদীপ লইয়া দেখিল, চিনিতে পারিয়া বিলাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি কাণ্ড, আছে না গেছে?"

বিলাস সভয়ে বলিল "গিয়াছে।"

শৈ। "এখন উপায়? মরিবার আর কি জায়গা ছিল না।" বিনোদ তাহা শুনিলেন। পিশাচীর প্রতি কেবল চাহিয়া রহিলেন।

বিলাস পলাইবার উদ্যম করিল, শৈল তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার চুল ধরিল, এবং গর্জ্জন করিয়া বলিল "আমার স্বামীকে তুমি খুন করিয়াছ, কাল আমি থানায় জানাইব, তোমায় ফাঁসি দেওয়াইব। কালামুখ! এই সময় পলাতে চাও?"

পরে শৈল ঘরের মধ্যে বিলাসকে লইয়া গিয়া কোদালি সাবল দেখাইয়া বলিল "যাও এই সকল লইয়া ঐ প্রাচীরের নিকট গর্ত্ত কর, আমি মড়া লইয়া যাইতেছি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। বিলাস বাবু গর্ত্ত কাটিতেছেন; নিকটে বিনোদ পড়িয়া আছেন, তাহার পার্শ্বে ক্ষীণ আল জ্বলিতেছে। বৃক্ষ সকল স্তব্ধ, নক্ষত্র কণ্টকিত হইয়া শৈলের কার্য্য দেখিতেছে। গর্ত্ত খনন সমাধা হইল, বিলাস বাবু গর্ত্ত হইতে উপরে উঠিলেন; শ্রমজনিত নিশ্বাস ফেলিলেন, কপালের ঘর্ম্ম মুছিলেন।

বিনোদ আপন আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া কাতর অন্তরে কত কথাই ভাবিতেছিলেন। যার জন্য এত কষ্টভোগ করিলেন, যারে একবার দেখিব বলিয়া এত কষ্ট পাইয়া গৃহে আসিলেন, সেই বলিল "মরিবার আর কি জায়গা ছিল না" যার কাছে যুড়াইতে আসিলেন সেই আবার প্রাণহন্তা হইল। এক্ষণে প্রাণ যায়; গর্ত্ত প্রস্তুত, মুহূর্ত্তেকমাত্র বিলম্ব, তাহার পর সকল ফুরাইবে; বিনোদের বাক্য রোধ হইয়াছে, গতি রোধ হইয়াছে, আর কোন উপায় নাই। শৈলকে কত আদর করিবেন, কত কথা বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন এক্ষণে সে সকল ফুরাইল। এখন মরণই ভাল। বিনোদ মনে মনে তখন জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন; বিনোদের অন্তর বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু চক্ষে জল আসিল না, বাহ্যিক তাহার কিছুই প্রকাশ হইল না।

এই সময় বিলাস বাবু শৈলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন। "এখন স্বক গর্ত্তে ফেলি ?"

শৈল তৎকালে গর্ত্তের পার্শ্বে বসিয়া প্রাচীরের দিকে কি দেখিতে ছিল; ক্রমে তাঁহার স্পন্দরহিত হইয়া আসিতেছিল। শেষ অতি অস্ফুটস্বরে বিলাস বাবুকে বলিলেন, "ঐ বৃক্ষের দিকে চাও।" সেদিগে বিলাস বাবু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মূর্চ্ছা গেলেন। শৈল সেই দিকে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল। বৃক্ষপার্শ্বে প্রাচীরের উপর এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে।

দীর্ঘাকার পুরুষ প্রাচীর হইতে অবতরণ করিয়া নিকটে আসিতে লাগিল, শৈল উঠিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেঘবৎ গম্ভীর স্বরে সেই ভীমাকৃত জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল ! একি?"

শৈল শিহরিয়া উঠিল, এস্বর অপরিচিত নহে। বালিকা

কালের কোন এক ঘোর অথচ অস্পষ্ট ভয় মনে আসিয়া আর আসিল না।

ভীম পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিনিতে পারিয়াছ?"

শৈল বলিল "না"

তখন সেই পুরুষ শবের পার্শ্ব হইতে প্রদীপ লইয়া আপনার মুখের নিকট ধরিলেন।

শৈল চীৎকার করিয়া উঠিল, কাঁপিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীরে কম্পের তরঙ্গ উঠিল। জানুতে জানুতে আঘাত হইতে লাগিল, দন্ত কাঁপিতে লাগিল, অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, শৈল ক্রমে কর যোড় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভীম পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন "যে মরিয়াছে সে আবার এত দিনের পর কিরূপে বাঁচিয়া আসিল এই ভাবিতেছ? আমাকে প্রেত ভাবিয়া ভয় পাইতেছ? তোমার গর্ত্তধারিণী আমাকে হত্যা করিয়াছিল সত্য—কিন্তু আমি মরি নাই। এক্ষণে আইস আমার সঙ্গে আইস।" শৈল যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে তিনি একরূপ মর্ম্মভেদী কটাক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন। শৈল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

অনেকক্ষণ বিলম্বে ভীম পুরুষ একা ফিরিয়া আসিলেন, শৈল সঙ্গে ছিল না। বিনোদ যেস্থানে পড়িয়া ছিলেন সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিনোদ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে, শম্ভু কাকা?"

ক্রমশঃ।

এক ঘরে।

যিনি যাহাই বলুন, বাঙ্গালি মাত্রেই এক ঘরে; সহস্র ঘর একত্রে বাস করিলেও আমরা এক ঘরে। একত্রে বাস করার ফল কি আমরা জানি না, এই জন্য তাহা ভোগ করিতে পারি না।

একত্রে বাস করিলে সমাজ হইল সত্য; কিন্তু পরস্পর সাহায্য না করিলে সেই সমাজ বৃথা হয়, সমাজ থাকে না। মনুষ্য মাত্রেই কতকটা স্বার্থপর, আপনার জন্য ব্যস্ত; আপনার ইষ্ট-সাধন করিতে তৎপর। কিন্তু সমাজভুক্ত হইলে কিঞ্চিৎ স্বার্থ-পরতা ত্যাগ করিতে হয়, নতুবা আপনার ইষ্ট সাধন হয় না; অথবা আপনার ইষ্ট সাধন করিতে গেলে অন্যের ইষ্ট সাধন করিতে হয়; আবার কখন কখন অন্যের ইষ্ট সাধন না করিলে আপনার ইষ্টসাধন হয় না। সমাজের এই নিয়ম; আমরা তাহা ভাল বুঝি না।

কোন জমিদার বা নীলকর আমাদের প্রতিবাসীকে বল-পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গেলে অথবা অন্যপ্রকার পীড়ন করিলে আমরা কোন কথাই কহি না; মনে ভাবি "আমাদের উপর ত কোন পীড়ন হয় নাই, তবে অন্যের নিমিত্ত আমরা কেন কথা কহিব; যাহার বিপদ সেই একা ভোগ করুক আমরা অন্যের নিমিত্ত কথা কহিয়া কেন অনর্থক দোষী হইব।" পীড়ন যদি কেবল সেই প্রতিবাসির উপর হইয়া শেষ হইত তাহা হইলে এই পরামর্শ বিজ্ঞের ন্যায় হইয়াছে বলিতাম। কিন্তু দমন না হইলে পীড়ন সমাজে ক্রমেই বৃদ্ধিপায়; অদ্য অন্যের উপর পীড়ন অবাধে সম্পন্ন হইল, কল্য তোমার উপর হইবে। যিনি

অদ্য অবাধে পীড়ন করিলেন, তিনি দেখিলেন, পীড়নের প্রতি-ফল নাই, ইহাতে সমাজের আপত্তি নাই, তাঁহার সাহস আরও বৃদ্ধি হইল; সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও উৎসাহ জন্মিল। শেষ, প্রয়োজন হইলে আর শক্তি থাকিলে, অনেকেই অত্যাচার আরম্ভ করেন। তখনও হয় ত আমরা ভাবি, অত্যাচার অনেকে করিতেছে, অনেকের উপর হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? আমাদের উপর ত কোন পীড়ন এপর্য্যন্ত হয় নাই। হয় নাই সত্য; কিন্তু প্রতিবাসীর উপর পীড়ন হইয়াছে; পীড়ন আর দূরে নাই, নিকটে আসিয়াছে।

কিন্তু আমাদের সে দূরদৃষ্টি নাই; আমাদের দৃষ্টি কেবল আপনার উপস্থিত সচ্ছন্দতার প্রতি; কেবল আপনার ঘরের প্রতি। যতক্ষণ আপনার ঘরের মধ্যে কোন ব্যাঘাত না হয় ততক্ষণ আমরা ভাবি পৃথিবীতে কোন বিঘ্ন নাই। সমাজের কেবল এই এক ঘরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি; এই জন্য বলি আমরা এক ঘরে।

মনুষ্য যখন বন্য অবস্থায় থাকে তখন ঐরূপ কেবল আপনার ঘরের উপর দৃষ্টি সম্ভবে; সে অবস্থায় সমাজ থাকে না। বন্যেরা সকলেই স্বতন্ত্র; কেহ কাহারও উপর নির্ভর করে না; কেহ কাহারেও সাহায্য করে না; আত্মরক্ষা আপনার হাত; আপনি রক্ষা করিতে পারিলে রক্ষা হইল, না পারিলে আর উপায় নাই। বন্য অবস্থায় রাজা নাই, রাজদণ্ড নাই, বিচার নাই; পরস্পরের সহায়তা নাই। আমাদের রাজা, রাজদণ্ড, সকলই আছে, কেবল পরস্পর সহায়তা নাই; এবিষয়েআমরা প্রায় বন্য জাতির ন্যায় রহিয়াছি।

পরস্পর সহায়তা না থাকায় আমাদের আর উন্নতি নাই। অর্থের উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু অর্থোন্নতি কেবল বাহ্যিক

উন্নতি মাত্র; সহায়তা এবং একতা দ্বারা সমাজের আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধন হয়।

একতা এবং পরস্পরের সহায়তা সমাজের মূল; একতা না থাকিলে বলিষ্ঠও দুর্ব্বল। কোন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াগিয়াছেন যে মনুষ্য অপেক্ষা সিংহ ও ব্যাঘ্র মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও মনুষ্যদিগকে পৃথিবী হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিল না। তাহারা পরস্পর সহায়তা করিতে পারে না, করিতে জানে না, কোন উদ্দিষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত পরস্পর সমবেত হইতে পারে না এই জন্য তাহারা মনুষ্যকে উচ্ছেদ করিতে পারিল না। মনুষ্য একা দুর্ব্বল, অক্ষম, অগ্রাহ্য। কিন্তু তাহারা সমবেত হইতে পারিলে তাহাদের অসাধ্য, আর কিছুই থাকে না, তখন দেবতারাও ভয় পান।

মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ বন্য অবস্থায় একতা থাকে না, পরে তাহাদের যত বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া আইসে ততই একতার ফল ও শক্তি, তাহারা বুঝিতে পারে। বন্য অবস্থা হইতে কোন জাতি কত দূর উন্নত হইয়াছে, তাহা তাহাদের একতা দেখিয়া অনুভব করা যাইতে পারে। একতা বিজ্ঞতার ফল; আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত উহা আবশ্যক।

যাঁহারা নিতান্ত স্বার্থপর অর্থাৎ একঘরে, তাঁহারা আপন আপন স্বার্থপরতার অনুরোধে সমাজের সহায়তা করুন; সমাজের মঙ্গলে যে তাঁহাদের মঙ্গল এইটি স্মরণ রাখুন, আমরা কেহ সমাজ ছাড়া নহি, আমাদের প্রত্যেকের সমষ্টিতে সমাজ। সমাজের ইষ্ট হইলে প্রত্যেকের ইষ্ট, সমাজের অনিষ্ট হইলে প্রত্যেকের অনিষ্ট। যে সমাজবাসিরা এই কথাটী বুঝিয়াছে তাহারাই উন্নত হইয়াছে, তাহারাই সামাজিক সুখ ভোগ করি

য়াছে; এবাকো যাহারাই অবহেলা করিয়াছে তাহারাই অবনত হইয়াছে ক্রমে আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে।

আমাদের দুর্দ্দশার মূল কারণ কতক বিষয়ে একতার অভাব। কতক বিষয়ে অভাব কিন্তু অনেক বিষয়ে একতা আছে। গৃহ নির্ম্মাণ সমাজের আবশ্যক কার্য্য, এসম্বন্ধে আমাদের একতা আছে। গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত কেহ চূণ প্রস্তুত করিতেছে, কেহ তাহা শ্রীহট্ট হইতে আনিয়া স্থানে স্থানে পৌছাইয়া দিতেছে। কেহ নেপাল রাজ্য হইতে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ আনিতেছে, কেহ ইষ্টক প্রস্তুত করিতেছে, কেহ কল কবজা প্রস্তুত করিতেছে। ইহারা কেহ পরস্পর কাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেছে না অথচ ইহাদের মধ্যে একতা রহিয়াছে, ইহারা সকলেই গৃহনির্ম্মাণের সহায়তা করিতেছে। এই এক জাতীয় একতা। এইরূপ একতা আমাদের অনেক বিষয়ে আছে। বস্ত্র সম্বন্ধে ঐ রূপ আছে। কেহ কার্পাস কর্ষণ করিতেছে, কেহ সূতা প্রস্তুত করিতেছে. কেহ বস্ত্র বয়ন করিতেছে, এই ব্যক্তি দিগের মধ্যে একতা রহিয়াছে। ইহারা সকলেই বস্ত্র প্রস্তুত করিতে একত্র হইয়াছে।

অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই জাতীয় একতা নাই; কুটীর নির্ম্মাণ করিতে গেলে তাহাদের প্রত্যেককে একা সকল দ্রব্যাদি আহরণ করিতে হইবে, বন হইতে একা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইবে, একা রজ্জু প্রস্তুত করিতে হইবে, একা কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইবে, একা সকল করিতে হইবে, অন্যের সহায়তা নাই। অসভ্য জাতির মধ্যে কেহ কাহার নিমিত্ত কিছুই করে না। এই সংসারে তাহাদিগের যাহাই প্রয়োজন হউক. তাহাদের সকলকেই তাহা একা সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহার অন্যথায় প্রয়োজনীয় বস্তু পাইবে না।

আমাদের মধ্যে যদি এইরূপ ঐক্যের অভাব থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সাংসারিক সমুদয় দ্রব্যাদি আপনাদিগের নিজে প্রস্তুত করিতে হইত। বস্ত্রের নিমিত্ত আপনাকে ভূমি কর্ষণ করিয়া কার্পাস উৎপাদন করিতে হইত; কার্পাস হইতে আপনাকে সূতা প্রস্তুত করিতে হইত; সূতা হইতে আপনাকে বস্ত্র বয়ন করিতে হইত। আবার জলপাত্রের নিমিত্ত আপনাকে ধাতু সংগ্রহ করিতে হইত, ধাতু সংগ্রহের নিমিত্ত কত দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতে হইত; ধাতু সংগ্রহ হইলে আপনাকে কাংস্যকারের কার্য্য করিতে হইত, তাহার পর জলপাত্র কি পান পাত্র ভোগ করিতে পাওয়া যাইত। এইরূপে সাংসারিক সমস্ত দ্রব্যাদি যদি আমাদিগের পরস্পরকে নিজহস্তে প্রস্তুত করিতে হইত তাহা হইলে কি বিষম ব্যাপার হইয়া উঠিত। ঐ সকল দ্রব্যাদির মধ্যে একটি একা প্রস্তুত করিতে গেলে জীবন অবসিত হয়, সমুদয় গুলিন প্রস্তুত করার ত কথাই নাই। শেষ কথা; এই সকল দ্রব্যাদি নিজে প্রস্তুত করিতে হইলে কোনটিই প্রস্তুত হইতে পারিত না। আমরা ইহার কোন দ্রব্যই ভোগ করিতে পারিতাম না। সমাজের প্রসাদাৎ আমরা এই সকল ভোগ করিতে পাইয়াছি; পরস্পরের সহায়তায় এই সকল হইয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে এই সকল বিষয়ে আমাদিগের সমাজের একতা আছে। এই জাতীয় একতা সমাজ মাত্রেরই আনুষঙ্গিক। সমাজবদ্ধ হইলেই এইরূপ একতা সঙ্গে সঙ্গে জন্মে। আমাদের দেশে এই জাতীয় একতা বহুকালাবধি আছে। ইহার লাভ আশু প্রত্যক্ষ; কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। এই বিষয়ে আমাদের বাল্য সংস্কার জন্মিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ের একতা ভিন্ন কোন নূতন বিষয়ে আমাদের একতা হয় না। অন্য বিষয়ে আমাদের বাল্য সংস্কার নাই বলিয়াই হয় না। যে বিষয়ে আমা-

দের সংস্কার নাই সে বিষয়ে একতা উচিত কি না, তাহা প্রথমে বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে। বিবেচনা দ্বারা স্থির হইলে পর, বাঙ্গালার সমুদয় লোকের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে, তাহাদের লওয়াইতে হইবে। এই বিস্তীর্ণ বাঙ্গালা ব্যাপিয়া যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের সংখ্যা অল্প নহে, তাহাদের একে একে লওয়াইয়া কে ঐকমত্য সাধন করিতে পারে?

অনেকে বলিবেন এ কার্য্য সংবাদ পত্র সাধন করিবে, কেন না বিলাতে এ কার্য্য সংবাদ পত্র সাধন করিতেছে। এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের আপাততঃ কোন আশা নাই; কেন না তদুপযোগী সংবাদ পত্র আমাদের দেশে প্রচার হইতে অনেক বিলম্ব। যদি তাহার বিলম্ব না থাকে, যদি এই সময়েই সেইরূপ সংবাদ পত্র প্রচার হয়, তথাপি কোন ফল ফলিবে না; এক্ষণে বাঙ্গালায় কয় জন সংবাদ পত্র পাঠ করিতে পারে? যদি কখন গবর্ণর (Sir George Campbell) সার্ জর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের রোপিত বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহাহইলে কতক আশা করা যাইতে পারে। তিনি অপর সাধারণ সকলের লিখিতে পড়িতে শিখিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন; যদি কখন তাঁহার কল্যাণে অপর সাধারণ সকলেই সংবাদ পত্র পাঠ করিতে সক্ষম হয় আর যদি কখন উপযুক্ত সংবাদ পত্র প্রচার হয় তবেই বাঙ্গালায় ঐক্যের আশা করা যাইতে পারে, নতুবা—নতুবা কি সে আশা করা যাইতে পারে?

পূর্ব্বকালে যে সংবাদ পত্র দ্বারা একতাসাধন হইত এমত নহে, অনেক দেশে অপর সাধারণ লেখা পড়া জানিত না অথচ মতবিশেষে সকলেই এক মত হইত। অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক এই বঙ্গবাসীরাই পূর্ব্বে কখন কখন এক মত হইয়া সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন আমরা অদ্যাপি

সেই সকল কার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছি। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল নীলকরদিগের অত্যাচারে পীড়িত বঙ্গ কৃষকেরা ঐক্য হইয়া অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিল। তাহারা একস্থান-বাসী না হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছিল, লেখা পড়া সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা সত্বেও পরস্পর একবাক্য হইয়াছিল। তাহাদের একতা কিরূপে সাধিত হইয়াছিল পরিষ্কাররূপে আমাদের জানা নাই। আমাদের ইতিবৃত্ত নাই বোধ হয় এখন অপেক্ষা পূর্ব্বে আমাদের অধিক ঐক্য ছিল। পূর্ব্বে কি ভদ্র কি অভদ্র, কি ধনবান্ কি দরিদ্র প্রায় সকলেরই শিক্ষা একই প্রকার ছিল, বিদ্যা বিজ্ঞানে সকলেই সমান ছিলেন; ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা সকলের একইরূপ ছিল। তদ্ভিন্ন সকলেই এক শাস্ত্রানুগামী ছিলেন; সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এক্ষণে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। শিক্ষা স্বতন্ত্র হইয়াছে; শাস্ত্রে অবজ্ঞা জন্মিয়াছে; ধর্ম্ম পৃথক্ হইয়াছে; পিতা পুত্রে অনৈক্য হইয়াছে।

পূর্ব্বে দুই চারি জন বিদ্বান্ ছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যা একতার বিরোধী হইত না। অপর সাধারণ সকলেই তাঁহাদের ভক্তি করিত, তাঁহাদের মতাবলম্বী হইত; সকলেই জানিত তাঁহাদের মত শাস্ত্রমূলক। বাস্তবিক তাঁহাদের মত শাস্ত্রমূলক ভিন্ন অন্যরূপ হইতে পারিত না; তাঁহাদের চিন্তা-শক্তি স্বাধীন কি স্বতন্ত্র হইতে পারিত না; মূল কথা, তাঁহারা অপর সাধারণের সঙ্গে সমভাবে থাকিতেন। এক্ষণে আমাদের দেশে যে বিদেশীয় বিদ্যার অনুশীলন হইতেছে তাহাতে বিদ্বান্-দিগের মনোবৃত্তি একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে; তাঁহাদি-গকে এক প্রকার স্বতন্ত্র জাতি করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের দে-শীয় শাস্ত্রে তাঁহাদের অবজ্ঞা জন্মিয়াছে। একতার এই একটী মূলচ্ছেদ হইয়াছে। আবার শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মে

অভক্তি জন্মিয়াছে, একতার সেই আর একটি মূলচ্ছেদ হইয়াছে। তাঁহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বন না করিয়া থাকুন কিন্তু তাঁহারা আর হিন্দু ধর্ম্মাক্রান্ত নহেন। তদ্ভিন্ন বিলাতীয় বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যানুশীলনে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়া স্বতন্ত্র প্রভা প্রাপ্ত হইয়াছে। মূল কথা বঙ্গবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের আর সহৃদয়তা নাই বরং কতক সহৃদয়তা ইংরাজদিগের সহিত জন্মিয়াছে।

যেসকল কারণে আমাদের দেশে একতার মূলচ্ছেদ হইয়াছে তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলি নাই; আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে পূর্ব্বে বঙ্গবাসিগণের ঐক্য হইবার উপকরণ ছিল এক্ষণে তাহা নাই। পূর্ব্বে উপকরণ থাকিলেও কখন বাঙ্গালীর কোন বিষয়ে ঐক্য হইয়াছিল কি না তাহা অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা অগ্রেই বলিয়াছি আমাদের ইতিবৃত্ত নাই এ সকল বিষয় নিরাকরণ হইবার উপায় নাই। পূর্ব্বে দেবীবর ঘটকের সময় এক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা কতক পরিমাণে এক মত হইয়া থাকিবেন বলিয়া অনুভব হয় কিন্তু তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই।

এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে অনৈক্যের অনেক কারণ জন্মিয়াছে, পূর্ব্বে সে সকল ছিল না। সে সকল কারণ না থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্বে সমুদয় বাঙ্গালি একমত হইবার একটি বিঘ্ন ছিল। এক অঞ্চলবাসীর সহিত অপর অঞ্চলবাসিগণের কোন সংশ্রব ছিল না, পরস্পরের মতামতের বিনিময় হইত না, হইতে পারিত না; তৎকালে বঙ্গ সমাজ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল মতের ঐক্য অনৈক্য কেবল সেই সকল এক এক অংশে আবদ্ধ থাকিত অপর অংশের সহিত সংস্পৃষ্ট হইত না। এতদ্ভিন্ন আর একটি বিঘ্ন ছিল; যে সকল হেতুতে সমুদয় দেশ

বিচলিত হয় সে সকল হেতু তৎকালে অল্পই ঘটিত; রাজশাসনে প্রজারা পীড়িত হইলে দেশে বিপ্লব উপস্থিত হয় কিন্তু পূর্ব্বকালে অর্থাৎ মুসলমানদিগের সময়ে সে আশঙ্কা বড় ছিল না। তৎকালের রাজসাশন প্রজাদিগের স্পর্শ করিতে পারে নাই; প্রজাদিগের সম্বন্ধ কেবল জমিদারের সহিত ছিল। ধন সম্পত্তি লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে জমিদার তাহার বিচার করিতেন। ফৌজদারি জমিদারের হাতে ছিল, পুলিস অর্থাৎ শান্তিরক্ষার বিষয়ে জমিদার কর্ত্তা ছিলেন। রাজ পুরুষের সঙ্গে বাঙ্গালিদিগের অল্পই সংস্রব ছিল। স্থানে স্থানে কাজি ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রায় মুসলমানদিগের পৌরোহিত্য কার্য্যেই ব্রতী থাকিতেন, কথন কথন বিচার করিতে বাসিতেন। কিন্তু মুসলমান ভিন্ন হিন্দুরা তাঁহাদের নিকট কথন বিচার প্রার্থী হইতেন না; কাজির বিচার উপহাসের বিষয় ছিল।

দেওয়ানি ফৌজদারি পুলিস অধিকাংশ এই তিন লইয়া রাজার সহিত প্রজার সংস্রব কিন্তু এই তিনের কোনটাই মুসলমানদিগের হাতে ছিল না। প্রকৃতার্থে রাজসাসন হিন্দুদিগের হাতে ছিল। পল্লীগ্রামে কোন রূপেই মুসলমানের অধিকার জানিতে পারা যাইত না। তাহার কোন চিহ্ন ছিল না। বাস্তবিক রাজধানী কি তন্নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত পল্লীগ্রামে মুসলমান অধিকার কখন হয় নাই।

মুসলমানদিগের সময়ে প্রকৃতার্থ হিন্দুদিগের অধিকার ছিল, হিন্দু প্রণালীমত সকল কার্য্যই হইত। বাঙ্গালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত হইয়াছিল কিন্তু সেই প্রত্যেক ক্ষুদ্র সমাজে এক এক জন হিন্দু সমাজপতি ছিলেন; তাঁহারাই জমিদার তাঁহারাই ভূস্বামী, তাঁহারাই প্রকৃত রাজা ছিলেন। প্রত্যেক সমাজে হিন্দু শাস্ত্র চলিত; মুসলমানেরা আইন কানুন প্রস্তুত করিয়াছিলেন

সত্য, কিন্তু সে সকল প্রায় নবাবের দেওয়ান দপ্তরে চলিত, প্রজারা তাহা কখন শুনিতেও পাইত না; জমিদারের অভিরুচি প্রজাদিগের পক্ষে একমাত্র আইন ছিল। জমিদারগণ কখন কখন পীড়ন করিতেন বটে কিন্তু প্রজারা তাহা পিতার পীড়ন মনে করিয়া সহ্য করিত; নিতান্ত অসঙ্গত পীড়ন হইলেও সহ্য করিত। জমিদারের প্রভুত্ব দেবদত্ত বলিয়া তাহাদের বাল্য সংস্কার ছিল, জমিদারের পীড়ন সহিতে হয় ইহা বিধি লিপি বলিয়া তাহাদের বোধ ছিল।

এক্ষণে আর হিন্দুর অধিকার নাই। ইংরাজ অধিকার এক্ষেণে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ ভাঙ্গিয়া সমুদয় বঙ্গদেশ একসমাজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ক্ষুদ্র সমাজ পতি বা জমিদার দিগের প্রভুত্ব লোপ পাইতেছে; তাঁহাদের আর রাজত্ব নাই। কেহ কেহ সতরঞ্চের রাজার ন্যায় কেবল রাজ উপাধি লইয়া বসিয়া আছেন। পূর্ব্বে যাহারা ইহাদিগকে রাজা মনে করিয়া সকল অত্যাচার সহ্য করিত এক্ষণে তাহারা ইহাদিগকে আপনাদিগের ন্যায় প্রজা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে বা পারিতেছে। ইহাদের অত্যাচার আর অধিক দিন স্থায়ী হইবে না কেবল প্রজাদিগের মধ্যে ঐক্য অভাব রহিয়াছে। সকলে এক হইয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে পারিলে এই সতরঞ্চের রাজারা বড়ের কিস্তিতে মাৎ হইবেন।

ভারত ভাণ্ডারি।

ভারত ভাণ্ডারি একদিন দৈবতুর্ব্বিপাকে আদালতে সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন। দিব্য আবক্ষঃচুম্বিত শ্মশ্রুরাজি লম্বিত করিয়া কাটরার মধ্যে দণ্ডায়মান, নাম, বাপের নাম, জিজ্ঞাসার

পর ভারত ভাণ্ডারিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, যে, তাহার বয়স কত? ভাণ্ডারী উত্তর দিলেন, "সতের কি আঠার হইবে," উকীল ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি! তোমার অতবড় দাড়ী তোমার সতের বছর বয়স?" তাহাতে ভারত ভাণ্ডারি উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, এদাড়ী বাবা তারকেশ্বরের।"

আর একদিন কালিঘাটে তাঁহার এক আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আত্মীয় বলিল "ভাণ্ডারি মহাশয় আপনি আশ্বিন মাসে পূজার সময় আমার বাটীতে যাইবেন প্রতিশ্রুতি ছিলেন কিন্তু বোধ হয় সে কথা বিস্মরণ হইয়াছিলন। ভারত অমনি ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিল "আমি সিয়ানা লোক কখন কোন কথা ভুলি না; তবে কি জান, আমার জ্বর হইয়াছিল তাহাই যাইতে পারি নাই।" আত্মীয় উত্তর করিল আশ্বিন মাসে ত আপনার জ্বর হয় নাই আষাঢ় মাসে রথের সময় জ্বর হইয়াছিল। ভারত অতি গম্ভির ভাবে বলিলেন "তবেই হইল, আশ্বিন হউক আর আষাঢ়ে হউক জ্বর ত হইয়াছিল।"

কলিকাতায় যাইবার নিমিত্ত একদিন ভারত মনিবের সঙ্গে নৌকা আরোহণ করিলেন, নৌকায় কিছু বোঝাই অধিক হইয়াছিল দেখিয়া তিনি একটু ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু আর কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা মনিবের পশ্চাৎ দিকে যাইয়া বসিলেন, ভাবিলেন এখানে বসিলে আর কোন ভয় থাকিবে না। কিঞ্চিৎ দূর গিয়া মনিব পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন ভারত কতক গুলিন লেপ বালিশ আপন স্কন্ধে লইয়া বসিয়া আছেন। মুনিব বলিলেন, "ওকি হে; ঘাড়ে লেপ বালিশ কেন?" ভারত বলিলেন, "আজ্ঞে, এ গুলাতে নৌকা বড় বোঝাই হইয়া উঠিয়াছিল।"

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড। ভাদ্র ১২৮১। ৫ সংখ্যা।

কণ্ঠমালা।

দশম পরিচ্ছেদ।

শম্ভু এক সঙ্গীন ডাকাতি মোকদ্দমায় কয়েদ হইয়াছিল, তথাপি জেলদারগা কখন কখন শম্ভুকে ডাকাত নহে বলিয়া ভাবিতেন। এক দিন তিনি গোপনে শম্ভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শম্ভু তাহাতে উত্তর করিলেন, আমাকে আপনার কিবোধ হয়? জেলদারগা বলিলেন তোমার শক্তি, সাহস, রাগ, প্রখর দৃষ্টি প্রভৃতি দেখিয়া তোমাকে ডাকাত বলিয়াই আমার প্রতীতি হয়; কিন্তু তোমার দুখানি পা দেখিলে আমার সন্দেহ জন্মে। আমি অনেক ডাকাত দেখিয়াছি, এই হাতে অনেক ডাকাতকে ঘুসা মারিয়াছি কিন্তু কখন কাহারও এরূপ পা দেখি নাই; দেখিলেই বোধ হয় তোমার পা কখন কঠিন মৃত্তিকাস্পর্শ করে নাই, বোধ হয় যেন জুতা পরা তোমার সর্ব্বদা অভ্যাস ছিল; কিন্তু ডাকাতরা ত কখন জুতা পরে না; তাহাদের পা পুরু,

ফাটা, বাঁকা, কঠিন, তাহাদের পায়ে প্রায় কাঁটা ফুটে না কিন্তু দেখিতেছি তোমার পায়ে ঘাসের আগাও বিঁধিতে পারে। অন্য ডাকাতের সহিত তোমার এ প্রভেদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না। শম্ভু বলিলেন আমি ডাকাতি মোকদ্দমায় দণ্ড পাইয়া আপনার জেলখানায় আসিয়াছি, অতএব আমাকে ডাকাত ভিন্ন অন্য ভাবা অনর্থক; ডাকাত যদি ধনী হয় তবে এক জোড়া জুতা পরিয়া পা রক্ষা করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

জেলদারগা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল ভাবিলেন; শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শম্ভু তুমি আমায় প্রতারণা করিও না, নিশ্চয় করিয়া বল তুমি ডাকাত কি না?" শম্ভু বলিলেন "আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি আমাকে ডাকাত বিবেচনা করা উচিত। ডাকাত কি? আমি ডাকাতের অপেক্ষাও অপকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছি কিন্তু সে সকল কথা বলিব না, বলিলে আমার আবার দণ্ড হইবে।"

জেলদারগা বলিলেন "আমিও তোমায় সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তুমি যদি ডাকাত, তবে তোমার অধীন লোক অবশ্য ছিল, তাহারা এক্ষণে কোথায়?"

শম্ভু বলিলেন "তাহারা এক্ষণে কোথায়, আমি জেলে থাকিয়া কিরূপে বলিব?" জেলদারগা বলিলেন, "সে কথা সত্য, কিন্তু তুমি যদি কোন রাত্রে এই জেল হইতে পলাইতে পাও তাহা হইলে কি কর? তুমি কি আবার তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ডাকাতি কর?"

শম্ভু বলিলেন "করি।"

জেলদারগা বলিলেন "তোমার আর কে আছে?"

শম্ভু উত্তর করিলেন "আমার আর কেহ নাই, সকল ডাকাতেই যে সংসার প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত ডাকাতি করে

এমত নহে; অনেকে নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না কাজেই ডাকাতি করে। ডাকাতির পরামর্শ, অনুসন্ধান, লোকযোজনা প্রভৃতি কার্য্য আমার মত লোকের পক্ষে বড় সুখের; আবার ডাকাতির সময় আরও সুখ। আপনারা ইংরাজ, বুঝিতে পারিবেন দশ-হাজার ফৌজ লইয়া আপনারা যখন একটি কেল্লা চড়াও করেন, বলুন দেখি তখন সেই ফৌজের মধ্যে যাহারা বীরপুরুষ, তাহাদের কত সুখ হয়? সেই মুহুর্ম্মুহু তোপের ধ্বনিতে কোন্ বীরপুরুষের অন্তর বাজিয়া না উঠে? তখন কে আগে কেল্লায় উঠিবে, এই লইয়া পরস্পর মধ্যে প্রতিযোগিতা জন্মে, চারিদিকে গুলি বৃষ্টি হইতেছে তথাপি গ্রাহ্য নাই, চারিদিকে কামান ফুৎকার করিয়া বজ্রবর্ষণ করিতেছে তাহাতে কাহারও ভয় নাই বরং বীরেরা তাহাতে আরও মাতিয়া উঠে; আমাদের দেশে ডাকাতিতে সেইরূপ মাতামাতি আছে। আমরা যুদ্ধে যাইতে পাই না কিন্তু আমাদের সে প্রবৃত্তি রহিয়াছে, ডাকাতি করিয়া সে বীরবৃত্তির কতক শমতা করি, আমরা দশ হাজার ফৌজ লইয়া কেল্লা লুঠিতে যাই না, দশজন কি পনের জন একত্রে যাই এবং সেই দশ পনর জনের উপযুক্ত কেল্লা দখল করি। কিন্তু দশ জনে গৃহস্থের ঘরই আক্রমণ করা যাক কিম্বা দশহাজার জনে কেল্লাই আক্রমণ করা যাক, সাহসীর সুখ উভয় স্থলেই সমান। ডাকাতির পর আরও সুখ আছে; পুলিশের চক্ষে ধূলা দিতে যে কৌশল আবশ্যক, তাহার চালনায় অনেক সুখ হয়; কিন্তু এক্ষণে যদি আমি কোন রাত্রে গিয়া ডাকাতি করি তাহা হইলে সেই সুখে বঞ্চিত হইব।"

জেলদারগা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন বঞ্চিৎ হইবে?" শম্ভু উত্তর করিলেন "পুলিশের চকে ধূলা দিবার নিমিত্ত আমার কোন কৌশল করিতে হইবে না, আমি জেলখানায় আছি,

আমায় কেহ সন্দেহ করিবে না! আমায় নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে, তাহাহইলে আমার সুখ আর কই হইল।" জেলদারগা সেদিন আর কোন কথা বলিলেন না, অন্যমনস্কে কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন।

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় শম্ভুকে গোপনে লইয়া গিয়া জেলদারগা আপনার ঘরে বসাইলেন; অন্যান্য দুই একটি কথার পর বলিলেন "তুমি যে সে দিবস বলিতেছিলে যে এক্ষণে জেল হইতে গিয়া ডাকাতি করিলে কেহ তোমার প্রতি সন্দেহ করিবে না, এ কথা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি তুমি ঠিক্ বলিয়াছিলে; যদিও কোন গতিকে কেহ তোমাকে চিনিতে পারে তথাপি কেহ তাহা মুখে আনিতে পারিবে না।"

শম্ভু বলিলেন "পাকা ডাকাতকে চিনিবার সাধ্য কাহারও নাই; অন্য লোকে চেনা দূরে থাকুক দলের লোক সকলে জানিতে পারে না; দলে কে কে আসিয়াছে আর কে কে আসে নাই সে তত্ত্ব লইবার ক্ষমতা সকলের নাই। দলস্থ অধিকাংশ লোক সাঙ্কেতিক স্থানে একে একে গিয়া অন্ধকারে জমিতে থাকে। তখন সর্দ্দারের নায়েব স্বরূপ যে থাকে, কেবল তাহার স্বর চিনিতে পারিলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়, আর কেহ কাহারও তত্ত্ব লয় না। তত্ত্ব লইবার সময়ও থাকে না, অতি অল্পক্ষণ সাঙ্কেতিক স্থানে থাকিতে হয় তাহার পরই কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন কে কার অনুসন্ধান করে।" জেলদারগা বলিলেন "তবে ত এক্ষণে তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া ডাকাতি করিতে পার।" শম্ভু বলিলেন তাহা পারি সত্য, কিন্তু জেলখানা হইতে যাইতে পারি কই?"

জেলদারগা বলিলেন "যদি আমি যাইতে দিই তাহা হইলে তুমি আমাকে কি দিবে?"

শম্ভু বলিলেন "যাহা আমি উপার্জ্জন করিব, তাহার অর্দ্ধেক দিব। অথবা প্রত্যেক রাত্রের নিমিত্ত দুইশত করিয়া টাকা দিব, ইহার অধিক পাই আমার থাকিবে; ইহা অপেক্ষা অল্প পাই আমার পূর্ব্ব সঞ্চয় হইতে আপনাকে পূরণ করিয়া দিব।"

জেলদারগা বলিলেন, "আমি ইহাতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমায় ছাড়িয়া দিলে তুমি যদি আর ফিরে না আইস তখন কি হইবে?"

শম্ভু উত্তর করিলেন, "এ সন্দেহ আপনি অবশ্যই করিতে পারেন, কিন্তু আমি যে পলাইব না, তাহার জামিন আমার কথা ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারি না; আমি হিন্দু, মিথ্যা কথা আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি মিথ্যাবাদী হইলে কখন অন্যে আমাকে সর্দ্দার বলিয়া গ্রহণ করিত না; তাহারা ডাকাত সত্য, কিন্তু তাহারা কাপুরুষকে ঘৃণা করে, মিথ্যা কথা কেবল কাপুরুষের অবলম্বন। আমার কথার উপর নির্ভর করা না করা আপনার ইচ্ছাধীন, সাহস করিয়া আমায় ছাড়িয়া দিতে পারেন লাভ আপনার নিজের; না পারেন তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি নাই।"

জেলদারগা বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন, পরে উঠিয়া ঘরের মধ্যে আবার অনেকক্ষণ বেড়াইলেন, শেষ শম্ভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিঞ্চিৎকাল তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "শম্ভু তুমি বীরপুরুষ, আমি ইংরাজ, বীরের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি, তোমার কথায় বিশ্বাস করিলে আমাকে যে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে না, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি; অতএব তুমি যে রাত্রে ইচ্ছা কর সেই রাত্রেই যাইতে পারিবে, কিন্তু পুর্ব্বাহ্নে আমায় না জানাইলে আমি তাহার উদ্যোগ করিতে পারিব না। মেম সাহেবের নিমিত্ত আমি নিতান্তই

দায়গ্রস্ত হইয়াছি; তাহাতেই তোমাকে মধ্যে মধ্যে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলাম কিন্তু দেখ যেন আমি মারা না পড়ি।”

শম্ভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে বিষয়ে আপনার কোন ভয় নাই।”

সেই দিন হইতে শম্ভু এক প্রকার স্বাধীন হইয়াছিলেন, যে দিন ইচ্ছা সেই দিন জেলখানা হইতে বহির্গত হইতেন, কেবল একবার সন্ধ্যার সময় জেলদারগাকে জানাইতে হইত: জেলদারগা তাঁহার আগম নির্গমের উপায় করিয়া দিতেন। এই জন্য যেদিন বিনোদ জেলখানা হইতে মুক্ত হন, সেই দিন শম্ভু অনায়াসেই বিনোদের বাটী যাইতে পারিয়া ছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যখন বিনোদ মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া অতি মৃদুস্বরে শম্ভুকে সম্ভাষণ করিলেন, তখন শম্ভু আহ্লাদে আর থাকিতে পারিলেন না, বিনোদকে বুকে তুলিলেন। শম্ভু মনে করিয়াছিলেন যে পিশাচিনী বিনোদকে হত্যা করিয়াছে, এক্ষণে বিনোদকে জীবিত দেখিয়া দৈবের প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হইল। পরে বিনোদকে উপযুক্ত স্থানে শয়ন করাইয়া চলিয়া গেলেন।

বিনোদের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া শম্ভু অতি দ্রুতপদবিক্ষেপে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিক্রম করিয়া একটী সামান্য গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামটী বনাকীর্ণ, বসতি অতি অল্প; মধ্যে মধ্যে দুই একটি দেব মন্দির আছে, আর অধিকাংশ স্থানে বৃহৎ বৃহৎ ভগ্নাট্টালিকা পড়িয়া রহিয়াছে। শম্ভু একটী

ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দুই একটি পেচক স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ এক ভগ্ন মন্দির বেড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে উড়িতে লাগিল; তাহাদের পক্ষসঞ্চালিত বায়ুর দ্বারা একটি সূক্ষ্ম লতা সেই ভগ্ন মন্দির হইতে ঈষৎ দুলিতে আরম্ভ করিল; দূরে একটি শৃগাল ক্ষুদ্র বন হইতে মাথা তুলিয়া শম্ভুকে দেখিতে লাগিল। চন্দ্রালোকে শম্ভু ধীরে ধীরে ইষ্টকস্তূপের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন, কখন বাম বাহু কখন দক্ষিণ বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া পদস্খলন রক্ষা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। শেষ একটি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, যে গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। পরে মৃদুস্বরে সঙ্কেত করায় রামদাস সন্ন্যাসী দ্বার মোচন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রামদাস প্রথমে শম্ভুকে চিনিতে পারে নাই, পরে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক যোড় করে জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজের এত সত্বর আবার ফেরা হইল কেন? পথে যাইতে কোন ত বিঘ্ন ঘটে নাই?"

শম্ভু সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদাস! তুমি এখনও শয়ন কর নাই?"

রাম। ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যে ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া এই মাত্র গৃহে আসিতেছি।

শম্ভু। দেখ, তাহার কোন অংশে অন্যথা ত হয় নাই?

রাম। মহারাজের আজ্ঞা কখন তিল পরিমাণে অন্যথা হইতে শুনি নাই।

শম্ভু। তোমার অধীনে নৌকা কি পাল্‌কী প্রস্তুত আছে? দুইয়ের এক আমার অবিলম্বে চাই।

রাম। পাল্কী প্রস্তুত হইতে পনের মিনিট লাগিবে, নৌকা প্রস্তুত করিতে আর আধ ঘণ্টা আবশ্যক।

শম্ভু। তবে পাল্কীই ভাল, শীঘ্র আনয়ন কর।

এই বলিয়া শম্ভু এক ভগ্ন পালঙ্কের উপর বসিলেন। রামদাস সত্বর বেহারা ডাকিতে গেল; এই সময় গৈরিক বস্ত্রধারী একটি মোহান্ত আসিয়া দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। শম্ভু তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদাস কি সত্বরে পাল্কী আনিতে পারিবে?"

মোহান্ত উত্তর করিলেন "পারিবে, বেহারা প্রস্তুত আছে, সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে, যেখানে যেখানে মহারাজের আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই খানেই বেহারা প্রস্তুত রাখিবার অনুমতি দিয়াছি, আপনি কবে কোথায় যান, তাহার স্থিরতা নাই, এই জন্যই এ অনুমতি দিয়াছি।"

শম্ভু। উত্তম করিয়াছেন, এক্ষণে একখণ্ড হীরক আনয়ন করুন। ওজন ৫রতির ন্যূন না হয়, ইতি পূর্ব্বে দুই শত টাকা যে কারণে লইয়াছি ইহাও সেই বিষয়ে খরচ লিখিতে অনুমতি করিবেন। আর একটা কথা আছে; দিন দুঃখীর বিবাহ নিমিত্ত কত টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ আছে? মোহান্ত উত্তর করিলেন এক-লক্ষ টাকা

শম্ভু। উত্তম, এই টাকা অদ্য হইতে অনাথ গৃহে বৎসর বৎসর ব্যয়িত হইবে, অনাথ গৃহের বরাদ্দ বড় অল্প আছে।

মোহান্ত। অনাথ গৃহে পাঁচ লক্ষ ব্যয় হইয়া থাকে।

শম্ভু। উত্তম, এখন হইতে ছয় লক্ষ ব্যয় হইবে।

মোহান্ত। মহারাজ যখন বিবাহের বিষয়ে এই টাকা বরাদ্দ করেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, যুবা মাত্রেরই বিবাহ হওয়া উচিত; না হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বভাব কলুষিত হয়, সং-

সার না থাকিলে সমাজ থাকে না; অবিবাহিত অবস্থা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

শম্ভু। এসকল কথা বলিয়া থাকিব, কিন্তু এক্ষণে এবিষয়ে আমার অন্যরূপ বিবেচনা হইয়াছে।

মোহান্ত। যখন মহারাজ অজ্ঞাতবাস হইতে আসিলেন—

শম্ভু। এখনও আমার অজ্ঞাতবাস। বোধ হয় আপনার বলিবার অভিপ্রায় যে, যখন আমি পশ্চিম দেশ হইতে পুনরায় বাঙ্গালায় আসি।

মোহান্ত। আমি তাহাই বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যখন মহারাজ পশ্চিম হইতে আসিয়া রাজকুমারীর কোন উদ্দেশ পাইলেন না—

এই কথায় শম্ভু শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "রাজকুমারীর নাম আর আমার সাক্ষাতে উল্লেখ করিবেন না, আমি তাহার উদ্দেশ পাইয়াছি।"

মোহান্ত তখন শম্ভুর প্রতি চাহিয়া ভীত হইলেন; যে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সমাপ্ত না করিয়া পাল্কী আসিল কি না, তাহা দেখিবার ছলে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। এই সময় রামদাস, গৃহপ্রবেশ করিয়া শম্ভুর নিকট পাল্কী আসার সম্বাদ দিল। শম্ভু উরুর উপর উরু রাখিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা চিবুক ধরিয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে দীপশিখার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছিলেন। রামদাসের স্বর শুনিয়া ধীরে ধীরে মস্তক ফিরাইয়া রামদাসের প্রতি চাহিলেন, রামদাস পুনর্ব্বার বলিল "পাল্কী বেহারা প্রস্তুত।" শম্ভু এই কথাটী বুঝিবার নিমিত্ত আপনা আপনি দুই একবার বলিলেন "পাল্কী বেহারা প্রস্তুত" শেষে স্মরণ হইল। হঠাৎ উঠিয়া রামদাসকে বলিলেন "পাল্কী লইয়া শীঘ্র নুরগ্রামে যাও, তাহার দক্ষিণপাড়ায় একস্থানে তিনটি

দেবদারু বৃক্ষ আছে, সেইখানে যে বাটীরদ্বারে দেখিবে একটি আম্রশাখা ঝুলিতেছে আর তোমার নামের আদ্যাক্ষর ইষ্টকখণ্ডে লিখিত আছে, সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া যে রুগ্ন পুরুষকে দেখিবে, তাহাকে পাল্কীতে তুলিবে। তাহার নাম বিনোদ, সেখানে আর কেহ নাই। বিনোদকে ভুবনপুরে লইয়া আমার বৈঠকখানায় রাখিবে, চিকিৎসা করাইবে; তাহাকে আমার কোন পরিচয় দিও না; সে আমাকে শম্ভু কয়েদি বলিয়া জানে, তাহার সেই বিশ্বাস রাখিযে। আর আর যাহা করিতে হইবে তাহা আমি পরে লিখিয়া পাঠাইব। কিন্তু সাবধান, বিনোদকে যে তোমরা স্থানান্তরিত করিলে ইহা কেহ জানিতে না পারে; প্রতিবাসীরা জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে লইয়া যাইবে। শীঘ্র যাও।"

রামদাস বেহারা সমভিব্যাহারে চলিয়া গেল। এই সময় মোহান্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শম্ভুর হস্তে হীরকখণ্ড আনিয়া দিলেন। শম্ভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি আর কত আছে?" মোহান্ত উত্তর করিলেন "অতি অল্প আছে।" শম্ভু আর অপেক্ষা করিলেন না সত্বর চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিলাস বাবু প্রাচীরের উপর ভীমাকৃতি দেখিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন, মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলেন সেখানে শৈল কি আর কেহই নাই কেবল মৃত্যুদেহ তাঁহার পার্শ্বে পড়িয়া আছে। বিলাস বাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া যথাসাধ্য বেগে পলাইলেন। আপনার গৃহে যাইয়া শয়নকক্ষের সমুদয় দ্বার জানেলা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। তখন কোন ক্রমে মনস্থির করিয়া আকাশ পটে যে মূর্ত্তির

কতক আভাস চিত্রিত দেখিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন "প্রাচীরে কেবল মনুষ্যাকৃতিই দেখিয়াছিলেন।" আবার ভাবিলেন "না, আর কিঁ হইবে।" বিলাস বাবু বাস্তবিক সে মূর্ত্তিটি বিশেষ করিয়া দেখিতে পারেন নাই, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে ভয় সঞ্চারিত হইয়াছিল; একে রাত্রকাল, তাহে নিকটে মৃতদেহ চক্ষুঃ চাহিয়া রহিয়াছে, আবার তিনিই সেই দেহের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলেন। বিলাস বাবু নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহারই পদদলিত হইয়া বিনোদের প্রাণত্যাগ হইয়াছে, অতএব ভয়ে তাঁহার অন্তর কম্পিত হইতেছিল। এই অবস্থায় সামান্য উপলক্ষ হইলেই তিনি মূর্চ্ছা যাইতেন, যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা বেশীর ভাগ।

বিলাস বাবু যাহা দেখিয়াছিলেন শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে সেই সকল মূর্ত্তি ভয়ানক হইতে লাগিল; ক্রমে ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল; শেষ বিলাস বাবু চক্ষু মুদিলেন তবুও বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন, চক্ষু বোজা বৃথা হইল। মনশ্চক্ষে এই সকল মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন দৈহিক চক্ষু মুদিলে কি হইবে। বরং চক্ষু মুদিয়া বিলাস বাবু আরও বিষম করিলেন, ভয়ে আর চক্ষু খুলিতে পারিলেন না; তখন ঘরের ভিতর চারিদিগে সেই সকল বিকট মূর্ত্তি রহিয়াছে বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই সকল মূর্ত্তি যেন তাঁহার দিগে আসিতে লাগিল। তাঁহার শয্যার চারিদিগে বসিতে লাগিল। বসিয়া যেন একবার পরস্পর পরস্পরের দিগে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বিলাসকে দেখাইল; তাহার পর যেন এক বাক্যে সকলেই মাথা নামাইয়া গলা বাড়াইয়া বিলাসের মুখের নিকট তাহাদের নাসা

আনিল, তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস শুনা যাইতে লাগিল, ক্রমে বোধ হইতে লাগিল, তাহাদের নাসা বিলাসের মুখের উপর আসিয়াছে। মুখস্পর্শ করে নাই, অল্প, অতি অল্প, ব্যবধান আছে, স্পর্শ করিতে আর বিলম্ব নাই। তখন বিলাস বাবু ঘর্ম্মাক্ত, কম্পিত, শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। বিকট আকারেরা যেন দন্ত দেখাইয়া নিঃশব্দে হাসিয়া উঠিল। বিলাস বাবু আবার মূর্চ্ছা গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে বিলাস বাবুর জ্ঞান হইল, তখনও মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক রহিয়াছে, কিন্তু কিসের নিমিত্ত সে আতঙ্ক তাহা বড় স্মরণ নাই; ক্রমে চক্ষু উন্মীলন করিলেন, দ্বারের ছিদ্র দিয়া ঘরে সূর্য্যকিরণ আসিয়াছে, পার্শ্বস্থ দ্রব্যাদি দেখিয়া জানিলেন যে তাঁহার আপন শয়ন কক্ষেই আছেন। পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা তখন একে একে স্মরণ হইতে লাগিল। আদ্যোপান্ত সকল স্মরণ হইলে ভাবিতে লাগিলেন, "শেষ যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা কি ভৌতিক? ভৌতিক ভিন্ন আর কি সম্ভবে? মনুষ্য কে এমন আছে যে সেই সময় হঠাৎ উপস্থিত হইবে? শৈলের বাড়িতে কি হইতেছে না হইতেছে তাহা সেই রাত্রে অনুসন্ধান করিবার জন্য কাহার প্রয়োজন পড়িবে? অতএব অবশ্য কোন ভৌতিক ব্যাপার হইয়াছিল। নতুবা শৈল কোথা গেল। শৈলকে কোথায় লইয়া গেল, লইয়া কি করিল, তাহাকে কি বধ করিয়াছে? না—বোধ হয় এই ব্যাপার ভৌতিক নহে, যদি তাহা হইত তবে মৃত দেহ পড়িয়া থাকিত না, শুনিয়াছি, শবের সহিত ভূতের নিকট সম্বন্ধ আছে, ভূতের আবির্ভাব হইলে মৃত দেহ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। যে ব্যক্তি আসিয়াছিল সে ব্যক্তি চোর নহে, শৈলের কি ছিল যে চোর কষ্ট পাইয়া আসিবে? বিশেষ, যদি চোর আসিত তাহা হইলে প্রদীপ আর

আমাদের দেখিয়া কদাচ সে অপেক্ষা করিত না, প্রথম উদ্যমেই পলাইত। কিন্তু যদি চোর না হইল, শৈল অথবা বিনোদের কোন আত্মীয় স্বজন না হইল, তবে কে? তবে কি পুলিষের লোক আসিয়াছিল? মৃত দেহ দেখিয়া শৈলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি যে খুন করিয়াছি তাহা অনুভব করিতে পারে নাই, বোধ হয় আমাকে দেখিতেও পায় নাই। কিন্তু না দেখুক শৈল বলিয়া দিবে, সে অনায়াসে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। বিশ্বাসঘাতিনী নিশ্চয়ই আমার নাম করিবে। তাহা হইলেই আমি গেলাম। খুন করিয়াছি, আমিই খুন করিয়াছি। ফাঁসি—”

ফাঁসির আনুষঙ্গিক একেবারে সমস্তই মনে পড়িল, চারিদিগে কনেষ্টবল, মেজেষ্টর, ও অন্যান্য লোক, মধ্যস্থানে মঞ্চ, তাহার কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপানাবলি, ঊর্দ্ধে দড়ি ঝুলিতেছে। বিলাস বাবু অমনি আপনার গলায় একবার হাত দিলেন, ভাবিলেন, “এইবার আমার শেষ হইল, গোপাল বাবু প্রভৃতি সকলেই এই পৃথিবীতে সুখ ভোগ করিবে কেবল আমিই গেলাম। কেনই বা এমন কুকার্য্য করিয়াছিলাম। শৈলের সহিত আলাপ হইবার পূর্ব্বে আমি ত সুখী ছিলাম; কত সুখী ছিলাম; এখন আমার দশা কি হইল। ক্রমে তাঁহার চক্ষে জল আসিল, “বিনোদ! বিনোদ!” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বিনোদ! আমি তোমার নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধী, তুমি আমায় বিনাশ করিলে উচিত বিচার হইত, তাহা না হইয়া আমি তোমায় হত্যা করিয়াছি।”

ক্রন্দনধ্বনি বিলাস বাবুর মাতৃস্বসার কর্ণে গেল, তিনি কর্ম্মান্তরে বিলাস বাবুর শয়ন কক্ষের নিকট আসিয়াছিলেন। শব্দ শুনিয়া দ্বার ঠেলিলেন, দ্বার রুদ্ধ; বিলাসকে ডাকিলেন,

বিলাস ভগ্নস্বরে উত্তর দিলেন। তাঁহার মাতৃস্বসা ভাবিলেন, বিলাস সপ্নে কাঁদিয়াছে—অতএব আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বিলাস বাবু গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন বেলা দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে, ভাবিলেন। "এত বেলা হইয়াছে অথচ কেহ আমাকে ডাকে নাই, মাসি আমার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়াও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। অবশ্য আমার প্রতি সকলের কিছু মন ভার হইয়াছে, রাত্রের ব্যাপার সকলে জানিতে পারিয়াছেন। পুলিষে সম্বাদ পাইয়াছে বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা, পুলিস জানিতে পারিলে এত বেলা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকিত না, প্রত্যূষে আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিত। কেবল এই গ্রাম বাসীরা যদি জানিয়া থাকে তবে অবশ্য সৎকারের নিমিত্ত বিনোদকে নদীকূলে লইয়া গিয়াছে।"

এই মনে করিয়া বিলাস বাবু ছাদের উপর উঠিলেন, তথা হইতে বিনোদের গৃহাভ্যান্তর কিছুই দেখা যায় না, কেবল প্রাঙ্গনস্থ আম্রবৃক্ষের উর্দ্ধভাগ দেখা যায়, তথায় শকুনি প্রভৃতি মাংস ভুক্ পক্ষী মাত্র দেখিতে পাইলেন না, কুক্কুর দিগের কলহ ধ্বনি শুনিতে পাইলেন না অতএব মনে করিলেন যে নিশ্চয় বিনোদকে সংকারের নিমিত্ত প্রতিবাসীরা লইয়া গিয়াছে। আবার ভাবিলেন, "আমিও ত প্রতিবাসী, নিকট এবং আত্মীয়, আমাকে ডাকে নাই, তাহাতেই বোধ হইতেছে সকলে জানিতে পারিয়াছে, নতুবা আমাকে ডাকিত।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিলাস ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া আপন কক্ষে যাইতেছিলেন এমত সময় পথে কনিষ্ঠা সহোদরার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক রাত্রের মধ্যে বিলাসের মুখমাধুরী একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। চর্ম্ম শুষ্ক হইয়াছে, চক্ষু

তেজোহীন, কেশ রুক্ষ এবং কণ্টকবৎ হইয়াছে; বিলাস বাবু যেন কত দিনের রোগী। তাঁহার ভগিনী হঠাৎ তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। লজ্জাবতী কখন জ্যেষ্ঠের সম্মুখে মুখ তুলেনাই অদ্য চাহিয়া রহিল। ~~বিনোদ~~ ভাবিলেন সহোদরাও সকল শুনিয়াছে তাহারও আমার প্রতি ঘৃণা হইয়াছে। বিনোদ সত্বরে আপন ঘরে লুকাইলেন, কিঞ্চিৎ বিলম্বে জানেলার রন্ধ্র দিয়া দেখিলেন পাকশালার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দুইটি প্রতিবাসীর কন্যা অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে আর, একবার একবার এদিগ ওদিগ চাহিতেছে বিলাস বাবু নিশ্চয় বুঝিলেন তাঁহারই কথা হইতেছে। এই সময় তাঁহার সহোদরা আসিয়া ওষ্ঠাধর মধ্যে অঞ্চলাগ্র দিয়া তাহাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিলাসের সন্দেহ হইল যে নিশ্চয় আমার কথা হইতেছে।

আবার ক্ষণেক বিলম্বে অন্য জানেলা খুলিয়া দেখেন পথে স্থানে স্থানে দুই চারি জন লোক দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। বিলাস ভাবিলেন অন্য দিন ত এত কথা বার্ত্তা লোকে কহিত না, অদ্য সকলে কেবল আমারই কথা কহিতেছে। আমি কি কুকার্য্যই করিয়াছি।

বিলাস বাবু অতি ব্যথিত হইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। এই সময় এক জন বৃদ্ধা অপরের সহিত কলহ করিয়া পথিমধ্যে আপনা আপনি দুই একটি তিরস্কার ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতেছিল। বিলাস বাবু অন্যমনস্ক ছিলেন বৃদ্ধার কেবল এই কথাগুলিন শুনিতে পাইলেন "অমন লোকের গলায় দড়ি, ছি! যারে হাড়ি বাগ্দীতে গালি দেয়, ঝাঁটা মারিতে চায় তার আবার বাঁচা কেন।" বৃদ্ধা জাতিতে বাগ্দী। বিলাস বাবু ভাবিলেন "এই গালি লোকে পথে আমারই উদ্দেশে দিতেছে।

যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই তবে আর কখন বাটীর বাহির হইতে পারিব না।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে দেঁতোর মা গোপালবাবুর অন্তঃপুরে অসিয়া গোপাল বাবুর পরিবারকে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিল, গোপাল বাবুর স্ত্রী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেঁতোর মা, তুমি এত দিন কোথা ছিলে?”

দেঁতোর মা উত্তর করিল, “আমি জেলখানার নিকট একটি গৃহস্থের বাটীতে আছি, আমাদের বাবুকে দেখিতে পাব বলে সেইখানে গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, একান্ত দেখিতে না পাই, তথাপি তাঁহার নিকটে আছি, এই মনে করিতে পারিলেও আমার সুখ হবে। প্রথম প্রথম তাঁকে দেখিতে পাই নাই, এক এক দিন জেলখানার ভিতর সন্ধ্যার সময় বড় গোল হইত; কেন গোল হইত তখন আমি তাহা জানিতাম না, কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিত, কত দেবতার নিকট মানিতাম যেন আমাদের বাবুর আবার কোন বিপদ না ঘটে।” এই বলিতে বলিতে দেঁতোর মা অঞ্চল দিয়া আপনার চক্ষের জল মুছিলেন, যাঁহারা সেখানে বসিয়াছিলেন, একে একে সকলেই চক্ষু মুছিলেন। তাহার পর দেঁতোর মা বলিতে লাগিল, “এক-দিন বাবুকে দেখিতে পাইলাম, তিনি অন্য কয়েদীর সঙ্গে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। একে স্বভাবতঃ শান্ত, তাতে লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছেন। অন্য কয়েদীরা হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে আসিল, আসিয়াই

ঝুপ ঝাপ করিয়া জলে পড়িল, কেহ সাঁতার দিতে লাগিল, কেহ গীত গাইতে লাগিল, কেহ জল ছড়াইতে লাগিল, পুকুর একেবারে তোলপাড় করিয়া ফেলিল। আমাদের বাবু ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, কোন দিকে ফিরেও চাহিলেন না, কাহারও সহিত কথাও কহিলেন না, পোড়া লোকেরা কেহ একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসাও করিল না। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে ঠাকুর, বাবু একটা কথা কহেন ত আমার কাণ জুড়ায়, একবার একটু হাসেন ত আমার প্রাণ জুড়ায়। ওমুখ কখন হাসি ছাড়া ছিল না। হাসি দূরে থাক, একটি কথাও কহিলেন না, পরে বাবু জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে লাগিলেন। আমি দাঁড়াইয়া মুখ খানি দেখিতে লাগিলাম; শেষ যখন বাবু হাত যোড় করিয়া সূর্য্যের দিকে মাথা তুলিলেন, আমার বুক উথলে উঠিল। আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম বাবু মনোবেদনা সূর্য্য-দেবকে জানাইতেছেন। আমিও সেইখানে কলসী রাখিয়া তেমনি করে হাত যোড় করিয়া সূর্য্যের কাছে কাঁদিলাম। বলি ঠাকুর, তুমিই এসংসারে সত্য, তুমি সকল দেখিতেছ, রাত্র দিন করিতেছ, বাবু যে নির্দ্দোষী তা জেনেও কেন আর দুঃখ দেও ঠাকুর! যেমন করে তুমি অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাক, একবার তেমনি করে বাবুর শত্রু নষ্ট কর, দশে ধর্ম্মে দেখুক। তার পর সন্ধ্যা করা হইলে বাবু সকলের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেই দিন ভিন্ন আর আমি বাবুকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যখনই বাবুর যোড় হাত মনে পড়িত তখনই কেঁদে উঠিতাম।”

গোপাল বাবুর পরিবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি এখন সেখানকার চাকুরি ছেড়ে এসেছ?”

দৈত্যের মা বলিয়া উঠিল, “আসল কথা ভুলিয়াগিয়াছি। যদিও বাবুকে আর দেখিতে পাই নাই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বাবুর

সম্বাদ পাইতাম; বাবুর বড় শক্ত পীড়া হইয়াছিল। রোগ দেখে সাহেবেরা তাঁহাকে কাল ছাড়িয়া দিয়াছে। এই কথা আজ প্রাতে শুনে তাই দৌড়ে এলাম; কিন্তু দেখা হল না, মাঠাকুরাণী এখনও দ্বার খুলেন নাই; পাছে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, তাই বুঝি লজ্জায় দ্বার খুলেন নাই, তা হোক খেদ মিটিয়ে একা সেবা করুন্, আমি না হয় পরশ্ব সেবা করিব, তিনি যে এখন আপনার ধন চিনিতে পারিলেন এই আমাদের সুখ। তা, মা আজ আর কোথা যাব, বলি, তোমার ঘরের এক পাশে পড়ে থাকি।"

গোপাল বাবুর স্ত্রী তাহাকে থাকিতে বলিয়া স্বামীর নিকট যাইয়া কহিলেন, যে "বিনোদ বাবু বড় পীড়িত বলিয়া সাহেব তাঁহাকে খালাস দিয়াছে। তিনি গত রাত্রে বাটী আসিয়া থাকিবেন কিন্তু শৈল এপর্য্যন্ত দ্বার খুলে নাই বলিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে, তুমি লোকদ্বারা একবার সম্বাদ জান। আপনি স্বয়ং সে স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই।" গোপাল বাবু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় এসম্বাদ কে দিল?" তাঁহার পরিবার দৈঁতোর মা ও দুই একজন প্রতিবাসিনীকে দেখাইয়া দিলে গোপাল বাবু স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন; শৈল এ পর্য্যন্ত কেন দ্বার খুলে নাই, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। রাত্রে বিনোদকে লইয়া যাইবার সময় রামদাস সন্ন্যাসী বাটীর ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছিলেন এ সম্বাদ কেহই জানিত না, সুতরাং সকলেই ভাবিয়াছিল শৈলই দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরে রহিয়াছে। শেষ গোপাল বাবু বহির্ব্বাটীতে আসিয়া জনেক সরকার দ্বারা দারগার নিকট সম্বাদ পাঠাইলেন।

ক্রমে অপরাহ্ন হইয়া আসিল। গোপাল বাবু আপন বাটীর

সম্মুখে এক পুষ্পোদ্যানে বসিয়া কি ভাবিতেছেন, নিকটে তাঁহার কন্যা দাঁড়াইয়া একটি গোবৎসের সহিত সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার ক্রীড়া দেখিতেছে। নববৎসটি এক একবার দৌড়িয়া আসিয়া শিশুর সম্মুখে দাঁড়াইতেছে; শিশু তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিতেছে আবার বৎসটি পূর্ব্বরূপ দৌড়িয়া পলাইতেছে, আবার আসিতেছে, একবার একবার আঘ্রাণ লইবার নিমিত্ত শিশুর মস্তকের নিকট নাসা বিস্তার করিতেছে, শিশু চক্ষু মুদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। বৎস অপ্রতিভ হইয়া অমনি পলাইতেছে।

এই সময় বিলাস বাবু তথায় আসিলেন, আসিবার ভঙ্গী দেখিয়া গোপাল বাবুর কন্যা তাহার আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিল। পদদ্বয় অচল হইয়াছে, কিঞ্চিৎ বক্রভাবে ভূমিস্পর্শ করিতেছে। গোপাল বাবুর কন্যা ভাবিল পায়ে বেদনা হইয়া থাকিবে। বিলাস বাবুর সম্মুখদৃষ্টি ঘুচিয়া প্রায় পার্শ্বদৃষ্টি হইয়াছে। গোপাল বাবুর কন্যা ভাবিল বিলাস বাবু টেরা হইয়াছেন। বিলাস বাবু প্রায় পাঁচ ছয় মাস হইবে গোপাল বাবুর বাটীতে আসেন নাই।

বিলাস বাবু আসিয়া দূরে দাঁড়াইলেন; গোপাল বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অল্প শব্দ করিলেন। গোপাল বাবু তাঁহার প্রতি চাহিবামাত্র বিলাস বাবু বায়ুতে মাথা ঠুকিলেন, অর্থাৎ আধুনিক না ইংরাজি না মুসলমানী কেতায় সম্ভাষণ করিলেন। গোপাল বাবু অন্যমনস্কবশতঃই হউক আর ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, সে সম্ভাষণ বড় গ্রহণ করিলেন না। বিলাস বাবু ভাবিলেন, আমাকে গোপাল বাবু ভাল চিনিতে পারেন নাই, অতএব দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া স্বর পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত দুই এক

বার কাসিলেন, পরে বলিলেন, "গোপাল বাবু ভাল আছেন? কল্য রাত্রে আমি এখানে ছিলাম না, তাই ভাবিলাম যে, সে কথাটা একবার আপনাকে বলে আসি আর একবার দেখা করে আসি, অনেক দিন দেখা হয় নাই।" গোপাল বাবু ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ভাল আছেন?" বিলাস বাবু কৃতার্থ হইয়া বলিলেন "'আমাকে' 'আপনি' 'মহাশয়' এ সকল কথা কেন বলেন? পূর্ব্বে যখন ঐ বৈঠকখানায় বসিয়া দিবা রাত্র তাস খেলা যাইত তখন ত এ সকল শব্দ প্রয়োগ করেন নাই; আমি আপনার চিরইয়ার।"

এই সময় দারগা কনেষ্টবল সমভিব্যাহারে গোপাল বাবুর গেটের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিলাস বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি পলাইবার উদ্যম করিলেন। দারগা উপহাসচ্ছলে বলিলেন, "বিলাস বাবু পলাও কেন?" বিলাস বাবু সত্য সত্যই পলাইলেন। যেদিগে গেট সেদিগে কনেষ্টবলগণ ছিল বলিয়া অন্য দিগে ছুটিলেন, কিন্তু অল্প দূরে গিয়াই দেখেন সম্মুখে প্রাচীর। পুষ্পোদ্যানের চারি দিগে প্রাচীর আছে তাহা বিলাস বাবু বিলক্ষণ জানিতেন কিন্তু পলাইবার সময় সে কথা মনে আসিল না। সম্মুখে প্রাচীর দেখিয়া বিলাস বাবু তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। বিলাস বাবু কেন পলাইলেন একথা গোপাল বাবু কি দারগা কেহই বুঝিতে না পারিয়া উভয়ে বিলাস বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। বিলাস বাবু ভূমি হইতে উঠিয়া দেখেন দারগা নিকটে দাঁড়াইয়া। তখন অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন "যখন আপনি সকলই জানিয়াছেন, তখন আমি আর কত দূর পলাইব; আমি ধরা দিলাম কিন্তু সত্য করে বলুন আমার কি ফাঁসি হবে? আমি খুন করেছি সত্য, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক কি জানত খুন করি

নাই; অন্ধকারে বুকে পা দিয়াছিলাম তাতেই বিনোদের প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।”

গোপাল বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তবে কি“ বিনোদ নাই!”

বিলাস বাবু বলিলেন, “ বিনোদ নাই, কল্য রাত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, দারগা মহাশয় তা সকল জানেন।”

দারগা মহাশয় আর কোন উত্তর না করিয়া বিলাসকে গ্রেপ্তার করিলেন। সজোরে হাতকড়ি কষিতে, বিলাসকে লাগিল। বিলাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন গোলমাল শুনিয়া প্রতিবাসীরা চারি দিগে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্রমশঃ

অনন্তা।

পৃথিবীর একটি নাম অনন্তা। যখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী অনন্ত তখন এই নামটি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কেহ এই পুরাতন নামটি কাড়িয়া লইতে চাহেন। তাঁহারা বলেন “যে পৃথিবী মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে এই নামটি লইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার অন্ত পাওয়া গিয়াছে; কতকটা তাঁহার চরিত্র জানাগিয়াছে আর তাঁহাকে আমরা মিথ্যা নাম ধরিয়া ডাকিব না।”

কিন্তু আবার অনেকে এই মতের বিরোধী আছেন; তাঁহাদের বিশ্বাস আছে যে পৃথিবী বাস্তবিক অনন্ত। যাঁহারা এই মতাবলম্বী তাঁহারা পৃথিবীকে ভাল বাসেন; তাঁহাদের সম্প্রদায়ে প্রায় পুরাতন লোকই অধিক; তাঁহারা অনেককাল পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে বাস করিয়া আসিতেছেন কাজেই কৃতজ্ঞ; প্রাচীনা

পৃথিবীকে অসম্ভব গুণে অলঙ্কৃত করিতে চাহেন। কিন্তু অনন্তত্ব একটি মহাগুণ, কেবল সময় আর শূন্য ভিন্ন তাহা আর কাহারও সম্ভবে না।

পৃথিবী অনন্ত এ বিশ্বাসটি বড় সুখের, যাঁহাদের এ বিশ্বাস আছে তাঁহারা ভাবেন যে দিকে হউক যত দূর যাইতে ইচ্ছা ততদূর যাওয়া যায় তথাপি পৃথিবীর শেষ হয় না। বাস্তবিক এই কথা ভাবিয়া দেখিতে পারিলে চমৎকার বোধ হইবে। এক দিক্ অবলম্বন করিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর গেলেও পৃথিবীর সীমা পাওয়া যাইবে না, আরও আছে, তাহার পর আরও আছে, আবার লক্ষ বৎসর যাও তথাপি আরও আছে; আবার কোটি বৎসর যাও তখনও পৃথিবীর শেষ হয় নাই; শেষ নাই; আরও আছে।

অনন্ত অনুভবাসাধ্য, যত দূর সাধ্য তত দূর সুখদ, আমরা এ সুখ সহজে ছাড়িতে চাহি না। আমাদের শাস্ত্রে পৃথিবী অনন্ত বলিয়া পরিচিত, আমরাও তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। ইহার মধ্যে একটি কথা আছে; সূর্য্য প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় পশ্চিম দিকে অস্তে গিয়া আবার পর দিন প্রাতঃকালে পূর্ব্ব দিকে আসিয়া উদয় হয়েন, পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে আসিতে হইলে অবশ্য তাঁহাকে পাতাল দিয়া আসিতে হয়; কিন্তু তিনি কোন্ পথ দিয়া পাতালে নামিয়া থাকেন? পৃথিবী অনন্ত, যেখানে নামিবেন সেইখানেই পৃথিবী ঠেকিবে। তবে স্বীকার করিতে হইল পশ্চিম দিকে কোথাও একটি বৃহৎ গর্ত্ত আছে; সূর্য্য সেই গর্ত্ত দিয়া অবতরণ করিয়া পাতালে যান, আবার পূর্ব্ব দিকে ঐরূপ আর একটি গর্ত্ত আছে সেই গর্ত্ত দিয়া উদয় হন। সূর্য্যের আবার দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণ আছে। দক্ষিণ হইতে ক্রমে ক্রমে উত্তরে সরিয়া আইসেন আবার উত্তর হইতে সরিয়া সরিয়া দক্ষিণে যান। তাহাহইলে উদয়াস্তের গর্ত্তগুলিন অতি দীর্ঘ

হইবে; উত্তর দক্ষিণে বহুদূর ব্যাপিয়া লম্বা; নতুবা উদয়াস্ত এক স্থানেই হইত।

আবার নক্ষত্র গ্রহাদিরও উদয়াস্ত আছে। কোন নক্ষত্র অতি দক্ষিণে উদয় হয় অতি দক্ষিণে অস্ত যায়; আবার কোন নক্ষত্র অতি উত্তরে উদয় হয় অতি উত্তরে অস্ত যায়। দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত এমন কোন স্থান নাই যে একটি না একটি নক্ষত্র সেই স্থানে উদয় হয় না কি অস্তে যায় না। তাহাহইলে যে গর্ত্তে সূর্য্য উদয় হন বা অস্তে যান সে গর্ত্ত অতি দক্ষিণ হইতে অতি উত্তর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে অর্থাৎ উদয়াস্তের নিমিত্ত পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় পার্শ্বে একাদিক্রমে লম্বা গর্ত্ত আছে। সেই গর্ত্তের সীমাই পৃথিবীর সীমা, তাহাহইলে আর পৃথিবী অনন্ত নহেন পৃথিবীর অন্ত নির্দ্দেশ হইল।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের কৌশল অপার। তাঁহারা এই সময় চক্ষু মুদিত করিয়া বলিলেন, পাতাল হইতে সূর্য্য উদয় হয়েন না, তিনি পশ্চিম হইতে পাতাল দিয়া পূর্ব্ব দিকে উদয় হইতে যান না, সূর্য্য কেবল সুমেরু পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া ঘুরেন; সুমেরুর পার্শ্বে গেলে অস্ত বলি; আবার অপর পার্শ্ব হইতে বহির্গত হইলে উদয় বলি। এ বড় মন্দ কথা নহে। শাস্ত্রকারেরা বলেন সুমেরু অতি প্রকাণ্ড অতি উচ্চ পর্ব্বত, পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। যখন তাঁহারা বৃক্ষান্তরালে সূর্য্য দেখেন তখন ভাবেন সূর্য্য সুমেরুর অন্তরালে যাইতেছেন অথবা সুমেরুর অন্তরাল হইতে বহির্গত হইতেছেন। সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া জলরাশির পার্শ্ব হইতে সূর্য্যকে যখন উঠিতে দেখেন তখন ভাবেন এই জলের পার্শ্বে অবশ্য সুমেরু আছে সূর্য্য সুমেরুর পার্শ্ব হইতে বাহির হইতেছেন।

যিনিই সমুদ্রকূলে সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিবেন তিনিই বোধ

হয় সুমেরু সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে হাস্য করিবেন; কিন্তু শাস্ত্রে যাঁহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। অন্যে সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া জলরাশি হইতে সূর্য্যকে উঠিতে দেখিবেন শাস্ত্রভক্তরা সেইখানে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে পর্ব্বত পার্শ্ব হইতে বহির্গত হইতে দেখিবেন; ওখানে পর্ব্বত কৈ? জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন অবশ্যই আছে, শাস্ত্র মিথ্যা হইবার নহে, পর্ব্বত পাষাণময়, দূরে আছে বলিয়া দেখা যাইতেছে না, সূর্য্য সেই পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে যখন ক্রমে বহির্গত হইতে থাকেন তোমরা তখন সূর্য্য উদয় হইতেছেন বল। যদি এই কথার প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা কর যে, সুমেরু কি দক্ষিনায়নের সময় দক্ষিণ দিকে উত্তরায়ণের সময় উত্তর দিকে সরিয়া যান? এইরূপ সরিয়া না গেলে সূর্য্য উদয়াস্ত একস্থানে হইত। শাস্ত্রভক্তরা এই কথার উত্তর কি দেন তাহা আমরা জানি না কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে শাস্ত্রে তাঁহাদের বিশ্বাস অচলা তদ্বিরুদ্ধে যতই শুনুন বা যতই দেখুন কখন সে বিশ্বাসের অন্যথা হয় না। ধর্ম্ম বিষয়ে এরূপ অচলা বিশ্বাস উপকারী। এই দৃঢ়তার বলে হিন্দুধর্ম্ম এত দীর্ঘজীবী হইয়াছেন; কিন্তু এই দৃঢ়তার দোষে আমাদের দেশ হইতে বিজ্ঞানদেবী অন্তর্হিত হইয়াছেন।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া এ দেশে কেহ তাহা গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সেই মত সপ্রমাণিত হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবী কদম্ব কুসুমাকার: সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন। বিলাতীয় বিজ্ঞানবিদেরাও এই মত অবলম্বন করিয়া অন্য অনেক কথা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছেন।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড। আশ্বিন ১২৮১। ৬ সংখ্যা।

কণ্ঠমালা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদের দুরদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই সুখ সংসারে সচরাচর ঘটে না। তজ্জনিত বিনোদের যে চিত্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহাও প্রায় সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিনোদের পক্ষে শৈল এ সংসারের এক মাত্র গ্রন্থি ছিল: সে গ্রন্থি ছিঁড়িল। বিনোদের চক্ষে সকলই শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল: তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন সংসার অকারণ, পৃথিবী অকারণ, সৃষ্টিই অকারণ।

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্র দ্বারা বিনোদের মনের অবস্থা কতক অনুভূত হইতে পারে। এই পত্রগুলিন বিনোদ সময়ে সময়ে শম্ভুকে লিখিয়াছিলেন। কোন পত্রে শৈলের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহা না থাকুক, মনের যন্ত্রণায় যে পত্র-

গুলিন লিখিত হইয়াছিল তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম পত্র।

যেখানে পাঠাইয়াছিলে আমি সেই খানেই আছি। স্থানটি চমৎকার নির্জ্জন; যে কয় দিন বাঁচি ইচ্ছা হয় যেন এই খানেই থাকিতে পাই। পূর্ব্বদিগের জানেলা খোলা থাকে: পালঙ্কে শুইয়া আমি সেই দিগে সর্ব্বদা চাহিয়া থাকি, কেবল পৃথিবী দেখি। আকাশ, প্রান্তর, আর মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ ব্যতীত এদিকে আর কিছুই নাই। মনুষ্য সমাগম একেবারে নাই।

এই মাত্র বড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ পরিস্কার হইয়াছে। দুর্ব্বাদল, বৃক্ষ পত্র, সূর্য্য কিরণে নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। নানা বর্ণের প্রজাপতি উড়িতেছে; পক্ষীরা কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। এক একটি পক্ষী একা বসিয়া প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিতেছে: তাহারা কিছু চাহেনা, কাহারেও ডাকে না, অথচ আপন মনে চীৎকার করিতেছে। আমার ইচ্ছা হয় আমিও ঐ রূপ একবার প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করি. কিন্তু পারি না। ইতি

দ্বিতীয় পত্র।

এক্ষণে আমি এক একটু চলিতে পারি, অদ্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রায় দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলাম। আমি এত দূর চলিতে পারি দেখিয়া আমার আনন্দের আর সীমা ছিল না, নবশিশু দুই এক পদ চলিতে পারিলে যে রূপ আপনাকে অসামান্য মনে করিয়া আনন্দে হাসিতে থাকে, আমার ও সেই রূপ হইয়াছিল। আমি যে আর কখন চলিয়াছিলাম কি চলিতে পারিতাম তাহা আমার মনে ছিল না। আমার

চলিতে ইচ্ছা কেন, চলিতে এত যত্ন কেন, এত আনন্দ কেন তাহা বুঝিতে পারি না। ইতি

তৃতীয় পত্র।

অদ্য কবিরাজ আসিয়াছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া শেষ বলিলেন "আর ভয় নাই আপনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।" অমনি আমি আহ্লাদে তাঁহার হাত ধরিয়াছিলাম। হাত ধরিয়াই সকল মনে পড়িল। আমার আহ্লাদ কেন? সম্প্রতি অনেকবার ভাবিয়া ছিলাম জীবনে আর আমার ইচ্ছা নাই; মরিলেই ভাল। কিন্তু সে কথা মিথ্যা; অদ্য ধরা পড়িয়াছি। বাঁচিতে আমার বড় ইচ্ছা! কিন্তু কেন?

আমার মত দুর্ভাগ্যেরও এ পৃথিবীতে অবশ্য কিছু সুখ আছে, নতুবা বাঁচিতে ইচ্ছা কেন। কিন্তু সে সুখ কি?

আমার যে আর কিছুই ভাল লাগে না একথা আমি বলিতে পারি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীদল প্রাতে ঐ ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষে বসিয়া কত কথা বলে, কত কলহ করে, কত বার উড়ে কতবার বসে, কত পুষ্পঝরাইয়া ফেলে, আমি তাহা দেখিতে ভাল বাসি। প্রজাপতি গুলিন উড়িতেছে, কখন শূন্যে উঠিতেছে, কখন নামিতেছে, একের পশ্চাতে অপরটি ছুটিতেছে, প্রথমটি আবার পলাইতেছে; আমি তাহা দেখিতে ভাল বাসি। বড় বড় তরু সকল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যে খানে জন্মিয়াছিল সেই খানেই দাঁড়াইয়া আছে, কতবার দুলিয়াছে একবারও সরে নাই; আমি তাহা দেখিতে ভাল বাসি। অতি প্রচণ্ড রৌদ্রে বৃহৎ বৃহৎ পক্ষীরা উচ্চ আকাশে উঠিয়া তিলবৎ আকারে ঘুরিতেছে, আমি তাহা দেখিতে ভাল বাসি। ভালবাসি সত্য, কিন্তু কেবল এই সকল দেখিবার নিমিত্ত কি আমি বাঁচিতে চাহি? কদাচ নহে।

সকল সময় ত এসমস্ত আমার ভাল লাগে না। যখনই ভাবি ঐ বৃহৎ পক্ষী সমস্ত দিন কেবল আহারের নিমিত্ত এই প্রচণ্ড সূর্য্য তাপে উড়িতেছে, অমনি আমার রাগ হয়;এই যে সুন্দর প্রজাপতিসর্ব্বদা উড়িতেছে ইহারও আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল,আহার খুঁজিতেছে, মরণ পর্য্যন্ত কেবল আহারই খুজিবে! কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা! ইহারা কেবল আহারের নিমিত্ত জন্মিয়াছে। হে জগদীশ্বর! এই সুন্দর প্রজাপতিদিগকে উদ্ধার কর, আর ইহাদের যন্ত্রণা দেখা যায় না।

কেবল প্রজাপতিরই কথা কেন বলি। জগতের সকল জীবই এইরূপ যন্ত্রণা পাইতেছে। ভেক মুষিক, হস্তী সিংহ, মসা মাছি, বিহঙ্গ বানর সকলেই কেবল আহার অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের আর কোন ইচ্ছা নাই, কোনউদ্দেশ্য নাই। হে জগদীশ্বর! তাহাদের কেবল কি আহার করিতে পাঠাইয়াছ?

কেবল এই সকল জীব জন্তু কেন? মনুষ্যই বা কি? তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের উদ্দেশ্য কেবল আহার। লক্ষ লক্ষ মনুষ্য নিত্য জন্মিয়াছে; লক্ষ লক্ষ নিত্য মরিয়াছে; কিন্তু আহার ভিন্ন তাহারা আর কি করিয়া গিয়াছে। এই রূপ কত কাল অবধি মনুষ্য জন্মিতেছে মরিতেছে, তাহাদের সংখ্যা—হে জগদীশ্বর—তাহাদের সংখ্যা একবার আমার হৃদয়ে অনুভূত করাইয়া দেও; একবার আমি তাহা ভাবিয়া দেখি। এই অসংখ্য অভাবনীয় মনুষ্য রাশি কি কেবল আহার করিবার নিমিত্ত সৃজিত হইয়াছিল? তাহারা এখন কোথায়? তাহাদের এক্ষণে আর কি চিহ্ন আছে! তাহারা কেন জন্মিয়াছিল? সত্য সত্যই কি কেবল আহার করিতে জন্মিয়াছিল? তাহা যদি হয়, তবে—হে ঈশ্বর—এজীবন অনর্থক, এ দেহ বৃথা, আমি ইহা চাই না, তোমার পৃথিবী মিথ্যা। প্রত্যহ তোমার সেই দিন

সেই রাত্রি; সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র; সেই বৃক্ষ, সেই লতা; সেই জল, সেই স্থল; আর আমার সহে না; আমার শেষ কর।

শেষ কি? মৃত্যু! তাহার পর—পরকাল। তাহাও কি এই রূপ উদ্দেশ্যরহিত? কে জানে, কে বলিতে পারে। পরকাল যে দেখেছে সে ফেরে নাই; তৎসম্বন্ধে যে যাহা বলে সে কেবল অনুভব মাত্র; শাস্ত্রের কথাও কেবল অনুভবমূলক। কিন্তু পরকাল এক নিমিষের পথ, আমি এখনই দেখিলে দেখিতে পারি; ইহকাল আর পরকালের মধ্যে অতি সূক্ষ্মচ্ছেদ, এখনই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারি। এক পদ গেলেই পরলোক দেখিতে পাই; কিন্তু তাহা দেখিলে আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না। তখন যদি ভাল না লাগে? তখন যদি পরলোক অপেক্ষা ইহলোক ভাল বোধ হয়, তবে কি উপায় হইবে?

আমি মরিব না, পরলোক আনি চাহি না। চাহি না বা কেন বলি, মরণ আছেই; মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়, অপরিহার্য্য, যে জন্মিয়াছে সেই মরিয়াছে অথবা মরিবে। তুমি নিশ্চয় মরিবে। আমিও নিশ্চয় মরিব। সময় উপস্থিত হইলে যত্নে কি ঔষধে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা বৃথা।

মরণ নিশ্চিত, এই পাপ সংসার হইতে যে উদ্ধার হইব তাহা কাজেই নিশ্চিত; তবে মরিতে অনিচ্ছা কেন? মরিতে ভয় কেন? বাঁচিব শুনিলে আহ্লাদ কেন? মনের এ সকল গতি কিছুই বুঝিতে পারি না।

পরকালের প্রতি সন্দেহই কি এই ভয়ের কারণ? তাহা হইলেও হইতে পারে। তবে পরকালের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস আছে, যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ, বোধ হয় মরিতে কেবল তাঁহাদেরই ভয় হয় না।

এ সকল চিন্তা আমার পক্ষে এক্ষণে গুরুতর হইয়া পড়ি-

য়াছে। কিন্তু বোধ হয় তোমার ভাল লাগে না। অতএব ক্ষান্ত হইলাম। ইতি

চতুর্থ পত্র।

তোমার বয়স হইয়াছে, অনেক দেখিয়াছ, অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু বলদেখি কখন কি এ সংসারে উদ্দেশরহিত ব্যক্তি দেখিয়াছ? যে সংসারী, সংসারের সুখ তাহার উদ্দেশ্য; যে সন্ন্যাসী পরকালের সুখ তাহার উদ্দেশ্য; যে দীনহীন ধনোপার্জ্জন তাহার উদ্দেশ্য; যে ধনবান, প্রতিষ্ঠা তাহার উদ্দেশ্য; এইরূপ সকলেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে। তাহাই উপলক্ষ করিয়া সকলেই কার্য্য করে, কিন্তু যাহার উদ্দেশ্য নাই সে কি বিষয়ের উদ্যোগ করিবে? সে ব্যক্তি প্রাতে উঠিয়া ভাবিবে কি করিব? মধ্যাহ্নে বসিয়া ভাবিবে কি করিব? শয়নকালে দীপ জ্বালিয়া ভাবিবে কি করিব? বাস্তবিক এ পৃথিবীতে সে কি করিবে? তাহার সংসার নাই যে পরিবারের সুখসাধন নিমিত্ত অর্থ উপার্জ্জন করিবে; তাহার সমাজ নাই যে সমাজের উপকার করিয়া সুখানুভব করিবে, তাহার ঈশ্বর নাই যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আশা উদ্দীপন করিবে; তাহার কিছুই নাই, সে পৃথিবীতে কেন থাকিবে; তাহার বাঁচিবার প্রয়োজন কি? সে আপনিই আপনার লোপ করিবে। তাহার আত্মহত্যা অসঙ্গত নহে। সে কতকাল অকারণে আর এখানে থাকিবে? তাহার অবস্থা ভয়ানক!

পূর্ব্বে অরণ্য মধ্যে একটী শালবৃক্ষের এই ভয়ানক অবস্থা দেখিয়াছিলাম। কিকারণে জানিনা, বৃক্ষটি একসময় অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল; তাহার কোমল মঞ্জরীগুলিন গিয়াছে, পত্রগুলিন গিয়াছে, শাখাগুলিন পর্য্যন্ত গিয়াছে, কেবল অঙ্গারাবশিষ্ট বৃক্ষস্কন্ধ

আর দুইএকটী মূলশাখার অংশমাত্র রহিয়াছে। চারিদিকে ফলে ফুলে শোভিত বিটপী সমূহ সুখে দুলিতেছে। তাহার মধ্যস্থলে এই দগ্ধ তরু বাহু পসারিয়া হা হা করিতেছে। সুখ সমীরণ সকল বৃক্ষের নিকট যাইতেছে, সকলকে ভুলাইতেছে, সকলকে দোলাইতেছে, কেবল এই পোড়া বৃক্ষের নিকট যাইতেছে না। চন্দ্রকিরণ কত সুখের সামগ্রী; সকল তরুকে হাসাইতেছে, আলোকে সকলকে ভাসাইতেছে, কেবল এই পোড়া বৃক্ষকে স্পর্শ করিতেছে না। চারিদিকে বৃক্ষসকল কোমল সুবর্ণে প্লাবিত হইতেছে, কেবল এই হতভাগা বৃক্ষস্কন্ধ যেমন অঙ্গারবর্ণ তেমনই রহিয়াছে—আবার একা রহিয়াছে। অন্য কোন বৃক্ষ ইহার নিকটে নাই। দেখিলাম কেবল একটী লতা দূরহইতে ক্রমে ক্রমে এই হতভাগ্য তরুর মূলপর্য্যন্ত আসিয়াছে। ভাবিলাম লতা স্ত্রীজাতি, তাহা না হইলে কাতরের প্রতি এত দয়া কেন; যাহারে সকলে ত্যাগ করিয়াছে লতা তাহারে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে; লতা সেই অঙ্গারাবশিষ্ট দেহ আপন পল্লবে আচ্ছাদিত করিয়া আবার ফল ফুলে শোভিত করিবে, দগ্ধতরুকে শীতল করিবে, সতত কাছে থাকিবে, কোমল বাহু দ্বারা তাহাকে আপন হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিবে।

তখন আমার কি ভ্রম ছিল! এখন আমি বুঝিয়াছি লতা কেবল ঐ ভাগ্যহীন তরুকে অবলম্বন করিয়া আপন সৌন্দর্য্য বিকাশ করিবে বলিয়া আসিতেছিল, দয়া ভাবে আইসে নাই।

তোমায় যাহা বলিব মনে করিয়া এই পত্রখানি লিখিতে বসিলাম তাহা বলিতে পারিলাম না; বারান্তরে চেষ্টা করিব। ইতি

——

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু কয়েদি এই শেষ পত্রখানি পড়িয়া কিঞ্চিৎ বিমর্শ হইলেন; দুই তিনবার পাঠ করিয়া রাখিয়া দিলেন। বিনোদ ভাবিয়াছিলেন যে যাহা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি তাহা পত্রে প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু শম্ভু ভাবিলেন বিনোদ তাহা সমুদায় প্রকাশ করিয়াছেন।

শম্ভু স্থিরনেত্রে অনেকক্ষণ ভাবিলেন, শেষ আপনাপনি বলিলেন "মনের এ অবস্থা ভাল নহে।"

যে রাত্রে শম্ভু বিনোদের এই পত্র পাঠ করিতেছিলেন, সে রাত্রে বিনোদ ছাদের উপর শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতেছিলেন। অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষ তাঁহার দৃষ্টি চন্দ্রের উপর পড়িল। অনেকক্ষণ চন্দ্র উঠিয়াছে, বিনোদ অনেকবার চন্দ্রের প্রতি চাহিয়াছেন কিন্তু বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই। এইবার চন্দ্রের দিকে চাহিতে চাহিতে মনে হইল যে, এই চন্দ্রকিরণ কতদূর ব্যাপিয়া কত পদার্থের উপর পড়িতেছে; পর্ব্বতে কন্দরে, অরণ্যে, সাগরে—যে পর্ব্বতে কখন কেহ যায় নাই, যে কন্দর আছে কি না কেহ জানে না, যে অরণ্যে মনুষ্য কখন প্রবেশ করে নাই, যে সাগরে মেঘ ভিন্ন অন্যের ছায়া পড়ে নাই—সর্ব্বত্র চন্দ্রকিরণ পড়িতেছে। এই চন্দ্ররশ্মি হিমালয়ের তুষার রাশিতে জ্বলিতেছে; দেবমন্দিরের স্বর্ণচূড়ায় জ্বলিতেছে; শার্দ্দূলের চক্ষে জ্বলিতেছে; হত্যাকারীর অস্ত্র ফলকে জ্বলিতেছে; হতব্যক্তির রক্তধারায় জ্বলিতেছে; আবার কত দুর্ভাগ্যের নয়নাশ্রুতে জ্বলিতেছে।

বিনোদ আবার মনে করিতে লাগিলেন চন্দ্রেরদিকে চাহিতে আমার যে সময় লাগিল এই অল্প সময় মধ্যে পৃথিবীর কত স্থানে

কত সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, চন্দ্র তাহা নিঃশব্দে দেখিলেন। এই মুহূর্ত্তমধ্যে কতস্থানে কত মনুষ্যজীবন জলবুদ্‌বুদের ন্যায় মিলিয়া গেল।

রাত্রের মৃত্যু ভয়ানক, নিঃশব্দে, অন্ধকারে মরণ ভয়ানক। মৃত্যু গৃহে রাত্রে যে আলোক জ্বলে সে আরও ভয়ানক। রাত্রের যম স্বতন্ত্র। তাহার সঙ্গী পাপ। রাত্রের যম মনুষ্য জীবন চুরি করে, পাপ তাহার পরামর্শী।

সিংহ শার্দ্দূলের, হিংসা হত্যার সময় রাত্রি। এই সময় কত পথে কত সর্প পথিকের প্রতীক্ষা করিতেছে; কত গৃহে কত কামিনী বিষপাত্র লইয়া জাগিতেছে। সুন্দর সর্প মুখে ফেণ, কামিনীর কোমল করে বিষপাত্র, অসঙ্গত; অসহ্য। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে ইহা সঙ্গত; সর্প ও যুবতী এক দল, একত্রে পরামর্শ করিয়া পৃথিবীতে অনিষ্টের বীজ বপন করিয়াছিল। বোধ হয় সে পরামর্শ রাত্রে হইয়াছিল। দিবস পুণ্য, রাত্রি পাপ। দিন সুখ, রাত্রি দুঃখ।

রাত্রি শোকের সময়। রাত্রি হতভাগ্যের দিন। আমার মত কত হতভাগ্য এই রাত্রে চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আপন গত অনুশীলন করিতেছে। তাহারা কি আমার মত? আমার মত কি আর আছে? চন্দ্র! তুমি বৃহৎ সূক্ষ্ম সকল দেখিতেছ; নদীকূলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগুলিন জল হইতে কর্দ্দমে উঠিতেছে তুমি তাহাদিগকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছ। তুমি স্বরূপ বল আমার মত হতভাগ্য আর দেখিয়াছ? তুমি অনেক দিনের। সীতাশোকে অধীর শ্রীরামের চক্ষের জল দেখিয়াছ; অভিমন্যু শোকাভিভূত অর্জ্জুনের যন্ত্রণা দেখিয়াছ; নলরাজার উন্মত্ততা দেখিয়াছ, ছোট বড় দেব মানব, কত লোকের পুত্রশোক, পত্নী-শোক দেখিয়াছ। কিন্তু স্বরূপ বল আমার মত শোকের আধার

আর কখন কি দেখিয়াছ? সেই রাত্রের মত মর্ম্মভেদী ভয়ানক কার্য্য আর কখন কি দেখিয়াছিলে? সেই অচিন্তনীয় ব্যাপার কি কেবল আমারই অদৃষ্টে ছিল; আমারই নিমিত্ত কল্পিত হইয়া এত দিন রক্ষিত হইয়াছিল! আমায় এ যন্ত্রণা তাহারা কেন দিলে? আমি তাহাদের কাহারও নিকট ত দোষী নহি। আমার দোষ এই যে, আমি সকলকেই ভালবাসিয়াছি, আন্তরিক ভালবাসিয়াছি। আর এক দোষ আমি ছয় মাস অনুপস্থিত ছিলাম—জেলে গিয়াছিলাম—কিন্তু সে ত আমার দোষ নহে। যাহাই হউক এই ছয় মাসমধ্যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সেই সুন্দরী, সরলা, পতিব্রতা এক্ষণে রাক্ষসী; পূর্ব্বে আমায় কত ভালবাসিত আমিও কত ভাল বাসিতাম, এখন এমন কেন হইল? সেই ত সকল রহিয়াছে। গৃহে সেই আম্রবৃক্ষ, সেই প্রাচীর, সেই দ্বার, সেই সকলই রহিয়াছে। কিন্তু সে আদর, সে গৃহসুখ কোথা গেল!

এই সময়ে হঠাৎ নদীকূলে মৃদু-মধুর সঙ্গীতধ্বনি হইল। বিনোদ ব্যস্ত হইয়া কর্ণপাত করিলেন। সংগীতধ্বনি ক্রমে আকাশ প্লাবিত করিল; বৃক্ষশাখাস্থ পক্ষীরা জাগ্রত হইয়া উঠিল, দুই একটি কোকিল ও পাপীয়া ডাকিতে লাগিল। তাহারা যাহাকেই ডাকুক, ডাকিবার সময় প্রথমে অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে ডাকে; যাহারে ডাকে সে আইসে না; সে শুনেও না; পক্ষীরা আবার ডাকে; ডাকের উপর ডাকে, উচ্চৈঃস্বরে উপর্য্যুপরি ডাকে; প্রাণ ভরে মর্ম্মভেদ করিয়া ডাকে; শেষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আবার ডাকিতে থাকে। প্রথমে, ভগ্নস্বরে, ক্লান্তস্বরে, ধীরে ধীরে ডাকিতে থাকে; ক্রমে আবার তীক্ষ্ণস্বরে ডাকের উপর ডাকে।

বিনোদ যে সংগীত শুনিতে ছিলেন তাহাও সেইরূপ।

প্রথমে ধীরে ধীরে গীত আরম্ভ হইয়া, ক্রমে স্তরে স্তরে উঠিতে লাগিল, মর্ম্মব্যথার সঙ্গে সুর আরও উঠিতে লাগিল। সুরের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বহিতে লাগিল, সুর যেন ব্যাকুল হইয়া চারিদিগ্ ব্যাপিয়া ফেলিল। সুরের সঙ্গে বিনোদের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, এত দিনের পর যেন কে তাঁহার নিমিত্ত কাঁদিল, বিনোদ আপনিও সুরের সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিলেন। গীত থামিল; কিন্তু বিনোদ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিলেন, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। বিনোদের হৃদয় লঘু হইল। অনেক যন্ত্রণা গেল।

আবার গীত আরম্ভ হইল। এবার সুর স্বতন্ত্র; পূর্ব্বরূপ উচ্চ নহে, তীক্ষ্ণ নহে, কেবল অলসময় কিন্তু বড় মধুর, বিনোদের চিত্ত ক্রমে প্রফুল্লোন্মুখ হইয়া আসিল কিন্তু আবার তখনই মুদিত হইয়া গেল, যেন কি তাঁহার মনে আসিতেছিল, আরআসিল না। ক্রমে গীতধ্বনি চন্দ্রালোকে মিলাইয়া গেল।

সেই সুর আবার শুনিবেন বলিয়া বিনোদ ব্যগ্র চিত্তে বসিয়া রহিলেন। সুর আবার অলস ভরে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল, এবার তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রফুল্লিত হইল; পূর্ব্বে যাহা মনে আসিয়া আইসে নাই এবার তাহা মনে আসিল—তাঁহার পূর্ব্ব সুখ—যে সুখে আপনি শৈলের অন্তরে ডুবিয়াছিলেন, শৈলকে আপনার অন্তরে ডুবিয়া রাখিয়াছিলেন সেই সুখপ্রতিমা, আলোকময়, আহ্লাদময়, দেবপ্রতিমার ন্যায় মনে আসিল। বিনোদ ভাবিলেন আমি কত সুখেই ছিলাম; এ সুখ আমার কেন গেল, সেই শৈল কেন এমন হইল, শৈল এরূপ না হইলে ত আমি সেইরূপই সুখে থাকিতাম।

শৈল কি সত্য সত্যই এই কার্য্য করিয়াছিল; সেই রাত্রে আমি যাহা দেখিয়াছি যাহা শুনিয়াছি তাহা কি নিশ্চিত? না, হয় ত আমার ভ্রম। ভ্রম ত লোকের হয়। আমি হয় ত সে রাত্রে অজ্ঞানাবস্থায় অন্য কাহারও বাটীতে গিয়াছিলাম। প্রদীপ হস্তে যে যুবতীকে দেখিয়া শৈল ভাবিয়া ছিলাম সে হয় ত আর কেহ হইবে। শৈল সে সকল অলঙ্কার কোথায় পাইবে, এ কথা আমার তখনই বিবেচনা করা উচিত ছিল। কি আশ্চর্য্য! এই সহজ কথা আমি এত দিন অনুধাবন করিয়া দেখি নাই; অনর্থক এই মর্ম্মভেদিযন্ত্রণায় জ্বলিতেছি।

বালকে কোন সুন্দর পক্ষিশাবক হঠাৎ কুড়াইয়া পাইলে যেমন আহ্লাদে উছলিয়া উঠে, চারিদিগ দেখে আর শাবকটি বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে থাকে, বিনোদ সেইরূপে মনের এই ভাবটি আহ্লাদে অন্তরের ভিতরে লুকাইতে লাগিলেন। 'সে যুবতী শৈল নহে—আর কেহ হইবে' এই কথা গুলিন যেন বিনোদ হঠাৎ কুড়াইয়া পাইলেন এবং বালকের মত সুখে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে টিপিয়া ধরিতে লাগিলেন।

তাহার পর ভাবিতে লাগিলেন "আমার শৈল গৃহে আছে, আমি এখানে কেন রহিয়াছি? ভ্রম, আমার সকলই ভ্রম। যাই, এখনই তাহার নিকট যাইবার উদ্যোগ করি। উদ্যোগ আর কি, কেবল সঙ্গে একজন লোক আবশ্যক; তাহারও ভাবনা নাই।

এই সময় সঙ্গীত সুর ক্রমে মন্দীভূত হইয়া যেন অল্পে অল্পে ঘুমাইয়া পড়িল, আর জাগিল না। বিনোদ অনেক ক্ষণ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন; গীতের আর কোন সম্ভব নাই বুঝিতে পারিয়া শেষ ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিলেন, ভাবিলেন এ মধুর গীত কে গাইল; একবার তাহাকে দেখিয়া আসি, এই মনে করিয়া তাহার অনুসন্ধানে গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যেদিক্ হইতে সংগীতধ্বনি হইয়াছিল বিনোদ একা সেই দিকে গিয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু গায়কের দেখা কোথাও পাইলেন না। একস্থানে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে বোধ হইল এক ব্যক্তি কে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়া আছে,। বিনোদ বৃক্ষেরছায়ায় গিয়া দেখেন সেখানে কেহই নাই, কেবল একস্থানে পত্রাভাবে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছে। অন্ধকারমধ্যে সেই চন্দ্ররশ্মি শ্বেতবসন বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। বিনোদ ভাবিলেন, আমাদের কত সহজেই ভ্রম হয়; বৃক্ষচ্ছায়ায় চন্দ্রকিরণ যদি মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে তবে অজ্ঞানাবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখিয়া আর এক ব্যক্তি বোধ হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? অপরা সুন্দরীকে শৈল বলিয়া বোধ হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিনোদ নদীকূলে দাঁড়াইলেন। সেখানেও কেহই নাই কেবল একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাধা রহিয়াছে; নৌকায় আলোক নাই দুই তিনটী দাঁড়ি মাজি শয়ন করিয়া আছে। নৌকাখানি সমস্ত দিনের পর যেন অবকাশ পাইয়া ক্রীড়া করিতেছে; স্রোতে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, একবার একবার রজ্জু ধরিয়া টানিতেছে আবার অগ্রসর হইয়া কূলের দিগে আসিতেছে। বিনোদ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া বৈঠকখানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একজন পরিচারক জাগ্রত ছিল; তাহাকে বলিলেন এইমাত্র একজন কে গীত গাইতেছিল আমি তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না, তুমি একবার নদীকূলে যাইয়া দেখ নৌকায় কে আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ সেই মধুর গীত গাইয়া ছিল কি না, জানিয়া আইস।

পরিচারক নদীকূলে যাইয়া মাজি মাজি বলিয়া দুই এক বার ডাকিল, কেহ উত্তর দিল না। নাবিকেরা নিদ্রিত মনে করিয়া পরিচারক জলে নামিল। তাহাকে অগ্রসর দেখিয়া নৌকা মধ্য হইতে একটি স্ত্রীলোক মৃদুস্বরে মাজিদিগকে ডাকিতে লাগিল; মাজিরা কেহ উত্তর দিল না। পরিচারক নৌকার নিকটে আসিলে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে?

পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল যে এইমাত্র কে গীত গাই তেছিলে আমার সঙ্গে আইস।

স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল কোথায় যাইব? পরিচারক বলিল গেলেই জানিতে পারিবে। স্ত্রীলোকটি বলিল আমরা যাইব না। পরিচারক উত্তর করিল "না গেলে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।" স্ত্রীলোকটি বলিল "তবে তাহাই ভাল।" পরিচারক দেখিল স্ত্রীলোকটি ভয় পাইল না, তাহাতে তাহার কিঞ্চিৎ অবমাননা বোধ হইল; শেষ রাগান্ধ হইয়া একজন দাঁড়ির বস্ত্রাগ্র ধরিয়া বলিল তোরা চল সকলে, তোদের গ্রেপ্তার করিবার হুকুম হইয়াছে। দাঁড়ি নিদ্রা যায় নাই পরিচারকের কথা বার্ত্তা সকল শুনিয়া ছিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল "আমি গীত গাই নাই আমাকে কেন লইয়া যাইবে যিনি গীত গাইয়া ছিলেন তিনি ঐ বাহির হইতেছেন।" এই সময় নৌকার ভিতর হইতে এক জন স্ত্রীলোক বাহির হইয়া বলিল "আমি গীত গাইয়াছি অতএব আমাকে লইয়া চল।" পরিচারক চন্দ্রালোকে তাহার রূপরাশি দেখিয়া বলিল "আসুন, যিনি আপনার গীত শুনিয়া কাঁদিয়াছেন তিনি একবার আপনাকে দেখিবেন।"

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল তিনি কে? পরিচারক বলিল, "আমি তাহা বিশেষ জানি না। তিনি পীড়িত হইয়া এই

বৈঠকখানায় আসিয়াছেন পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, অদ্যাপি দুর্ব্বল আছেন; এই পর্য্যন্ত আমি জানি। বোধ হয় সম্প্রতি তাঁহার কোন বিপদ ঘটিয়াছিল; তাঁহারে দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে—যেন তাঁহার আর কিছুই নাই আর কেহই নাই; বাস্তবিক আত্মীয় থাকিলে তাঁহারে কেহ না কেহ তত্ত্ব করিতে আসিত। কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ আসে নাই; কেহ একখানা তাঁহাকে পত্র পর্য্যন্ত লেখে নাই। তিনি একা থাকেন, একা বেড়ান, একা ভাবেন; মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন তোমার আর কে আছে? আমি কতবার সে কথার উত্তর দিয়াছি তবু আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। সে যাহাই হউক লোকটি বড় ভদ্র কিন্তু বড় ভীত। একদিন এক স্থানে একটি গোর দেখিয়াছিলেন, দেখিবামাত্র সিহরিয়া উঠিলেন, আর তাঁহার পা উঠিল না। কপাল ঘামিতে লাগিল, আমি সঙ্গে ছিলাম তাহাতেই কোন প্রকারে ফিরে আসিতে পারিয়াছিলেম; কিন্তু সেই অবধি আর সে দিকে যান না। দিনের বেলাই তাঁহার এত ভয় না জানি রাত্র হইলে কি হইত; যিনি নিজে এত ভীত তাঁহার কাছে কোন ভয় নাই; আপনি স্বচ্ছন্দে চলুন। কিন্তু যদি তিনি আপনার সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহেন তবে সময় মত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন; আমি চাকর হইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই; আর কোন পরিচয় না হউক তাঁহার আর কে আছে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেই হইল; আমার বোধ হয় তাঁহার কেহ নাই।"

স্ত্রীলোকটি "বলিল তাঁহারে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার আমার প্রয়োজন নাই; আর এ রাত্রে অপরিচিত পুরুষের নিকট যাওয়া ভাল দেখায় না। যদিও আমি কুলবতী না

হই তথাপি আমি স্ত্রীজাতি, স্ত্রীজাতির সম্মান সকল অবস্থাতেই আছে। তুমি বাবুকে এ কথা বুঝাইয়া বলিলে বাবু আর আমাকে ডাকিবেন না। আমার গীতে তিনি কাঁদিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। আবার তিনি অসুখী, তাঁহার আর কেহ নাই শুনিয়া আরও দেখিতে সাধ হইতেছে কিন্তু আমার যাওয়া ভাল হয় না, অতএব তুমি যাও।"

পরিচারক আর কোন উত্তর না করিয়া ফিরিয়া চলিল। স্ত্রীলোকটি নৌকায় দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ ভাবিল। অনেকক্ষণ পরে এক বৃদ্ধা সঙ্গিনীকে সমভিব্যাহারে করিয়া বিনোদের দ্বারে যাইয়া সারঙ্গরে ঝঙ্কার দ্বারা আপন আগমন বার্ত্তা জানাইল। পরিচারক আসিয়া দ্বার খুলিলে নর্ত্তকী বলিল চল, কোথায় তোমার বাবু আছেন আমাকে দেখাইয়া দিবে চল, এই বলিয়া নর্ত্তকী গৃহপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। পরিচারক বারণ করিল না। স্ত্রীলোকেরা গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিল বিনোদ একটি আলোকের নিকট বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছেন তাঁহার গাত্রে একখানি চাদর রহিয়াছে, নিকটে একটি লাঠী পড়িয়া আছে। বিনোদ সত্যই কোথায় এখনই যাইবেন। স্ত্রীলোকেরা কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া বসিল। বিনোদ মাথা তুলিয়া তাহাদের প্রতি চাহিলেন, পত্রখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন অথচ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

নর্ত্তকী আসিবার সময় বিনোদের আকার এক প্রকার মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া চক্ষে যাহা দেখিল তাহাতে বিস্ময় হইল; বিনোদ যে এত যুবা কি এমত রূপবান্, নর্ত্তকী তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। বিশেষ বিনোদের ম্লানবদন দেখিয়া নর্ত্তকী আরও

আশ্চর্য্য হইল, স্পষ্ট বুঝিতে পারিল এ মালিন্য পীড়াজনিত নহে, এ আর কিছু। পরিচারকের নিকট যাহা শুনিয়াছিল এবং আসিয়া স্বয়ং যেরূপ বিনোদকে অন্যমনস্ক দেখিল তাহাতে স্থির করিল এ শোকের ছায়া, এত অল্প বয়সে এত শোক! কিসের শোক?

এই সময় বিনোদ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরাই কি এইমাত্র গীত গাইতেছিলে? তোমাদের স্বর অতি মধুর আমি আর কখন এরূপ সুর শুনি নাই।

বৃদ্ধা সঙ্গিনী নর্ত্তকীকে দেখাইয়া বলিল ইনিই গাইতেছিলেন। ইনি উত্তম নাচিতেও পারেন।

নর্ত্তকী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া নত মুখে বলিল এ হতভাগিনী এক সময় এই ব্যবসায় শিক্ষিতা হইয়াছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে আমাকে গায়িকা কি নর্ত্তকী বিবেচনা করিবেন না।

বিনোদ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন আমি তোমাদের ডাকি নাই; যদি পরিচারক তোমাদের ডাকিয়া থাকে তবে অন্যায় করিয়াছে। তোমাদের দেখিতে বড় সাধ হইয়াছিল কিন্তু তখন আমার অনুভব হয় নাই যে তোমরা স্ত্রীলোক। এক্ষণে তবে তোমরা নৌকায় যাও; পরিচারক যে তোমাদের কষ্ট দিলে তাহাতে কিছুমাত্র মনে করিও না।

নর্ত্তকী এই কথা শুনিয়া একবার মাথা তুলিয়া বিনোদের প্রতি চাহিল; চাহিয়াই আবার মাথা নত করিল, কিন্তু উঠিল না। বিনোদ ভাবিলেন বোধ হয় ইহারা কিছু অর্থ প্রত্যাশা করে। অতএব বলিলেন আমায় তোমরা যেরূপ সুখী করিয়াছ তাহাতে ইচ্ছা হয় তোমাদের পাথেয় কিছু দিই কিন্তু আমি দীনহীন অন্যের অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইতেছি।

এই কথা সমাপ্ত না করিতে করিতেই নর্ত্তকী বলিল

"মহাশয় ব্যস্ত হইবেন না; আপনার সহস্র মুদ্রা দান করিবার সাধ্য থাকিলেও আমি লইতাম না, আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে এক্ষণে গীত ব্যবসায়ী নহি, মহাশয়ের চাকর আমাকে ডাকিয়াছে বলিয়াই যে আমি আসিয়াছি এমত নহে। আমি এই বাটীতে বালিকাকালে অনেকবার আসিয়াছি। যে সুরের বা রাগিণীর আপনি প্রশংসা করিতেছিলেন তাহা এই ঘরে বসিয়া শিখিয়াছিলাম তাহাই একবার এই ঘর দেখিতে আসিয়াছি। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন এ বাড়ীতে কে থাকিত? নর্ত্তকী উত্তর করিল এ বাড়ীতে তখন কেহ নিরবধি বাস করিতেন না, মধ্যে মধ্যে মহারাজ মহেশচন্দ্র আসিয়া থাকিতেন, আমিও সেই সঙ্গে আসিতাম; আমি তাঁহার নর্ত্তকী ছিলাম। মহারাজ যে অবধি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন সেই অবধি ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছি। আমার আর কেহ নাই; কাজেই অর্থের আমার প্রয়োজন নাই।

বিনোদ বলিলেন মহারাজ মহেশচন্দ্র প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। আমি তাঁহারে কখন দেখি নাই; তাঁহার আকার কিরূপ ছিল।

এই কথা শুনিয়া নর্ত্তকী আপনার গলদেশ হইতে স্বর্ণ মণ্ডিত চিত্র লইয়া বিনোদের নিকট রাখিলেন। বিনোদ তাহা ব্যগ্র চিত্তে দীপের নিকট ধরিলেন। চিত্রিত মূর্ত্তি দেখিবামাত্রেই চমকিয়া উঠিলেন, দীপালোকে চিত্র আবার দেখিলেন, এবার আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমায় কে বলিল এ মূর্ত্তি মহারাজ মহেশচন্দ্রের? মিথ্যা কথা, অসম্ভব!

নর্ত্তকী বলিলেন চিত্র মিথ্যা নহে, আপনার সংশয় মিথ্যা। আমি তাঁহার প্রতিপালিতা, আমার কথা বিশ্বাস করুন।

বিনোদ আর কোন উত্তর না করিয়া শয়ন ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। চিত্র দেখিয়া বিনোদ কেন এত চঞ্চল হইলেন নর্ত্তকী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া রহিল।

দুর্গাপূজা।

আশ্বিন মাসে, মাটিতে প্রতিমা গড়িয়া কি পূজা করি? দুর্গা। কিন্তু দুর্গা কে? এ বিষয়ে নানা মত আছে।

১ম। বেদে দুর্গাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া কথিত আছে। একি জ্ঞানের পূজা?

২য়। বেদের অন্যত্র ইঁহাকে রাত্রিস্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি কি রাত্রি দেবী?

৩য়। ভাদ্রমাসে সিংহ রাশিতে সূর্য্য অবস্থিতি করেন তাহার পরে আশ্বিন মাসে কন্যা রাশিতে গমন করেন। সিংহের পর, অথবা সিংহ পৃষ্ঠে কন্যা। আমরাও পূজা করি সিংহ পৃষ্ঠে কন্যা। আমরা কি নক্ষত্রমাত্র পূজা করি?

৪র্থ। পৌরাণিক মতে ইনি দেবী বিশেষ—হিমাচল কন্যা—শিবের জায়া, এবং গণেশের জননী। এইটি সাধারণগৃহীত মত।

৫ম। সাংখ্যমতে, জগতে প্রকৃতি আর পুরুষ। পুরুষ নিশ্চেষ্ট, প্রকৃতিই জগতের মূল। এই প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি। কেহ কেহ বলেন, ইনি সাংখ্যের সেই প্রকৃতি মাত্র। সেই জন্য ইঁহাকে আদ্যাশক্তি বলিয়া থাকে।

হয়ত সকল মতই মিশাইয়া এই দশভুজা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি কথা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। সঙ্গে

অসুর কেন? ইহা পৌরাণিক মতে সঙ্গত—পুরাণে দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী। কার্ত্তিকেয়, গণেশ, ইহারাও পুত্র। কিন্তু সঙ্গে লক্ষ্মী সুরস্বতী কি জন্য? পৌরাণিক মতানুসারেও দুর্গার সঙ্গে ইঁহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইহাদের পৃথক্ পূজাও হইয়া থাকে। ইহারা এ সঙ্গে কেন?

যাহাই হউক, এ প্রতিমা কখন মিথ্যা বিষয়ের প্রতিমা নহে—তাহাহইলে এতদিন ধরিয়া, এত কোটি লোকে, এত উল্লাসের সহিত কখন ইহা পূজা করিত না। যাহা মনুষ্যহৃদয়ে বদ্ধমূল, তাহা কখন মিথ্যা নহে—বঞ্চনার উপায় মাত্র নহে। বেদ পুরাণ তন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিব না—তাহাতে এ তত্ত্বের অন্ত পাওয়া যায় না। মনুষ্যহৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিব। কি এ? জগৎ শক্তি। সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ম্মকারিণী, সর্ব্বধর্ম্মধারিণী, সর্ব্ব সংহারিণী। সিংহের আজ্ঞাকারিতায় এবং অসুরের নিষ্পীড়নে লোকে সেই অনন্ত শক্তিরই পরিচয় দেখিয়া থাকে। শক্তি হইতে যে বিঘ্ননাশ, এবং শত্রুর নিপাত তাহা গণপতি কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি সূচিত করে। কিন্তু বাঙ্গালি কেবল শক্তিপূজায় সন্তুষ্ট নহে। নিজে শক্তিহীন; কেবল শক্তি মাত্র আরাধ্য হইলে বাঙ্গালির ঘোর দুর্দ্দশা হইত। শক্তি যেমন সর্ব্বলোকপূজ্যা, আর দুইটি বিষয় বাঙ্গালির কাছে প্রায় তেমনি পূজ্য। বাঙ্গালি দর্শন শাস্ত্রে শুনিয়াছে, যে জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স—শক্তিতে নহে। ঐশী শক্তির গুণে, জ্ঞান ব্যতীত, আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি না।

আরও বাঙ্গালি দেখে, যে শক্তিই হউক, আর জ্ঞানই হউক ইহকালের সুখ, দুইয়ের এক হইতেও হয় না। শক্তিশালীও দুঃখ পায় জ্ঞানবান্ও দুঃখ পায়। অতএব ইহলোকের সুখ দুইয়ের একেরও দেয় নহে। সেটি ভাগ্যাধীন। অতএব ভাগ্য একটি পৃথক্ দেবতা। ভাগ্য লক্ষ্মী; জ্ঞান সর-

স্বতী। বাঙ্গালি তিনটিকে একত্রে পূজা করে। এই বাঙ্গালির মহোৎসব।

আমরা এমত বলিতেছি না যে শারদীয়া প্রতিমার আদি এইরূপ। এ কথা সঙ্গত বোধ হয় না। আদি বোধ হয় পুরাণমূলক। এবং পুরাণের কল্পনার আদি সাংখ্য। তবে, লোকে যাহা ভাবিয়া এ পূজার এত অনুরক্ত তাহাই বলিতেছি। এমনও বলি না, যে এই সকল কথাগুলি কাহারও মনোমধ্যে স্পষ্টতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যাহা অস্পষ্ট, অজ্ঞাত, অথচ ভিতরে আছে, তাহাই বুঝাইতেছি।

এমত হইতে পারে, যে এই প্রতিমার আর একটি সূচনা আছে। হিন্দুধর্ম্ম ত্রিতয়তাপূর্ণ। প্রাচীন ত্রিমূর্ত্তি, অগ্নি, বায়ু, এবং সূর্য্য। আধুনিক ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। ঈশ্বরের বা পুরুষের তিনটি গুণ, সত্ত্ব, রজঃ তম। সেইজন্য বঙ্গীয় শক্তিভক্ত, শক্তির ত্রিমূর্ত্তি কল্পনা করিবে। স্থূলচক্ষে যাহারা দেখে, তাহারা সংসারে তিনটি শক্তি দেখে—বল, ঐশ্বর্য্য এবং বিদ্যা,—দুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। শক্তি, ভাগ্য, এবং জ্ঞান। যেদিগে দেখা যায়, সেইদিগে এ পূজা সাধারণ প্রবৃত্তির অনুকারিণী বলিয়াই লোকের ইহাতে এত অনুরাগ দেখা যায়।

প্রভাতে যামিনী।

১

কেন জনমিল এ হতভাগিনী?
হৃদয়জ্বালায় দিবস যামিনী
জ্বলিতে কি সদা করমের ফলে?
ভাসিতে নিয়ত নয়নের জলে?

ছাড়িতে কাতরে দীর্ঘনিশ্বাস?
দশম বরষ বয়স হইতে
দিন গেল বৃথা কাঁদিতে কাঁদিতে;
ফুটিয়া বলিতে মনের বেদনা,
প্রকাশ করিতে মনের বাসনা,
কে আছ যাইব কাহার পাশ?

২

সংসার আলয় সব শূন্যময়;
কোথায় দাঁড়াই? কে দেয় আশ্রয়?
শুনিব না আর প্রণয় বচন,
চুম্বিব না কভু পুত্রের বদন,
ডাকিবে না কেহ কভু মা বলি।
ছাড়ি লোকালয় অঙ্গে মাখি ছাই,
যোগিনী হইয়া বনে চলি যাই,
সেই এক মূর্ত্তি করি গিয়া ধ্যান,
যার সহ আশা করিল প্রস্থান,
পুড়াইয়া ফেলি সুখের কলি।

৩

কেমন অভাগী এ চির দুখিনী,
প্রভাতে আমার হইল যামিনী,
সুখের শৈশব কুঞ্জের ভিতরে,
জীবন উষায়, প্রফুল্ল অন্তরে,
খেলিতে খেলিতে বালিকাদলে,
পাইলাম নব প্রেমময় রবি,
নয়নরঞ্জন মনোহর ছবি।

দেখিতে দেখিতে কাল বিভাবরী
লইল সহসা সে রবিরে হরি,
সংসার ডুবিল তিমির তলে।

৪

এখন রয়েছে গাঁথা এ হৃদয়ে
সে দিনের কথা—যে দিন উভয়ে
মিলিলাম সুখে নয়নে নয়নে।
কতই উৎসব পিতার ভবনে,
কতই আলোক, কতই বাজি।
মধুর হিল্লোলে বাজনা বাজিল,
নর্ত্তকী নাচিল, গায়ক গাইল।
মনোহর বর শোভিল সকাশে,
উঠিলাম নব সুখের আকাশে,
ভাবিলাম স্বর্গ পেলাম আজি।

৫

জানিতাম যদি তখন অন্তরে
সে সুখের স্বর্গ ক দিনের তরে,
পাইতাম যদি দেখিতে স্বপনে
সহসা সৌভাগ্য লুকাবে কেমনে,
তা হলে কি, হায়, উন্মত্ত মত
যেতাম মজিয়া বিবাহের রঙ্গে!
অথবা ভাসিয়া কালের তরঙ্গে
অজ্ঞান আমরা করিতেছি গতি
যেখানে লইতে বিধাতার মতি,
অদৃষ্টের ফল ভুঞ্জিতে রত।

৬

কেন করে, হায়, উৎসব বিবাহে?
আড়ম্বরে লোকে ঢাকিতে কি চাহে
যে সকল দুখ ঘটিবেক পরে?
এ যে সন্ধ্যাসজ্জা অমানিশাভরে,
দ্বিগুণ করিতে তিমির ঘটা।
বকিতেছি আমি যেন পাগলিনী,
বিবাহ সকলে করে না দুখিনী।
কত লোক আছে অবনীমণ্ডলে
বিবাহ করিয়া যারা ভাগ্যবলে
জীবন দেখিছে সুখের ছটা।

৭

না জানি কি পাপে পুড়িল কপাল;
জীবন সর্ব্বস্ব কাড়ি নিল কাল,
করিল আমারে পথের কাঙ্গাল,
ভাঙ্গিল আমার আশার জাঙ্গাল,
পাষাণ হৃদয়ে সহিল সব।
করিলাম পতিরূপ দরশন,
শুনিলাম তাঁর মধুর বচন,
ফুরাল অমনি প্রণয়ের লীলা।
কেন বিধি মোরে এত দুখ দিলা?
জীয়ন্তে আমায় করিলে শব?

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড। কার্ত্তিক ১২৮১। [৭ সংখ্যা।

বঙ্গে দেবপূজা।

দেবমূর্ত্তি বাঙ্গালায় বহুকাল পূজ্য ছিল; এক্ষণে তাহার অন্যথা আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রদায় বিশেষের দেব পূজায় দ্বেষ জন্মিয়াছে; এমন কি যাঁহারা মৎস্য হিংসা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন তাঁহারাও দেবহিংসায় প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার দেবতা প্রায় জড়পদার্থ কাহারও অনিষ্ট করেন না। এমন শান্ত দেবতার উপর রাগ কেন?

বাঙ্গালার দেবতা, মৃণ্ময় হউন, পাষাণময় হউন, নির্জ্জীব হউন আর যাহাই হউন, আমাদের চির উপকারী; বাঙ্গালার সুখ সচ্ছন্দতা, আনন্দ উৎসব, সকল এই দেবমূর্ত্তির প্রসাদাৎ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যাহা কিছু ভাল খাইয়াছেন ভাল পরিয়াছেন তাহা এই দেবপ্রসাদাৎ। কয়েক বৎসর হইল একজন

বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম আহার করিতে করিতে বলিলেন "মহাশয়, শাক অন্ন এত পরিষ্কার আর কখন আমি আহার করি নাই, যাহাই আহার করিতেছি তাহাই উত্তম, তাহাই পবিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে। আর আয়োজন ত অল্প হয় নাই, আমার মত সামান্য ব্যক্তির নিমিত্ত এই নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করায় আমি লজ্জিত হইতেছি।" বিষ্ণুভক্ত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি যাঁহার নিমিত্ত এইসকল প্রস্তুত করিয়াছি তাঁহাকে আমি সামান্য বিবেচনা করি না। যাঁহাকে আমার ঐহিক পারত্রিকের কর্ত্তা বলিয়া জানি, আমি কেবল তাঁহারই নিমিত্ত এইসকল প্রস্তুত করিয়াছি; আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত করি নাই।—ঐ দেবমন্দিরে যে প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছেন তাঁহার নিমিত্ত প্রত্যহ এইরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। মহাশয় ক্ষুণ্ণ হইবেন না, আমরা পৌত্তলিক হই, আর যাহাই হই, আমরা আপনাদিগের মত নিরাকারবাদী অপেক্ষা নিত্য ভাল থাকি, ভাল আহার করি। আপনাদিগের গৃহে যদি কখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসেন তবেই আপনারা ভাল আহারের উদ্যোগ করেন, কিন্তু আমাদের গৃহে দেবতা নিত্য বিরাজমান, আমরা নিত্য উত্তম আয়োজন করি নিত্য উত্তম আহার করিতে পাই। আমাদের পরিবারেরা সর্ব্বদা পবিত্র থাকে; প্রত্যূষে পূজার আয়োজন করিতে হইবে বলিয়া প্রাতঃস্নান করে; দেবতা আহার করিবেন বলিয়া অতি সাবধানে অতি পবিত্রমনে পাক করে; দেবতার পারিচার্য্যে সর্ব্বদা থাকিতে হইলে, দেবতার সঙ্গে এক গৃহে বাস করিতে হইলে কিরূপ পবিত্রস্বভাব হইবার সম্ভাবনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন"

পৌত্তলিক যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। বঙ্গমহিলার পবিত্রতা সম্বন্ধে আমাদের যে অহঙ্কার আছে

পৌত্তলিকতা তাহার একান্ত কারণ না হৌক কতক কারণ হই-লেও হইতে পারে। দেবমন্দিরে বা হিন্দুগৃহে যে সকল মূর্ত্তি দেবমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত আছে তাহাকে নিরাকারবাদীরা কাষ্ঠ বলুন, প্রস্তর বলুন, মৃত্তিকা বলুন, বা অন্য কিছু বলুন কিন্তু হিন্দুমহিলার নিকট সেই সকল মূর্ত্তি দেবমূর্ত্তি: কেবল দেব মূর্ত্তি নহে সাক্ষাৎ দেবতা; স্বয়ং দেবতা! মন্দ কি? প্রকৃত ঈশ্বরের নিকটে থাকায় যে ফল তাহা তাহাদের ফলিতেছে, বিপদে তাহারা দেবতার সাক্ষাৎ পাইতেছে, দেবতাকে সকল কথা জানাইতেছে, যোড় হাত করিতেছে, মিনতি করিতেছে, কাঁদিতেছে। নিরাকারবাদীরা বিপদে ইহা অপেক্ষা কি অধিক সুখ পাইয়া থাকেন?

ক্রোড়স্থ শিশু পীড়িত হইলে হিন্দু মহিলা তৎক্ষণাৎ দেবতার নিকট নালিস করেন; নালিস করিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন। নিরাকারবাদীরাও ঈশ্বরের নিকট এই নালিস করিয়া থাকেন কিন্তু নিরাকারবাদী আর সাকারবাদীর নালিসের মধ্যে প্রভেদ আছে। সাকারবাদীরা দেবতার চাক্ষুষ নালিস করেন এবং সেই জন্য তাঁহাদের নালিস কতক আন্তরিক হইবার সম্ভব। কিন্তু নিরাকারবাদীরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে প্রার্থনা করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা নিতান্ত আন্তরিক হইবার সম্ভব নহে। বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে যদি তাঁহাদের প্রার্থনা একান্তই আন্তরিক হইয়া পড়ে কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অভাবে তাঁহাদের প্রার্থনা দুর্ব্বল না হউক, তাঁহাদের মনে সান্ত্বনা অপেক্ষাকৃত অল্পই জন্মে।

কয়েক বৎসর হইল একটি নব্য বাবু আপনার সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্ম-উপদেশ দিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে বাঙ্গালার সমুদয় আপদ্ বিপদের মূল কারণ পৌত্তলিক ধর্ম্ম। আমরা দুর্ব্বল তাহার হেতু পৌত্তলিক ধর্ম্ম; বাঙ্গালায় মরক

হয়, হেতু—পৌত্তলিক ধর্ম্ম; বাঙ্গালায় ঝড় হয়,—হেতু পৌত্তলিক ধর্ম্ম; আমরা দরিদ্র, হেতু—পৌত্তলিক ধর্ম্ম। অতএব পৌত্তলিক ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত নব্যবাবু শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী তৎকালে আপন শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছিলেন। নব্যবাবু গম্ভীর ভাবে পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি একটি বিশেষ কথা বলিবার নিমিত্ত আসিয়াছি—মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর; বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে; তুমি পুত্তল পূজা ত্যাগ কর, আমাদের ঘরে যে কানাইয়ালাল আছে তাহা দেবতা নহে, পাতর, ভাঙ্গিয়া দেখ কেবল পাতর; কানাইয়ালাল এ পৃথিবীর সৃষ্টি করে নাই, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি নিরাকার।" পতির মুখে এই কথা শুনিয়া যুবতী বলিলেন, "ক্ষান্ত হও এসকল কথা আমার নিকট আর অধিক বলিও না। আমি কানাইয়ালালকে দেবতা বলিয়া জানি; যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া আন্তরিক বিশ্বাস আছে, তাঁহার নিকট যাইতে, তাঁহাকে প্রণাম করিতে, তাঁহার খাবার প্রস্তুত করিতে, কত সুখ হয়! এ সুখে বঞ্চিত কেন করিতে চাও? যাঁহারে দেবতা বলিয়া সংস্কার আছে তিনি স্বয়ং আমাদের ঘরে রহিয়াছেন এই কথা মনে হইলে কত সাহস হয়, কেন এ সাহস নষ্ট করিতে চাও? যাঁহাকে দেবতা মনে করিয়া সেবা করিতেছি, ভক্তি করিতেছি, আমি তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া দুটা কথা জোর করিয়া বলিতে পারি; তুমি তোমার নিরাকার দেবতার নিকট আমার মত জোর করিতে পার? সেদিন যখন আমাদের খোকার পীড়া হইয়াছিল আমি কানাইয়ালালের নিকট গিয়া কাঁদিলাম, খোকার নিমিত্ত আমার যে ভয় হইয়াছিল, তাহা কতক তাহাতে কমিয়া গেল। আমি যদি কানাইয়ালালকে দেবতা বলিয়া না জানিতাম তাহা হইলে আমার দশা তোমার মত হইত। তুমি যেমন নিরাকার ঈশ্বর মনে আনিতে পার না

কেবল আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হা করিয়া থাক আমার দশা ঠিক তাহাই হইত। আমি দেবতা দেখিতে পাই, এই আমার এক সুখ, সে সুখ তোমার নাই। আমি দেবতার সেবা স্বহস্তে করি, সে আমার আর এক সুখ, সে সুখে তুমি বঞ্চিত। আমি দেবতার নিকটে থাকি, এত নিকটে থাকি যে তিনি নিদ্রিত থাকিলেও আমার কান্না শুনিতে পান। নিরাকার ঈশ্বরের ঐরূপ নিকটে আছ বলিয়া কি কখন তোমার বিশ্বাস হয়? নিরাকারের নিকট কিরূপ, তাহা অনুভব করিতে পার?”

সচরাচর নিরাকারবাদী অপেক্ষা যে পৌত্তলিকেরা সুখী, তাহা যুবতীর উপরোক্ত কথা গুলি দ্বারা এক প্রকার প্রতীতি হইতে পারে। তাহা হইলে পৌত্তলিক ধর্ম্ম উঠাইয়া লাভ কি? মনুষ্যের সেই সুখ কমাইবার নিমিত্ত কি পৌত্তলিকতা লোপ করিতে চাও। আমাদের দেবতারা উপকারী ব্যতীত অপকারী নহেন। তারকেশ্বর এবং বৈদ্যনাথ রোগ ভাল করেন সে ত আমাদের অলাভ নহে। তুমি বলিবে দেবতাকর্ত্তৃক রোগ ভাল হয় না, আমাদের বিশ্বাসই আরোগ্যের মূলকারণ। ক্ষতি কি? এ বিশ্বাস ত মন্দ নহে, যে বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের এত মঙ্গল হইতেছে, তাহার মূলচ্ছেদ করিবার জন্য তোমার এত যত্ন কেন?

তাহাই বলিতেছিলাম, হিন্দুর দেবতা কাষ্ঠ হউন প্রস্তর হউন, আমাদের উপকারী। তাঁহাদের অন্ন মারিয়া দেশের কি ইষ্ট সাধন হইবে। সাকার দেবতা তাড়াইলে যে সুখহানি হইবে তাহা কি দিয়া পূরণ করিবে? নিরাকার ঈশ্বর সাধারণের অনুমেয় নহে; আপামর সাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না; গ্রহণ করিতে পারিলেও তাহাতে কি বিশেষ উপকার হইবে, বাঙ্গালির কি অধিক সুখ বাড়িবে? পৌত্তলিকতা অবস্থায় সে সকল

সুখই ত আছে। তুমি বলিবে "প্রকৃত ঈশ্বর পূজা করিতেছি বলিয়া সুখ হইবে।" কিন্তু সে সুখ ত এখনও আছে, আমাদের দেবতাকে প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়াইত জানি। তবে নূতন কি পাইলাম? তুমি বলিবে "আর কিছু না পাও প্রকৃত ঈশ্বরের দয়া পাইবে, পুতুল পূজা করিলে সে দয়া পাইবে না, তাঁহার রাগ হইবে।" তদুত্তরে বলি, তুমি আপনার প্রবৃত্তি ঈশ্বরে আরোপ করিতেছ, তুমি নিরাকার ঈশ্বর বুঝিতে পার নাই, তুমি পৌত্তলিক।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক; কোন্ ধর্ম্ম সত্য কোন্ ধর্ম্ম মিথ্যা তাহার বিচার করিবার আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তাহা মনুষ্যের সাধ্যও নহে। আমরা কেবল আমাদের হিন্দুদেবতার ওকালতি করিতেছিলাম। তাঁহারা নিরপরাধী, তাঁহাদের উপর অত্যাচার কেন? যদি তাঁহাদের কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা জ্ঞানকৃত নহে। তাঁহাদের ত্যাগ করিও না। নির্জীব বাঙ্গালা আরও নির্জীব হইয়া পড়িবে। বৎসরান্তে দুর্গোৎসবের সময় বাঙ্গালা একবার করিয়া জাগ্রত হয়; নূতন বস্ত্র পরে, হাসে, বাজায়, গীত গায়, নৃত্য করে; শত্রুর সঙ্গে কোলাকোলি করে; শোক, দুঃখ, রাগ সকল ত্যাগ করে। এ উৎসব কেন অন্তর্হিত করিবে? কিসে তোমার এ উৎসব অসহ্য হইয়াছে? তুমি বলিবে এ উৎসবের পরিবর্ত্তে আর এক উৎসব দিব। জিজ্ঞাসা করি, সে কি উৎসব? সামাজিক উৎসব? অপর সাধারণ সকলেই কি তাহা গ্রহণ করিবে? সকলেই কি তাহাতে আন্তরিক মাতিয়া উঠিবে? এক সময় ফরাসিদিগের দেশে একটি সামাজিক উৎসব স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অপর সাধারণ সকলেই তাহা গ্রহণ করে নাই; প্রথমে যাঁহারা তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা কমিয়া আসিতে লাগিল। অদ্যাপি যাঁ-

হারা সেই সামাজিক উৎসব অবলম্বন করিয়া আছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই নাস্তিক। তাঁহাদের কোন ধর্ম্মোৎসব নাই বলিয়াই তাঁহারা ঐ সামাজিক উৎসব অবলম্বন করিয়া আছেন।

আর আমাদের দেশে কি সামাজিক কার্য্য হইয়াছে যে তদুপলক্ষে সকলে উৎসব করিবে? ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহার প্রত্যাশায় উপস্থিত উৎসব কেন ত্যাগ কর?

আমাদের দেবপূজা কেবল পারমার্থিক নহে, ঐহিকের অনেক মঙ্গল এই দেবপূজা দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে। সামাজিক যাহা কিছু আমরা করিয়া থাকি তাহা প্রায় দেবপূজা উপলক্ষে করিয়া থাকি। বঙ্গসমাজ এবং বঙ্গীয়দেবপূজা একসূত্রে গ্রথিত, একটি নষ্ট করিলে অপরটি নষ্ট হইবে। যাঁহারা বিশেষ সমাজতত্ত্বজ্ঞ বোধ হয় তাঁহারাই কেবল ইহা স্পষ্ট দেখিতে পান। অন্য দেশের সমাজ অন্য প্রকারে গঠিত। বঙ্গসমাজ বঙ্গীয়ধর্ম্মের উপর গঠিত। পূর্ব্বে সমাজকর্ত্তারা অন্যায় করিয়া থাকিবেন কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতে গেলে সমাজ ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। সমাজ গড়িতে পারে আমাদের মধ্যে এরূপ বিশ্বকর্ম্মা নাই। কেন তবে এখনই সমাজ ভাঙ্গিয়া বসি। সমাজ রক্ষা কর; আমাদের উৎসব রক্ষা কর।

দোল দুর্গোৎসব বন্ধ করিলে বাঙ্গালায় যে কেবল আনন্দ কমিবে এমত নহে সঙ্গে সঙ্গে অন্নদান, অর্থদান কমিবে। অন্য দেশের দীনদরিদ্র অপেক্ষা বঙ্গে দরিদ্র যে অবাধে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহা অধিকাংশ পৌত্তলিক দেবতার প্রসাদাৎ। এমন দেবতা তাড়াইয়া কেন সেই অভাগ্যদিগের ক্ষতি করিবে।

আর এক কথা আছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে কয়েকটী গুণের নিমিত্ত বাঙ্গালা বিখ্যাত, তাহা এই দেবতাদিগের প্রসাদাৎ। বাঙ্গালির যেরূপ মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি সেরূপ

আর কোন দেশে নাই। দেবতাদিগকে আশৈশব পূজা করিয়া আমাদের ভক্তি অভ্যাস হইয়া থাকে। নিরাকারবাদীদিগের আশৈশব এ অভ্যাস হইতে পারে না। শৈশবে নিরাকার অনুভব হয় না। হিন্দুদিগের মধ্যে শৈশবেই ভক্তি অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপ বাল্যকালাবধি চালনায় পুষ্ট এবং বলবান্ হয়, মনোবৃত্তিও চালনাদ্বারা সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ভক্তি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। এইজন্য আমরা এত ভক্ত এত প্রণয়ী। এক্ষণে যে যে পরিবারের মধ্যে দেবভক্তি উঠিয়া গিয়াছে, প্রায় দেখা যায় সেই সকল পরিবারের মধ্যে পিতৃ মাতৃ ভক্তি কমিয়াগিয়াছে।

পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম প্রাচীন। হিন্দু ধর্ম্ম যে এতদীর্ঘজীবী হইয়াছে, তাহার মূল কারণ আমাদের এই ঠাকুর দেবতা। এই দেবতাতে অবশ্য কিছু মাহাত্ম্য আছে বলিতে হইবে। অসার হইলে এতদিন থাকিত না।

হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ভারতবর্ষের সকল অঞ্চল যে ব্যাপিয়াছে, তাহাও এই ঠাকুর দেবতার গুণ। অনার্য্যেরা যে ক্রমে হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহার কারণই এই। অনেকের বিশ্বাস আছে, অন্য ধর্ম্মাক্রান্তেরা কখন হিন্দু হয় নাই কিন্তু তাহা নহে। ভারতবর্ষের যাবতীয় ইতর জাতিরা পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন, ধর্ম্মের জীবন। যে ধর্ম্মে দেবতা প্রত্যক্ষ দর্শন পাওয়া যায় না অর্থাৎ যে ধর্ম্মের দেবতা সাকার নহে। সে ধর্ম্মের জীবন অল্প।

শ্রীঃ

কণ্ঠমালা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বপরিচ্ছদলিখিত নর্ত্তকীকে শৈল বলিয়া অনেকের ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে বোধ হয় সে ভ্রম গিয়াছে। শৈল অপেক্ষা নর্ত্তকী প্রায় সাত আট বৎসর বয়োধিকা: তদ্ভিন্ন, শৈল ক্ষীণাঙ্গী, নর্ত্তকী ঈষৎ স্থূলাঙ্গী। শৈলকে কখন হাসিতে দেখা যাইত না; নর্ত্তকী কখন হাসি ছাড়া থাকিত না। নর্ত্তকী কখন উচ্চ হাসি হাসিত না অথচ সতত হাসিত; মিষ্ট কথায় বক্তার মুখপ্রতি চাহিয়া হাসিত; রুষ্ট কথায়ও হাসিত কিন্তু সে সময় নিকটস্থ শ্রোতাদিগের মুখ প্রতি চাহিয়া হাসিত। আবার যখন অপ্রতিভ কি লজ্জিত হইয়া হাসিত তখন মৃত্তিকার প্রতি চাহিয়া হাসিত। নর্ত্তকীর অপ্রতিভের হাসি আর তাহার দুঃখের কান্না প্রায় একইরূপ দেখাইত; হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে সহজে তাহা বুঝা যাইত না, অনেকে বলিত, ওষ্ঠের গঠনের নিমিত্ত তাহার ক্রন্দনেও হাসি বোধ হইত।

আবার কথায় কথায় তাহার মুখ আরক্ত হইত; তৎসঙ্গে নিম্নদৃষ্টি, নাসাগ্রে ঘর্ম্ম, ওষ্ঠকম্প দেখা যাইত। শৈলের এসকল কিছুই ছিল না।

শৈলের দৃষ্টি সর্ব্বদাই তীব্র বোধ হইত; আবার তাহার প্রতি কেহ চাহিলে সেই তীব্রতা আরও বাড়িত। নর্ত্তকীর নয়ন স্বভাবতঃ ভীত। কেহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নয়নপল্লব নামিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষুদিগকে আচ্ছাদিত করিত।

নর্ত্তকীকে কেহ কখন নৃত্য করিতে দেখে নাই। যে বৃদ্ধা পরিচারিকা বিনোদের সাক্ষাতে বলিয়াছিল যে ইনি

নাচিতেও পারেন, সে পরিচারিকাও কখন তাহাকে নৃত্য করিতে দেখে নাই। মহারাজ মহেশচন্দ্রের সংসারে এই রূপবতী আশৈশব নর্ত্তকী বলিয়া প্রতিপালিত এইজন্য সকলেই তাহাকে নর্ত্তকী বলিয়া জানিত।

কথিত আছে মহারাজ স্বয়ং নৃত্য ভালবাসিতেন না, অন্য কেহ নৃত্যের প্রশংসা করিলে তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেন। তাঁহার গৃহে কখন নাচের "মজলিস" হইত না। গীত শুনিতে তিনি আন্তরিক ভালবাসিতেন কিন্তু কখন গায়ককে সম্মুখে বসাইয়া গীত শুনিতে পারিতেন না। গায়কেরা স্বতন্ত্র স্থানে বসিয়া গাইত আপনিও স্বতন্ত্র স্থানে একা থাকিয়া গীত শুনিতেন। সে সময় তাঁহার পরমাত্মীয়গণেরাও নিকটে যাইত না; অনবধানতা প্রযুক্ত কেহ গেলে তিনি সিংহের ন্যায় মাথা তুলিতেন, অন্যপ্রকারে বৈরক্তি প্রকাশ করিতেন না; আর কিছু বলিতেনও না। এদেশীয় সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে কোন গায়ক তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইতে পারিত না। অথচ তিনি কখন এই দেশী রাগ রাগিণী শুনিতেন না। তিনি যাহা শুনিতেন তাহার কোনটির নাম "শোক" কোনটির নাম "সুখ" ইত্যাদি। নর্ত্তকীর প্রথম যে সুরে বিনোদ কাঁদিয়াছিলেন তাহার নাম "শোক" দ্বিতীয় সুরটির নাম "সুখ।" এই সকল রসাত্মক সুর একজন ব্রহ্মচারী নর্ত্তকীদিগকে শিখাইতেন।

মহারাজের নর্ত্তকী অনেক ছিল। তাহারা সকলে মাসিক বেতন ও মধ্যে মধ্যে উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণখচিত বস্ত্র এবং তদুপযোগী অলঙ্কার পাইত। কিন্তু যে নর্ত্তকীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে সে কখন বস্ত্র অলঙ্কার লইত না। এই সকল মনোহর দ্রব্যের প্রতি তাহার এক প্রকার ভয় ছিল।

নর্ত্তকীর প্রথম যৌবনকালে একবার তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা তাহাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইয়াছিল। কিন্তু অলঙ্কার পরিয়া নর্ত্তকী আর মাথা তুলিল না বরং বিন্দু বিন্দু ঘামিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাহার আত্মীয়েরা অলঙ্কার খুলিয়া লইল। তখন হাসি হাসি মুখে নর্ত্তকী একজনের কর্ণে বলিয়াছিল যে "অলঙ্কার পরিলে আমার মনে হয় যেন সকলেই আমার দিকে চাহিতেছে।" কিন্তু এ কথা প্রথমাবস্থার। এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছিল।

মহারাজ মহেশচন্দ্রের পট দেখিয়া বিনোদ কক্ষান্তরে গেলে নর্ত্তকী ক্ষণকাল বসিয়া রহিল, তাহার পর মাথা তুলিয়া চারি দিক্ দেখিতে দেখিতে একখানি গৃহচিত্রের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ভাবিল এখানি নূতন, পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই, অতএব বিশেষ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত নর্ত্তকী উঠিল, বাম হস্তে প্রদীপ লইয়া ঈষৎ তাহা উদ্দীপন করিল, তাহার পর চিত্রের নিকট যাইয়া মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিল। সেই উদ্দীপ্ত দীপালোকে নর্ত্তকীর উন্নত মুখমণ্ডলী আর একখানি চিত্রিত পট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সে মুখের তাৎকালিক সুখ মাধুরি পটে অঙ্কিত করা চিত্রকরের অসাধ্য।

নর্ত্তকী যে পটখানি একাগ্র হইয়া দেখিতে ছিল তাহাতে চিত্রকরের বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ থাকিলে থাকিতে পারে কিন্তু চিত্রিত বিষয় অতি সামান্য। একটি জলাশয়ে কেবল গুটিকতক হংস বিচরণ করিতেছে। এই সামান্য বিষয়ে চিত্রকর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে। পটের ঊর্দ্ধভাগে আকাশ চিত্রিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলিন স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া সূর্য্য দেখিতেছে। পটে সূর্য্য চিত্রিত হয় নাই কিন্তু পশ্চিমদিকের আকাশে সূর্য্যালোক মৃদু অথচ স্পষ্ট রহি-

য়াছে। আকাশের অন্য দিকে সে আলোক নাই ক্রমে মিলাইয়া গিয়াছে। কেবল এই চিত্রিত আকাশ দেখিলেই বোধ হয় অপরাহ্ন উপস্থিত এবং তাহা শরৎকালের অপরাহ্ন। তাহার পর চিত্রিত জলাশয় ও তাহার পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি দেখিলে শারদীয় অপরাহ্ন আরও স্পষ্ট জানা যায়। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষাগ্রে মলিন স্বর্ণ আভা লাগিয়াছে, তাহা এত মলিন যে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইতেছে। বর্ষা ফুরাইয়াছে, জলাশয়টী পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বর্ষার লতাগুলিন তীরস্থ শাখা হইতে ঝুলিতেছে, তাহার পুষ্পগুলিন গভীর, স্থির, কাল জলে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। জলে অপরাহ্নের ছায়া পড়িয়াছে, সকল স্তব্ধ, স্থির, গম্ভীর। এই সময় একটি রাজহংস গ্রীবা বাঁকাইয়া মাথা ফিরাইয়া তরঙ্গ তুলিয়া যাইতেছে, কাল জলে তাহার অমল শ্বেত পক্ষ আরও অমল দেখাইতেছে। আর ছুইটী রাজহংস পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া স্থির জলে স্থির হইয়া রহিয়াছে, যেন তাহারা কি ভাবিতেছে। আর এক স্থানে আর একটি রাজহংস ডুবিয়া উঠিয়াছে, মাথার জলকণা শত শত অমল মুক্তাকারে পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে হংস আবার ডুবিবে বলিয়া মাথা নামাইতেছে।

পটের নিম্নে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে একটি পুরাতন গীতের এই অংশটি লিখিত আছে। যথা———

"শ্যাম সায়রে আমি হংসী ছিলাম,
ডুবিতাম, উঠিতাম, ভেসে যেতাম,
কত উলটি পালট ভেসে যেতাম,"

নর্ত্তকী শেষ এই গীতাংশ পড়িয়া চক্ষের জল মুছিল, দীপাধারে প্রদীপ রাখিয়া, ধীরে ধীরে আসনে আসিয়া বসিল, ক্রমে উপাধানের উপর মস্তক নত করিয়া অতি মৃদুস্বরে গীতটি

গায়িতে লাগিল। গীতটির প্রথম কথা "সুখময় সায়র" এই অংশ গায়িতে গায়িতে নর্ত্তকী একবার আপনা আপনি বলিল "সুখময় সাগরই বটে," আবার পূর্ব্বমত গায়িতে লাগিল। পার্শ্বস্থ কক্ষে বিনোদ আছেন একথা নর্ত্তকী গায়িতে গায়িতে ভুলিয়া গেল, উন্মত্তা হইয়া গায়িতে লাগিল। বিনোদ নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া পুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে নর্ত্তকীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। গীত শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ গীত তুমি কোথায় পাইলে?" নর্ত্তকী কেবল অঙ্গুলি দ্বারা পট দেখাইয়া দিল। বিনোদ পটের দিগে যাইতেছেন দেখিয়া নর্ত্তকী উঠিয়া প্রদীপ হস্তে সঙ্গে সঙ্গে গেল। আলোক বাড়াইবার নিমিত্ত নর্ত্তকী পটের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইবা মাত্র তাহার অঙ্গের মাধুর্য্য সৌগন্ধ বিনোদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বিনোদ ভাবিলেন "এ যে আমার শৈলের অঙ্গসৌরভ।" বিনোদ অমনি নর্ত্তকীর দিকে মাথা ফিরাইলেন; সৌরভ তাঁহাকে আরও মোহিত করিল; মোহিত হইয়া তিনি নর্ত্তকীর কৃষ্ণ কেশ দেখিতে লাগিলেন। নর্ত্তকী এসকল কিছুই জানিতে পারিল না স্থির ভাবে প্রদীপ ধরিয়া পট দেখিতেছিল, মনে করিয়াছিল বিনোদও পট দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিনোদ বলিলেন "তোমার অঙ্গের কি আশ্চর্য্য সদ্গন্ধ?" অমনি নর্ত্তকীর হস্ত হইতে প্রদীপ পড়িয়া গেল ঘর অন্ধকার হইল। বিনোদ পরিচারককে ডাকিয়া আলোক আনাইয়া দেখেন নর্ত্তকী চলিয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলেন কেন সে প্রদীপ ফেলিয়া চলিয়া গেল তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি; কিন্তু সৌরভে শৈলকে মনে পড়িয়াছিল অন্তরে তাহার চিত্র দেখিতে দেখিতে শয়ন ঘরে গেলেন, অতি অল্প

ক্ষণ মধ্যেই নিদ্রা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সে রাত্রে তাঁহার আর নূরপুরে যাওয়া হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে বিনোদের হৃদয় আহ্লাদে পরিয়া আসিতে লাগিল। সপ্তমীর প্রাতে বাদ্যো- দ্যমের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বালক যেমন "আজ দুর্গোৎ- সব" বলিয়া আহ্লাদে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে, বি- নোদ সেইরূপ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। অদ্য নূর- পুরে যাইবেন, তাঁহার প্রতিমাকে দেখিবেন, অদ্য তাঁহার দু- র্গোৎসব। ত্বরাত্বরি পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিয়া বাহির হই- লেন। একবার পরিচারককে বলিলেন "আমি চলিলাম পরে সংবাদ পাঠাইব।" পরিচারক অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাটী হইতে বাহির হইয়া দেখেন সম্মুখস্থ উপবনে নর্ত্তকী কতকগুলিন লতা পুষ্প হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয় নর্ত্তকী যেন আর কি খুঁজিয়াছিল পায় নাই। বিনোদ ভাবিলেন, আমি যে চলিলাম তাহা একবার উহাকে বলিয়া যাই। অনেক দিনের পরে গত রাত্রে আমি যে সুখী হইয়াছিলাম তাহা কেবল এই নর্ত্তকীর কণ্ঠগুণে, সুরের অসাধ্য কিছুই নাই আমার মত অভাগ্যেরও ভাগ্য ফিরা- ইতে পারে।

বিনোদকে অগ্রসর দেখিয়া নর্ত্তকী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া নৌকাভিমুখে যাইতে লাগিল। কিন্তু উপবন অতিক্রম না ক- রিতে করিতেই বিনোদ তাহার নিকট আসিলেন। তখন ন- র্ত্তকী উপায়ান্তর না দেখিয়া নতমুখে ঈষৎ হাসিতে হাসিতে

একটি মাধবীলতার নবপত্র কোমল অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ বলিলেন "তুমি যাও নাই? আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি রাত্রেই নৌকা ভাসাইয়াছ।" নর্ত্তকী আরও লজ্জিতা হইল। বিনোদ তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কখন যাইবে?"

নর্ত্ত। এখনই যাইব।

বি। আমিও চলিলাম।

ন। কোথায়?

বি। নুরপুরে, সেখানে আমার বাস।

ন। তাহা আমি জানি।

বি। তুমি নুরপুরে কখন গিয়াছিলে? শৈলকে চেন?

ন। চিনি, তিনি আমাদের রাজকুমারী।

বি। রাজকুমারী!—

ন। মহারাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা।

বি। সে কি! তুমি অন্য কোন শৈলের কথা বলিতেছ।

ন। আমি আপনার শৈলকে মনে করিয়াই বলিতেছি। আমি তাঁহাকে তাঁহার শৈশবাবস্থা অবধি জানি।

বি। আমার শৈল রাঘব রামের কন্যা।

ন। রাঘব রামের পালিতা কন্যা।

বি। রাজার কন্যা দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা কি? মহারাজ মহেশচন্দ্রের কিসের অভাব ছিল যে তিনি অন্নের নিমিত্ত দরিদ্রের ঘরে আপনার কন্যা পাঠাইবেন; যদি তাহা হইত তবে সে কথা অবশ্য শৈল জানিত। শৈল দরিদ্র কন্যা, আমিও দরিদ্র এই জন্য বুঝি তুমি আমাদের উপহাস করিতেছ। তুমি স্ত্রীলোক না হইলে আমি এ উপহাসে রাগ করিতাম।

ন। মহাশয় দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিবেন; আমি প্রায় সাতাশবৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছি এপর্য্যন্ত কাহারেও কখন উপহাস করি নাই, আমাকেও কেহ উপহাস করে নাই, উপহাস আমি বুঝিতেও পারি না। শৈলসম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়াছি তাহা সত্য, চলুন ঐ মন্দিরে চলুন, আমি এখনই মহাশয়কে তাহার কতক প্রমাণ দিতে পারিব।

এই বলিয়া নর্ত্তকী নিকটস্থ একটি মন্দিরের দিগে যাইতে লাগিল; বিনোদও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নর্ত্তকী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হর্ম্ম্যতলে প্রস্তরখোদিত এই কয়েকটী কথা দেখাইল।

মহারাজ মহেশচন্দ্রস্য

প্রথমাত্মজায়াঃ শৈলকুমার্য্যা

জন্মাহে

শৈলেশ্বরস্য

মন্দিরমিদং স্থাপিতং।

বিনোদ ইহা পড়িয়া বলিলেন "মহারাজ মহেশচন্দ্রের প্রথম কন্যার নাম যে শৈলকুমারী তাহাই ইহাতে লিখিত আছে। কিন্তু সেই শৈলকুমারী যে আমার পত্নী তাহা ইহা দ্বারা ত প্রমাণ হইল না।"

নর্ত্তকী বলিল "তাহা প্রমাণ হইল না সত্য, কিন্তু আসুন আর এক প্রমাণ দিতেছি।" এই বলিয়া বিনোদকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানা বাড়ীর শয়নঘরে প্রবেশ করিল। তথায় উত্তরদিগের একটি রুদ্ধ দ্বারের চাবি খুলিল। চাবিটি দ্বারের অপর একটি স্থানে অলক্ষ্যে লগ্ন ছিল; দ্বার খুলিবামাত্র বিনোদ দেখিলেন যে একটি বালিকার প্রতিমূর্ত্তি একখানি

পটে চিত্রিত রহিয়াছে। নর্ত্তকী জিজ্ঞাসা করিল "কেমন এই প্রতিমূর্ত্তি চিনিতে পারেন ?"

বিনোদ বলিলেন যে "না আমি চিনিতে পারিলাম না, শৈলের সঙ্গে কোন বিশেষ সাদৃশ্য ত দৃষ্টি হয় না, তবে ওষ্ঠ আর যুগ্ম ভ্রূ উভয়ের এক প্রকার কতক বোধ হয়।"

নর্ত্তকী বলিল "বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখুন, তিন বৎসর বয়সে আর উনিশ বৎসর বয়সে মনুষ্যের আকৃতি অবয়ব একই প্রকার থাকে না, যে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিবেন এই আপনার শৈলের বাল্যমূর্ত্তি।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজকুমারী রাঘবরামের কেন প্রতিপালিতা হইলেন ?"

নর্ত্তকী উত্তর করিল "সে অনেক কথা। হঠাৎ মহারাজের মৃত্যু হওয়ায় মহারাণী বিবাগী হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যান। সঙ্গে সামান্য দুই চারিজন পরিচারক ছিল; দস্যুরা কি ◌গতিকে জানিতে পারিয়া পথে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। সঙ্গের লোকগুলিনের মধ্যে কতক হত হয়, কতক পলায়ন করে। শেষ মহারাণী একা পদব্রজে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথিমধ্যে সাংঘাতিক পীড়িতা হইয়া জামতলী গ্রামে প্রাণত্যাগ করেন। মরিবার সময় একটি গৃহস্থকে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়া যান। কন্যাটির বয়স তখন তিন বৎসর সম্পূর্ণ হয় নাই। গৃহস্থকন্যাটি রাঘব রামের প্রথমা স্ত্রী। রাঘব রামের অনেক বিবাহ ছিল, তাহা বোধ হয় আপনি ভাল জানেন। কোথায় তাঁহার কয়টি সন্তান আছে তাহা তাঁহার গ্রামের লোকেরা জানিত না। এক দিবস তিনি শৈলকে ক্রোড়ে করিয়া আপন বাটীতে আনিয়া বলিলেন 'আমার জামতলীর প্রথমা স্ত্রী

সম্প্রতি গত হইয়াছেন; তিনি এই কন্যাটি রাখিয়া গিয়াছেন।' সকলেই সেই কথা বিশ্বাস করিল। সেই অবধি শৈল রাঘব রামের কন্যা বলিয়া পরিচিতা হইলেন। শৈলও জানিতেন যে তাঁহার গর্ভধারিণী গত হইয়াছেন, রাঘবরামের গৃহিণীকে তিনি বিমাতা বলিয়া জানিতেন। রাঘবরাম নিজেও জানিতেন না যে শৈল রাজা মহেশ চন্দ্রের কন্যা। তিনি কেবল এই মাত্র জানিতেন যে শৈল ভদ্রবংশজাত ব্রাহ্মণ কন্যা।"

বিনোদ বলিলেন "এ পরিচয়ে আমার সংশয় দূর হইল না। যিনি জামতলীর গৃহস্থকে কন্যা সমর্পণ করিয়া যান তিনি যে মহেশচন্দ্রের রাজমহিষী তাহা কি রূপে প্রতিপন্ন হইলেন।"

নর্ত্তকী বলিল "গৃহস্থকন্যাকে রাজমহিষী একটি স্বর্ণ কৌটা সমর্পণ করেন; তাহাতে এই কথাটি লিখিত ছিল, 'মহারাজ মহেশ চন্দ্রের কন্যা শৈলকে যিনি প্রতিপালন করিবেন তিনিই এই কৌটার সমস্ত রত্নাদিতে অধিকারী হইবেন।' রাঘব রামের শ্বশুর স্বর্ণ কৌটাটি আপনি রাখিয়াছিলেন।' তিনি তাহা খুলিতে না পারিয়া সম্প্রতি এক স্বর্ণকারের নিকট খুলিতে আনিয়া সকল জানিতে পারিয়াছেন। আর উহা যে রাজমহিষীর হস্তাক্ষর তাহা মহারাজের কর্ম্মচারীরা চিনিয়াছেন।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজের কর্ম্মচারী কে?" নর্ত্তকী বলিল "যিনিই হউন তাঁহার সহিত আপনার শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। সময় হইলে তিনি আপনিই আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। তাহার কারণ আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না, আমি তাহা বলিতেও পারিব না। শৈল যে রাজকুমারী তদ্বিষয়ে আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না।"

বিনোদ বলিলেন "হইতেও পারে—অসম্ভব কি—রাজ-

কুমারী না হইলে সেরূপ হংসগতি, সেরূপ দুলিয়া দুলিয়া চলন, কোন সামান্য গৃহস্থকন্যার সম্ভব নহে। সে ভ্রূকুটী, সে কটাক্ষ, কি আর কাহার হইতে পারে? শৈল নিশ্চয়ই রাজকুমারী—আমার শৈল রাজকুমারী—আমি ত রাজকুমারীর যত্ন জানি না—আমি দরিদ্র, সে রত্নের আদর জানি না—কতবার হয় ত শৈল আমাকে অসভ্য রূঢ় ভাবিয়াছে। এই বার আমি সকল শোধ করিব। আমি তবে চলিলাম।"

নর্ত্তকী অতি কাতর অন্তরে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। শেষ বিনোদকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাইতেছেন?"

বি। নুরপুর যাইতেছি—শৈলের নিকট যাইতেছি।

ন। নুরপুরে শৈলের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

বি। কেন?

ন। রাজকুমারী সেখানে নাই।

বি। শৈল তবে কোথা?

ন। আপনি তাহা বোধ হয় আমার অপেক্ষা অধিক জানেন।

বি। কৈ আমি ত কিছুই জানি না—আমার সহিত তাঁহার অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই। যে দিবস আমি জেলে যাই সেই দিবস প্রাতে দেখা হইয়াছিল। কিন্তু তখন শৈল কি করিতেছিলেন বা সে প্রাতে কোন সময় দেখা হইয়াছিল তাহা কিছুই আমার স্মরণ হয় না। সেই দিন অবধি আর দেখা হয় নাই।

ন। আর এক দিন দেখা হইয়াছিল।

বি। কবে?

ন। যে দিন আপনি জেলখানা হইতে আইসেন।

বিনোদ ঈষৎ কাঁপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায়?"

ন। মহাশয়ের বাটীতে।

বিনোদ ধীরে ধীরে অতি কষ্টে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "সেই রাত্রে?"

ন। সেই রাত্রে।

বিনোদ ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি সে রাত্রের ঘটনা সত্য?"

নর্ত্তকী মস্তক নত করিয়া রহিল, আর কোন উত্তর করিল না।

বিনোদ মর্ম্মজ্বালায় ছুটিলেন; একবার মস্তক ফিরাইয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে নর্ত্তকীর প্রতি চাহিয়া "পাপিষ্ঠা, আমার সুখ ঘুচাইলি" বলিয়া নদীকূলে ছুটিলেন। তাঁহার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া গাভীরা মুখ তুলিয়া রহিল, হংসগণ কূল হইতে জলে নামিল, শবভুক্ কুক্কুরেরা স্বস্ব ভস্মস্তূপ ত্যাগ করিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। বিনোদ কিছুই লক্ষ্য না করিয়া মনের বেগে ছুটিতে লাগিলেন। কতক দূর যাইয়া নদীকূলে একটি অস্থিময় মড়ার মাথা দেখিয়া দাঁড়াইলেন; উহার ভগ্ন নাসা, কূপ চক্ষু, আকর্ণ বিকট দন্তশ্রেণী দেখিয়া হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন "এই দেখ আমিও হাসিতে জানি, আমি এখনও হাসিতে পারি, কেন হাসিব না? আমার কি হইয়াছে? কিছুই নহে। বল, তুমি হাস কেন? তুমি কোন যন্ত্রণা লুকাইয়া হাসিতেছ? তোমার হাসির মর্ম্ম কি? আমার অদৃষ্ট দেখিয়া হাসিতেছ? তুমি স্ত্রীলোকের স্কন্ধে শোভা পাইয়াছিলে তাহাই তোমার এত হাসি; তোমার দেহ গিয়াছে, প্রাণ গিয়াছে, তবু হাসি যায় নাই; এই যাউক"

বলিয়া শবমস্তকে পদাঘাত করিলেন। শবমস্তক গড়াইতে গড়াইতে জলে পড়িল। বিনোদ দেখিলেন যে মড়ার মাথা গড়াইতে গড়াইতেও তাঁহার দিগে ফিরিয়া ফিরিয়া হাসিতে লাগিল; একবার তাঁহার দিগে চাহিয়া দন্তবিদারণ করিয়া হাসে আবার বালুকায় মুখ ঘুরাইয়া ফিরিয়া হাসে। বিনোদ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। নদীতে যে স্থানে শবমস্তক ডুবিল সেই স্থান হইতে দুই চারিটি জলবিম্ব উঠিল, ফাটিল মিশাইয়া গেল। বিনোদ অনেকক্ষণ তথায় স্পন্দরহিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে দুই একবার মস্তক আন্দোলন করিয়া সদর্পে অথচ অল্প অল্প পদবিক্ষেপে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন যেখানে নর্ত্তকীকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন নর্ত্তকী সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে, মাধবী পত্র লইয়া ছিঁড়িতেছে। বিনোদ তাহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না চলিয়া গেলেন; আবার কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন; বলিলেন "আমি বড় রূঢ় কথা বলিয়াছি, আমি দুর্ভাগ্য আমার উপর অভিমান করিও না, আমি বড় দুঃখী, এখন হইতে চিরদুঃখী হইলাম, আমার আর এজন্মে কোন আশা ভরসা রহিল না।" এই বলিয়া বিনোদ মুখ ফিরাইলেন: তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনিয়া নর্ত্তকীর নয়নাশ্রু মাধবী পত্রে পড়িতে লাগিল। বিনোদ গৃহপ্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন আর নর্ত্তকীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। শেষ নর্ত্তকী নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

শৈলের সম্বাদ বিনোদ কিছুই জানেন না। যে রাত্রে বিনোদ জেলখানা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আপনার গৃহে মৃতপ্রায়

পড়িয়াছিলেন, সেই রাত্রে শম্ভু কয়েদি আসিয়া শৈলকে লইয়া গেলে আর তাহার কোন সম্বাদ পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে সে সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে।

যে গ্রামের ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে রামদাস সন্ন্যাসী আর মোহান্ত বাস করিতেন, শম্ভু শৈলকে সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামে গেলেন। রামদাসের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া শৈল সম্বন্ধে কতক গুলিন উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলে রামদাস শৈলকে বলিলেন, "মাতঃ আমার সঙ্গে আসুন।"

শৈল প্রথমে কোন উত্তর দিল না মস্তক ফিরাইয়া শম্ভুকে দেখিতে লাগিল। শম্ভু দৃষ্টির বাহির হইলে শৈল সন্ন্যাসীর কথায় কর্ণপাত করিল। সন্ন্যাসী পুনরায় বলিলেন "আমার সঙ্গে আসুন।"

শৈল ফণিনীর মত মাথা তুলিয়া বলিল "তোমার সঙ্গে কোথায় যাইব? কেন যাইব, তুমি কে?" শম্ভু যেদিগে গিয়াছেন সেই দিক দেখাইয়া রামদাস বলিলেন "আমি ঐ প্রভুর অনুমত্যনুসারে বলিতেছি আমার সঙ্গে আসুন।"

শৈ। আমি যদি না যাই?

রা। তবে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।

শৈ। এখানে তোমার সমভিব্যাহারে আর কে আছে?

রা। অনেকে আছে।

শৈ। কয়জন?

রা। বাইশ জন।

শৈ। তবে চল।

শৈলকে সঙ্গে লইয়া রামদাস সম্মুখস্থ এক দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শৈল দেবমূর্ত্তিকে হস্ত তুলিয়া প্রণাম করিলেন। রামদাস বলিলেন "আসুন।" শৈল বলিল "আবার

কোথায়?" ভিত্তিপার্শ্বস্থ সোপান দেখাইয়া রামদাস বলিলেন "এই পথে চলুন।" শৈল সদর্পে উপরে চলিলেন। মন্দিরের উপরস্তবকে আর একটি দেবমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে রামদাস তাহার চক্ষু বাঁধিয়া কয়েকবার প্রতিমা বেষ্টন করাইয়া হস্ত ধরিয়া বলিলেন "আবার আসুন।" শৈল আর কোন আপত্তি করিল না, কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, পূর্ব্বমত দম্ভভাবে চলিল। কয়েক পদ যাইয়া শৈল বুঝিতে পারিল সোপান অবতরণ করিতে হইতেছে। যে সোপান দিয়া উঠিয়া ছিল সেই সোপান কি অন্য সোপান অবতরণ করিতে হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিল না কিন্তু জিজ্ঞাসাও করিল না।

সোপান অবতরণ করিয়া শৈল অনুভব করিল যে কোন প্রস্তরময় পথ দিয়া চলিতেছে। আবার পরক্ষণেই অনুভব করিল পথটি প্রশস্ত নহে। উভয় দিগে প্রস্তরময় প্রাচীর আছে। ক্ষণবিলম্বে একটা দুর্গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। শৈল ভাবিল, সিক্ত মৃত্তিকার দুর্গন্ধ। ক্রমে সেই গন্ধ আরও প্রবল হইল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল "সন্ন্যাসী? কোথায় লইয়া যাও আমার শ্বাস রোধ হয় যে।" রামদাস তখন শৈলের চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া বলিল "আর একটু কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে।"

শৈলের চক্ষুবন্ধন মোচন হইল সত্য, কিন্তু শৈল কিছুই দেখিতে পাইল না পথ অন্ধকারময়। সন্ন্যাসীর পদধ্বনি অনুসরণ করিয়া শৈল যাইতে ছিল; হঠাৎ শব্দ স্থগিত হইল। শৈল ভাবিল সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছে অতএব দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক বিলম্বে জিজ্ঞাসা করিল, "সন্ন্যাসী, দাঁড়াইলে কেন?" সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিল না। আবার শৈল সেই কথা

জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু এবারও উত্তর পাইল না। শৈল ফিরিল, ফিরিয়া দেখে পশ্চাতের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, পথ প্রমাণ দ্বারে পথরোধ করিয়াছে। দক্ষিণ দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া দেখে প্রস্তরময় প্রাচীর। বাম দিকেও সেইরূপ, কেবল সম্মুখে খোলা আছে কিন্তু বড় অন্ধকার। ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া দেখে আকাশ নক্ষত্র কিছুই দেখা যায় না সকলই অন্ধকার। শৈল চীৎকার করিয়া উঠিল চীৎকার অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হইল। ক্ষণেক দাঁড়াইয়া শৈল ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল "সন্যাসী! আমি কি এইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিব? না আর কোথায় আমায় যাইতে হইবে? এস্থানে আমার শ্বাসরোধ হইতেছে। একি প্রস্তরময় গর্ত্তে আনিয়া আমায় রুদ্ধ করিলে? এই কি আমার সমাধিস্থান? আমাকে জীবিত মারিবার নিমিত্ত কি এইখানে আনিয়াছ?" শৈলের প্রশ্নে কেহ উত্তর দিল না। শৈল ক্ষণেক কর্ণ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কেহ উত্তর দিল না; কোন শব্দ নাই। তখন শৈল সম্মুখে হস্ত প্রসারিয়া সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অল্পদূর আসিলে শৈলের অঙ্গে প্রাতর্ব্বায়ু স্পর্শ করিল। শৈল পুলকিত হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, ভয় নাই শীঘ্র মরিব না সম্মুখে অবশ্য বায়ুর পথ আছে। অতএব তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল কিন্তু কয়েক পদ না যাইতে যাইতেই প্রাচীর স্পর্শ হইল। শৈল বাম দিকে ফিরিয়া আবার কয়েক পদ গেল, সেদিকেও পূর্ব্বমত প্রাচীর স্পর্শ হইল। এইরূপে শৈল চারিদিকে ফিরিল। চারিদিকেই প্রস্তরময় প্রাচীর; কোথায় বায়ুর পথ তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু শৈলের নিশ্চয়ই বোধ হইল যে প্রস্তরময় কোন ঘরে সে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু অন্ধকারে নির্গমের পথনির্ণয় করা কঠিন। অতএব দাঁড়াইয়া প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড।] অগ্রহায়ণ ১২৮১। [৮ সংখ্যা।

বঙ্গে দেবপূজা

প্রতিবাদ।

কার্ত্তিক মাসের ভ্রমরে শ্রীঃ স্বাক্ষরিত "বঙ্গে দেবপূজা" নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার কথা আছে।

শ্রীঃ মহাশয়ের কথার রীতিমত প্রতিবাদ করিতে গেলে যে সময় লাগে তাহা আমার নাই; এবং যে স্থান লাগে তাহা ভ্রমরের নাই। কিন্তু কথা সহজ—সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে।

তাঁহার স্থূল কথা এই, যে পৌত্তলিকমত, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ইহা বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকাতে, দেশের বিশেষ উপকার আছে। কিকি উপকার?

তিনি, প্রথম উপকার, এই দেখান যে, দেব সেবার অনুরোধে সেবক ভাল খায় পরে। এবং এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বৈষ্ণবের বাড়ী ব্রাহ্ম অতিথির উদাহরণ দিয়াছেন। শ্রীঃ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, যাহারা ঠাকুর পূজা করে না, তাহারা

কি কখন ভাল খায় পরে না? শ্রীঃ মহাশয় কি কখন সাহেবদিগের আহার দেখেন নাই, তাহারা কয়টা শালগ্রামের ভোগ দেয়। হিন্দু পুত্তল পূজা করে, ইংরেজ করে না; ইংরেজ ভাল খায়, না হিন্দু ভাল খায়? ইংরেজ। তবে আহারাদির পারিপাট্য যে ঠাকুর পূজার ফল নহে, তাহা শ্রীঃ মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে।

তিনি হয়ত বলিবেন, ইহা সত্য, তবে বাঙ্গালি এমনি জাতি, যে যাহা কিছু ভাল খায়, তাহা ঠাকুরের অনুরোধে, ঠাকুর না থাকিলে খাইত না। একথা মিথ্যা। অনেক ঘোর নাস্তিক, উৎকৃষ্ট আহার করে, এবং অনেক দৃঢ়ভক্ত কানাইয়া লালকে এমন কদন্ন ভোগ দেয়, যে তাহার গন্ধে ভূত প্রেত পলায়। স্থূলকথা এই, যে যাহার শক্তি ও সংস্কার আছে, সেই ভাল খায়। যে এখন ঠাকুরকে উপলক্ষ করিয়া ভাল খায়, বা খাওয়ায়, সে পৌত্তলিক না হইলে উদরের অনুরোধে ভাল খাইত, খাওয়াইত। শ্রীঃ মহাশয় দ্বিতীয় উপকার বঙ্গ মহিলা সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন। লিখেন, "প্রকৃত ঈশ্বরের নিকট থাকায় যে ফল, তাহা তাহাদের ফলিতেছে।" শ্রীঃ মহাশয় সে ফল কি আপনি জানেন? সে ফল পুরুষোত্তম, কাশী, প্রভৃতি তীর্থ স্থানে প্রকটিত আছে। ঈশ্বর সান্নিধ্য হিন্দু মহিলার নিকট নিঃশঙ্কচিত্তে পাপ করিবার স্থান বলিয়া পরিচিত।

তিনি বলেন, সাকারে প্রার্থনা আন্তরিক হয়, নিরাকারে তত হয় না। কে বলিয়াছে? কেন হয় না? যাহাকে চাক্ষুষ মাটী বা পাতর দেখিতেছি, তাহার কাছে যদি আন্তরিক কাঁদিতে পারি, তবে যাঁহাকে চক্ষে দেখিতেছি না, কিন্তু মনে জানিতেছি তিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, কেন তাঁহার কাছে আন্তরিক কাঁদিতে না পারিব? কেন সেইরূপ সান্ত্বনা লাভ না করিব?

শ্রীঃ, যুবতীর মুখে যে কয়টি কথা বসাইয়াছেন, তাহা মেয়েলি কথা বলিয়া উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না। যুবতী স্ত্রীবুদ্ধিতে অলীক কথা বলিয়াছে, ভক্ত নিরাকারবাদীর অন্তঃকরণ বুঝিতে পারে না বলিয়া বলিয়াছে। দেবতার কাছে আছি বলিয়া, তাহার যে সুখ, যে সাহস, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের কাছে আছি বলিয়া, নিরাকার ভক্তেরও সেই সুখ, সেই সাহস। বিশ্বাসের দার্ঢ্য থাকিলে সাকার নিরাকারে কোন প্রভেদ নাই।

তৃতীয় উপকার, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ রোগ ভাল করেন, শ্রীঃবলেন, রোগ বিশ্বাসে ভাল হয়, বিশ্বাস দেবতার উপর। যদি বিশ্বাসে রোগ ভাল হয়, তবে বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারের সংখ্যা বাড়িলেই দেবতারা পদচ্যুত হইতে পারেন।

চতুর্থ উপকার, উৎসব, যথা দুর্গোৎসবাদি। জিজ্ঞাসা করি এই হতভাগ্য অন্নক্লিষ্ট, বৃথা হট্টগোলে ব্যতিব্যস্ত বঙ্গ সমাজে এতটা উৎসবের কি প্রয়োজন আছে? এখন কতগুলি কঠিন-হৃদয়, ভোগপরাঙ্মুখ, উৎসববিরত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব না হইলে, ভারতবর্ষের কি উদ্ধার হইবে?

পঞ্চম, শ্রীঃ বলেন এই উপধর্ম্ম বঙ্গের সমাজবন্ধন; এবন্ধন রাখিয়া, সমাজ রক্ষা কর। বঙ্গসমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া,সমাজ ভঙ্গ করা, বিচলিত, বিপ্লুত, করারই প্রয়োজন হইয়াছে; এই খইয়ে বন্ধনে বাঙ্গালির প্রাণ গেল। এ [illegible] গোরুর দড়ী আর আমাদের গলায় রাখিওনা। যদি দেবতা পূজাই, এই নরক তুল্য সমাজের মূল গ্রন্থি হয়, তবে আমি বলি,যে শীঘ্র শানিত ছুরিকার দ্বারা ইহা ছিন্ন কর। নূতন সমাজ পত্তন হউক।

রূপক একটি ভ্রমের কারণ। "বন্ধন" শব্দটি ব্যবহার করিলে লোকে মনে করিবে "বড় আঁটা আঁটি—দড়ি ছাড়িস না, বাঁধন ঠিক রাখিস।" বস্তুতঃ সমাজ বন্ধন মানে কি? শ্রীঃ কি মনে করেন,

যে দেবতার পূজা উঠিয়া গেলেই,সমাজ খসিয়া পড়িবে,সমাজের লোক সকল, সমাজ ছাড়িয়া, গোশালাবিমুক্ত গোরুর ন্যায় বনের দিকে ছুটিবে? তাহা নহে। আসল কথা এই দেবতাভক্তি, বঙ্গ সমাজের একটি ধর্ম্মভিত্তি। এভিত্তি ভাঙ্গিয়া গেলে ধর্ম্মের অন্যভিত্তি হইবে; সমাজ নষ্ট হইবে না। যতদিন না, নূতন ভিত্তি পত্তন হয়, ততদিন কেহ এইভিত্তি বিনষ্ট করিতে পারিবে না। শিক্ষা এবং লোকবাদ (public opinion;)এবং উৎকৃষ্ট নীতি শাস্ত্রজনিত নূতনভিত্তি চারিদিকে স্থাপিত হইতেছে। শ্রীঃ বলেন, "ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রভৃতি যে কয়েকটি গুণের নিমিত্ত বাঙ্গালা বিখ্যাত, তাহা এই দেবতাদিগেরপ্রসাদাৎ।" ইত্যাদি। পুত্তল পূজা ভিন্ন যে ভক্ত্যাদি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অন্য মূল নাই, একথা এরূপ অমূলক এবং অশ্রদ্ধেয়, যে ইহার প্রতিবাদ আবশ্যক করে না।

আমি সংক্ষেপতঃ দেখাইলাম যে শ্রীঃ বঙ্গীয় দেবতাগণকে যে কয়েক বিষয়ে উপকারক মনে করেন, তাহা কেবল তাঁহার ভ্রান্তি। সকল ভ্রান্তি দেখাইতে গেলে, তিন নম্বর ভ্রমর আমাকেই ইজারা করিতে হইবে। কিন্তু বিচারার্থ আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে কোন কোন বিষয়ে সাকার-পূজা উপকার করে। তাই বলিয়া কি সাকার পূজা অবলম্বনীয়? এ জগতে এমন অপকৃষ্ট সামগ্রী কি আছে, যে তদ্দারা কোন না কোন উপকার নাই। মদ্য উৎকৃষ্ট ঔষধ; অনেক বিষে উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়; তাই বলিয়া কি মদ্য এবং বিষ নিত্য সেবা করা কর্ত্তব্য? কয়েদী জেলে গিয়া, পরের খরচে খাইতে পায়, তাই বলিয়া কি কারাবাস কামনীয়? অপুত্রকের ব্যয় অল্প, সেই জন্য কি অপুত্রকতা কামনীয়? অনেক স্ত্রীলোক অসতী হইয়াই পুত্রবতী হইয়াছে; তাহাতে কি অসতীত্ব ইষ্ট বস্তু

হইল? সাকার পূজায় কিছু কিছু উপকার আছে বলিয়াই কি সাকার পূজা প্রচলনীয় বলিয়া সিদ্ধ হইল?

সকলেরই কিছু শুভ ফল আছে, সকলেতেই কিছু অশুভ ফল আছে। শুভাশুভের তারতম্য বিচার করিয়া, কোনটি কামনীয়, কোনটি পরিহার্য্য মনুষ্যে বিচার করে। একটি গেল, তাহার স্থানে আর একটি হইল; যেটি ছিল, তাহার যে সকল শুভ ফল, তাহা আর রহিল না, কিন্তু যেটি হইল, তাহার জন্য, নূতন কতকগুলি শুভ ঘটিবে। এইগুলি যদি পূর্ব্ব শুভের অপেক্ষা গুরুতর হয়, তবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। সাকার পূজার শুভ ফল অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু নিরাকার পূজার শুভফল যে তদপেক্ষা গুরুতর নহে, তাহার আলোচনায় শ্রীঃ একেবারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

যখন এদেশে রেলের গাড়ি ছিল না, তখন ভ্রমণ, পদব্রজে, নৌকায়, বা পাল্‌কীতে করিতে হইত। নৌকা বা পাল্‌কীতে যাতায়াতের দুই একটী সুফল ছিল—তাহা বাষ্পীয় যানে নাই। নৌকাযাত্রা স্বাস্থ্য কর। যেদেশ দিয়া রেইল গাড়িতে যাও তাহার কিছুই দেখা হয় না, গড়গড় করিয়া তাহা পার হইয়া যাও। পাল্‌কীতে বা পদব্রজে গেলে, সকল দেশ দেখিয়া যাওয়া যায়; তাহাতে বহুদর্শিতা এবং কৌতূহল নিবারণ লাভ হয়। তাই বলিয়া যে বলিবে রেলগাড়ি উঠাইয়া দাও, দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহাকে শ্রীঃ কিরূপ বোদ্ধা বলিয়া গণ্য করিবেন? নিরাকারভক্তও তাঁহাকে সেইরূপ বোদ্ধা বলিয়া মনে করিতে পারে।

তিনি সাকার পূজার গুণ কতকগুলি দেখাইয়াছেন; দোষ একটিও দেখান নাই। তাহার দুই একটি অশুভ ফলের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় হইতেছে। উল্লেখমাত্র করিব।

প্রথম, সাকার ধর্ম্ম, বিজ্ঞানবিরোধী। যেখানে সাকার ধর্ম্ম প্রচলিত, সেখানে জ্ঞানের উন্নতি হয় না। সেখানে সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর—"দেবতায় করেন।" অন্য উত্তরের সন্ধান হয় না। অতএব সাকার পূজা জ্ঞানোন্নতির কণ্টক।

যদি কেহ বলেন, যে অনেক যুনানী এবং অনেক আর্য্য পণ্ডিত জ্ঞানের উন্নতি করিয়া ছিলেন, তাঁহারাই কি সাকার বাদী ছিলেন না? উত্তর, না—কেহই না। যুনানী তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবেত্তৃগণ, এবং আর্য্য মহর্ষিরা, যাঁহারা কিছু জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন, সকলেই নিরাকারবাদী ছিলেন। সাকার-বাদী কর্তৃক জ্ঞানের উন্নতি প্রায় দেখা যায় না।

দ্বিতীয়। সাকার পূজা, স্বানুবর্ত্তিতার বিরোধী। চারিদিকে মনুষ্য চিত্তকে বাঁধিয়া, মনুষ্য চরিত্রের, স্ফূর্ত্তি, উন্নতি এবং বিস্তৃতি লোপ করে।

তৃতীয়। জ্ঞান এবং স্বানুবর্ত্তিতার গতি রোধ করিয়া, এবং অন্যান্য প্রকারে সাকার পূজা সমাজের গতিরোধ করে।

পক্ষান্তরে, ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে সাকার পূজার একটী গুরুতর সুফল আছে, শ্রীঃ তাহা ধরেন নাই। সাকার-পূজা কাব্য এবং সূক্ষ্ম শিল্পের অত্যন্ত পুষ্টিকারক। সাকারবাদী-দিগের প্রধান কবিদিগের তুল্য কবি, নিরাকার বাদীদিগের মধ্যে একজনমাত্র আছেন—একা সেক্ষপিয়র। বঙ্গদেশেও, সাকার পূজার ফল, বৈষ্ণবকবিদিগের অপূর্ব্ব গীতি কাব্য।

শ্রীঃ সাকার নিরাকারের মধ্যে কোনটি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা তাহার মীমাংসা করেন নাই; আমিও তাহা করিব না। বুঝি বিচার করিতে গেলে, দুয়ের একটিও টিকিবে না। ভক্তিতে কৃষ্ণ পাওয়া যায়, কিন্তু তর্কে কৃষ্ণ বা ঈশ্বর কাহাকেও পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি দুইটির মধ্যে একটি প্রকৃত হয়, তবে যেটি প্রকৃত

সেইটি প্রচলিত হওয়াই কর্ত্তব্য, অপ্রকৃতের সহস্র শুভ ফল থাকিলেও তাহা প্রচলিত হওয়াই অকর্ত্তব্য। যদি সাকার পূজাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা হয়, তবে তৎপ্রদত্ত উপকার সকল এক এক করিয়া গণিবার আবশ্যকতা নাই; তাহাতে কোন উপকার না থাকিলেও, সহস্র অনুপকার থাকিলেও তাহাই অবলম্বনীয়। আর যদি তাহা না হইয়া নিরাকার প্রকৃত ঈশ্বর স্বরূপ হয়, তবে সাকার পূজায়, সহস্র উপকার থাকিলেও, নিরাকার পূজায় কোন ইষ্ট না থাকিলেও, সাকার পূজা লুপ্ত হওয়াই উচিত। ইহার কারণ সত্য ভিন্ন অসত্যে কখন মঙ্গল নাই। সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই শুভ, সত্যই বাঞ্ছনীয়, সত্যমেব জয়তি।

বঃ

স্বপন।

নিম্ন লিখিত পদ্যটি বালকের রচিত বলিয়া আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম। স্থানে স্থানে দুই একটি কথা পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

ভাঃ সম্পাদক।

১

বিমল গগনপটে শোভে শশধর,
উজলিয়া চারিদিক্ কৌমুদী রাশিতে।
ছুটিছে অম্বর মাঝে শ্বেত জলধর।
চারিদিকে তারামালা লাগিছে জ্বলিতে—
মুকুতা হারেরমত, আলো করি শূন্য পথ,
নাচে তার প্রতিরূপ নদীর উপরি;
নৃত্যকরে শৈলবালা, পরিয়া হীরকমালা,
রঙ্গ ভঙ্গে থেকে থেকে তুলিয়া লহরী।

২

বিশদ অম্বরা পৃথ্বী। তটিনী তটেতে,
শোভিতেছে উচ্চশির মহীরুহচয়,
যেন নিরখিছে সবে হিমাংশু পটেতে,
কভু মস্তশির নাড়ি সবে কথা কয়।
বসি উপত্যকা পরে, দেখিলাম স্বপ্নান্তরে,
মলিনা রমণী এক করিয়া শয়ন
উচ্চ বটবৃক্ষতলে; লুটাইয়া কেশদলে,
দেখিতেছে পাগলিনী সৌভাগ্য স্বপন—

৩

"ফুটেছে সৌভাগ্য ফুল স্বদেশ কাননে,
কত অলিকুল তাহে মেতেছে রঙ্গেতে,
রক্তবর্ণ পক্ষ তুলি মন্দ সমীরণে,
শোভিতেছে জয় ধ্বজা স্বদেশ বক্ষেতে।
তার নিম্নে সিংহাসনে, ক্রোড়ে করি পুত্রগণে,
বসিয়াছে পাগলিনী সহাস্য বদন;
সবার চিবুক ধরি, অশ্রুজলে নেত্রভরি,
করিতেছে সবাকার বদন চুম্বন।

৪

পুত্রগণ অশ্রুজল মুছি নিজ করে,
বলে "মাতা আর নাহি করিব এমন,
বহুদুখে হারাধন আনিয়াছি ঘরে,
আলস্যেতে আর নাহি ত্যজিব কখন।"
"আর কভু ত্যজিওনা,
প্রাণ গেলে ছাড়িওনা,

না বুঝিলি তোরা বাছা আমার যতন,
বুঝি চিনিয়াছ এবে,
তাই কাঁদিতেছ সবে,
মোর পূর্ব্ব দুখ যত করিয়া স্মরণ।

৫

কার্থেজ রমণী যারা,
শতগুণে ধন্য তারা,
তারাইত চিনেছিল স্বাধীনতা ধন,
অসিত চিকুর রাশি,
নিজ স্বামী কাছে আসি,
ধনুগুণ তরে সবে করিত অর্পণ।*

৬

রণসজ্জা রঙ্গ সাজে হইয়া সজ্জিত,
পুরাকালে যবে পুত্র জননী পাশেতে,
জন্মমত মাতৃমুখ দেখিতে আসিত,
বলিতেন মাতা তারে আশিষ বাক্যেতে,
"যাও পুত্র রণে যাও,
প্রতি পদে জয় পাও,
দেখিব আবার যবে এখানে আসিবে,
নতুবা জনমতরে, লয়ে এই অসি করে,
ফলক উপরি শুয়ে নিদ্রিত থাকিবে।

* In the 3d Punic war between the Romans and the Carthaginians, the Carthaginian women cut off their long hairs, to furnish strings for the bows of the archers and engines for the slingers.

৭

তথাপি সমরে পৃষ্ঠ কভু না দেখাবে,
বাহিনী মধ্যেতে উচ্চ সিংহনাদ করি,
বিস্ফারিয়া শরাসন সর্ব্ব অগ্রে যাবে,
দলিবে বিপক্ষ ঠাট যেমন কেশরী।"†
পাগলিনী এত বলি, চুম্বিলেক পুত্রগুলি,
"এবার হারান ধন রাখিব যতনে,"
এই বলি পুত্রগণে, হরষিত হয়ে মনে,
বিসর্জ্জয়ে মুক্তাবিন্দু মাতার চরণে।

৮

সে দিনে স্বদেশ হল অপূর্ব্ব শোভন,
যেন অন্ধকারে হল অরুণ উদয়।
সকলের দেখি আজ সহাস্য বদন,
আনন্দেতে সকলের তিতে আঁখি দ্বয়।
সেই দিন দিবাকর, তারা সহ শশধর,
দেখাতে লাগিল যেন হাসিছে গগনে,
ছড়াইয়ে পুচ্ছ গুলি, উচ্চ কেকা রব তুলি,
নাচিতে লাগিল হর্ষে যত শিখিগণে।"

৯

দেখিতে দেখিতে নিজ সুখের স্বপন,
অকস্মাৎ নিদ্রাভেঙ্গে উঠি পাগলিনী,
বলে "কোথা গেল মোর জয়ী পুত্রগণ,
আজন্ম কাঁদিব কিরে আমি উন্মাদিনী।"
পাগলিনী মত চলে, পাগলিনী মত বলে,
"সকলে দুর্ভাগী কিরে আমার মতন!"

---

† This was one of the customs of the ancient Greeks.

কেঁদে কেঁদে এই বলে, চক্ষুমুছি নিজাঞ্চলে,
গভীর বিজন বনে করিল গমন।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কণ্ঠমালা।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

শৈলের অনুভব মিথ্যা নহে। যে খানে দাঁড়াইয়া শৈল প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহা প্রস্তরময় একটিক্ষুদ্র ঘরের অংশ বটে। কিন্তু ঘরটি মৃত্তিকার মধ্যে এত গভীর স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে কস্মিন্‌কালে তাহার ছাদে বৃক্ষের মূলস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রায় সহস্র বৎসর হইল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন ধনী ব্যক্তি ধর্ম্ম চিন্তা করিবার নিমিত্ত অন্যত্র আর কোথাও নির্জ্জন স্থান না পাইয়া শেষ মৃত্তিকার ভিতর এই ঘর প্রস্তুত করেন। তথায় যাতায়াতের নিমিত্ত, তাঁহার শয়ন ঘর হইতে এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই সুড়ঙ্গের কতকাংশ দিয়া শৈলকে যাইতে হইয়াছিল।

প্রথমে এই ঘরটি ধর্ম্মার্থে প্রস্তুত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু শেষে প্রায় তাহার বিপরীত কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, আদিশূরের পূর্ব্ব পুরুষ যিনি যখন আসাম দেশীয় রাজাদিগকে পরাভব করিতে পারিয়াছেন তিনিই তখন এই ঘরে পরাভূত রাজার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। এবং তদুপযোগী করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এই ঘরের অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

ভূগর্ভস্থ এই ঘরটির পূর্ব্বদিকে একটি বেগবতী নদী প্রবাহিত

ছিল, সেই নদী হইতে এই ঘরের ঊর্দ্ধভাগ কতক দেখা যাইত কিন্তু সে ভাগ এরূপ নির্ম্মিত ছিল যে তাহা পোস্তা ভিন্ন আর কিছু বোধ হইত না। নদীর এই অংশে বুড়ির ঘোল নামে এক আবর্ত্ত ছিল তাহার ভয়ে কোন নৌকা ঐ অংশ দিয়া যাইতে সাহস করিত না।

প্রাতঃকাল হইলে শৈল দেখিল যে ঘরটি সমুদয় বড় বড় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, ছাদে কড়ি বরগা নাই কেবল একটি খিলান। তাহাও প্রস্তর ময়। খিলানের নীচে পূর্ব্বদিকে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দ্বার আছে, সেই দ্বার দিয়া প্রাতর্বায়ু আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। ঐ গবাক্ষ দ্বার দিয়া কি দেখাযায় তাহা দেখিবার নিমিত্ত শৈল চেষ্টা করিল কিন্তু তত ঊর্দ্ধ স্থানে উঠিবার কোন উপায় দেখিল না। পরে শব্দ-দ্বারা স্থানটি অনুভব করিতে পারিবে বলিয়া শব্দানুসন্ধানে কর্ণ তুলিয়া রহিল কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না; ভাবিল বেলা হউক লোক জন যাতায়াত করিলেই বুঝিতে পারিব।

ক্রমে অল্প বেলা হইল। গবাক্ষ দ্বারের সমসূত্রে সূর্য্য উঠিলে ঘরের পশ্চিম দিকে সূর্য্য কিরণ লাগিল এবং তাহার প্রতিঘাতে ছাদের খিলান পর্য্যন্ত বিলক্ষণ আলোকবিশিষ্ট হইল। শৈল দেখিল খিলানের দুই এক খানি প্রস্তর ঈষৎ নামিয়াছে এবং তাহার পার্শ্ব দিয়া বর্ষাসিক্ত কর্দ্দম, স্থানে স্থানে নয়নাশ্রুর ন্যায় পড়িয়া চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; কোথাও কোথাও যেন শ্বেত ফেণ শুকাইয়া রহিয়াছে। শৈল এসকল একবার মাত্র দেখিয়া আবার গবাক্ষ দ্বার দিকে চাহিয়া রহিল, ঐ দ্বার দিয়া কি দেখা যাইবার সম্ভাবনা, কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল। বেলা হইয়াছে তথাপি মনুষ্যের শব্দ শুনা গেল না। শৈল ভাবিল এদিকে বসতি নাই গতিবিধির পথও নাই, বোধ হয় কেবল মাঠ হইবে।

অপর তিন দিকে যে বসতি আছে তদ্বিষয়ে শৈল প্রথমে কোন সন্দেহ করে নাই। কিন্তু ক্রমে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল, ভাবিল, যদি এ সকল দিকে বসতি থাকে তবে মনুষ্যের কণ্ঠ কেন শুনা যায় না? একটি পক্ষিরবও শুনা যায় না। শৈল জানিত না যে, যে ঘরে সে রহিয়াছে তাহা ভূগর্ভে নির্ম্মিত। এখান হইতে কোন শব্দ শুনিবার সম্ভাবনা নাই।

শেষে শৈলের মনে হইল যে এখানে আসিবার সময় যে কয়েকটি ভগ্ন কুটীর দেখিয়া আসিয়াছে তাহাতে অধিক লোকের বাস নাই, ভাবিল "এই জন্যই এখান হইতে সতত মনুষ্য-শব্দ শুনা যায় না, কিন্তু নিকটে লোক অধিক থাক্ বা অল্প থাক্ তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? নিকটে যাহারা বাস করে তাহারা অবশ্য আমার শত্রু, নতুবা সন্ন্যাসী রাত্রে আমাকে এই গর্ত্তের মধ্যে আনিতে সাহসী হইত না। আমাকে একাকিনী পাইয়া সন্ন্যাসী তাহার বীরত্ব দেখাইয়াছে। কি বলিব কল্য রাত্রে আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, নতুবা সন্ন্যাসীর বীরত্ব দেখাইতাম। আহা, কি ভুলই ভুলিছি। একবার যদি সন্ন্যাসীর চুল ধরিতাম, তবে সে নাকে খত দিয়া পলাইত। তখন ভাবিলাম একটা সন্ন্যাসী আমার কি করিবে? এখন ত দেখিতেছি আমাকে শিয়াল কুক্কুরের ন্যায় পিঞ্জরে পুরিয়াছে—"এই ভাবিতে ভাবিতে শৈল দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল ঘরের দুইটি দ্বার। একটী পশ্চিম দিকে আর একটি দক্ষিণ দিকে; উভয় দ্বারই এক্ষণকার সচরাচর দ্বারের ন্যায় দ্বিদল নহে, উভয়ই একদল এবং একখণ্ড লৌহ দ্বারা গঠিত। শৈল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দুই একবার অতি তীব্র কটাক্ষে সেই লৌহময় রুদ্ধ দ্বারের প্রতি চাহিল মাত্র, দ্বারের নিকট গেল না বা দ্বার ঠেলিল না, শেষ কক্ষ-প্রান্তে একটি বেদির উপর যাইয়া বসিল, বসিয়া আবার এক-

বার দ্বারের দিকে চাহিল। প্রস্তরের প্রাচীর, লৌহ দ্বার ইত্যাদি দেখিয়া আপনার অবস্থা বুঝিয়াছিল, অতএব ভাবিতে লাগিল "আমাকে কি সত্য সত্যই আবদ্ধ করিল? আমাকে কি আর ছাড়িয়া দিবে না? আমায় এখানে কত দিন থাকিতে হবে? কেন থাকিতে হবে? কার কথায় থাকিতে হইবে? সন্ন্যাসীর কথায়? সন্ন্যাসী ত কেহই নহে বুঝিতে পারিয়াছি, তবে যিনি রাত্রে আসিয়াছিলেন তিনিই—"এই সময় শম্ভু কয়েদীর আকৃতি শৈলের মনশ্চক্ষে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, শৈল নতশীর হইয়া বসিল। শম্ভু স্বয়ং সেই ঘরে উপস্থিত হইলে শৈলের যেরূপ ভাব হইত সেইরূপ হইল। শৈল বালিকাকাল অবধি কখন ভয় পায় নাই, কখন কোন ভয়ানক দৃশ্য দেখে নাই; অথবা যদি কখন দেখিয়া থাকে, তাহাতে তাহার ভয় হয় নাই। রাত্রে শম্ভুকে দেখিয়া তাহার ভয়ের এই প্রথম সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে শম্ভুর চক্ষু মনে পড়িয়া সেই ভয় আরও স্পষ্টীকৃত হইল। শম্ভুকে ভুলিবার নিমিত্ত শৈল শরীর কুঞ্চিত করিয়া শয়ন করিল, কিন্তু ভুলিতে পারিল না, শম্ভুকে মনের মধ্যে সভয়ে দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, শৈলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শৈল উঠিয়া দুই হস্তে কেশবিন্যাস আরম্ভ করিল, তাহা সমাধা হইলে মুখ মুছিয়া দর্পণ লইবার নিমিত্ত একবার অন্য-মনস্কে বামহস্ত প্রসারণ করিল, করিয়াই অমনি হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া দাঁড়াইল। এই সময় দেখিল, দক্ষিণ দিকের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। কে মুক্ত করিল, কখন মুক্ত করিল, শৈল তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। মুক্ত দ্বার দিয়া কোথায় যাওয়া যায়, দেখিবার নিমিত্ত শৈল সেইদিকে গেল। যাইয়া দেখে একটি ক্ষুদ্র ঘরে স্নানাদির উপকরণ সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে।

শৈল প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া আর একস্থানে দেখিল, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত রহিয়াছে। শৈল তথায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে অন্ন কে আনিল? এ অন্ন আমি খাইব না, আমি বিধবা। হবিষ্য করিব, অথবা অনাহারী থাকিব।"

শৈলের এ কথায় কেহ উত্তর দিল না। শৈল দাঁড়াইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিল, কোনদিকে নির্গমের পথ দেখিল না। আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "কে অন্ন আনিয়াছ, লইয়া যাও, আমি বিধবা।" এই কথা বলিয়া শৈল যেন রাগ ভরে ফিরিয়া আসিল।

বেদির উপর বসিয়া শৈল দক্ষিণদিকের দ্বার প্রতি চাহিয়া রহিল। এই সময় সেই দ্বার নিঃশব্দে রুদ্ধ হইল, আর সমস্ত দিনের মধ্যে মুক্ত হইল না। শৈল অভুক্ত রহিল।

ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল, গবাক্ষদ্বারদিয়া যে পরিমাণে আলোক আসিতেছিল, তাহা মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। হর্ম্ম্যতলে অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। শৈল চঞ্চল হইল, একবার বেদিতে বসিয়া ইতস্ততঃ দেখে বা দেখিতে চেষ্টা করে, আবার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পদচারণ করে। এইরূপ করিতে করিতে ঘোর অন্ধকার হইল; শেষ শৈল বেদিতে শয়ন করিয়া, যেন অন্ধকারে ডুবিয়া রহিল, আর কোন শব্দ করিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্র প্রভাত হইল; তখনও শৈল হস্তোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে; গবাক্ষদ্বারের দিকে চাহিয়া প্রভাতালোক দেখিতেছে; অনাহারে বড় দুর্ব্বল হইয়াছে,

উঠিতে আর বড় ইচ্ছা নাই,উঠিয়াই বা আর কি করিবে। শৈল নিশ্চয় করিয়াছিল যে, রাত্রে সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে এই ঘর হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে বা অব্যাহতি দিবে; কিন্তু তাহা ত হয় নাই, রাত্র প্রভাত হইয়াগিয়াছে, সন্ন্যাসী ত আইসে নাই। শৈল একবার ভাবিল, "হয় ত সন্ন্যাসী রাত্রে আসিয়াছিল, আমি নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম, তাহার আগমন শব্দ শুনিতে পাই নাই।" আবার ভাবিল, "যদি সন্ন্যাসী সত্য সত্যই আসিত তাহা হইলে অবশ্য শব্দ দ্বারা আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিত। নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী আইসে নাই। কেন আইসে নাই? আমাকে এইখানেই রাখা তাহার অভিপ্রায়, আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। আমি তবে কয়েদী। আমি তবে আর ইচ্ছা করিলে এই ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না। আমাকে এই খানেই থাকিতে হইবে। কত দিন থাকিতে হইবে? তাহার ও নিশ্চয় কি?"

এই সময় একটি গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিক্‌টিকী গবাক্ষ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। টিক্‌টিকী হেলিয়া দুলিয়া দুই এক পদ যায় আবার মাথা তুলিয়া দেখে; এই রূপে গৃহগোধিকা প্রাচীর দিয়া অবতরণ করিতে লাগিল। শৈলের ইহা অসহ্য হইল, বেদি হইতে লম্ফ দিয়া শৈল টিক্‌টিকীকে আঘাত করিল। টিক্‌টিকী ভূমিতলে পড়িয়া চীৎ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। শৈল তখন তাহাকে পদতলে দলিত করিয়া বলিল "কেমন এখন ইচ্ছামত যাতায়াত কর। আমি কয়েদী আর এই সামান্য টিক্‌টিকী স্বাধীন! ইচ্ছামত এই ঘরে গতায়াত করে! এই ঘর আমাকে আবদ্ধ করিল কিন্তু এই পোড়া ক্ষুদ্র জন্তুকে কয়েদ করিতে পারিলনা! যত যন্ত্রণা আমারই জন্য ছিল।"

এই বলিয়া শৈল পুনরায় বেদিতে আসিয়া বসিল। টিক্‌টি-

কীর ছিন্ন লাঙ্গূল স্বতন্ত্র স্থানে পড়িয়া নাচিতেছিল, শৈল বেদিতে বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। ক্রমে লাঙ্গূল নির্জ্জীব হইয়া ভূমে পড়িয়া রহিল। শৈল তখনও সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সময় দক্ষিণ দিকের দ্বার মুক্ত হইল। শৈল প্রথমে জানিতে পারে নাই, পরে একটা শব্দ হইলে শৈল সেই দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল পূর্ব্বদিনের মত ঐ ঘরে সকল প্রস্তুত রহিয়াছে। অতএব শৈল সেই দিকে উঠিয়াগিয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিল। পরে দেখিল অন্নের পরিবর্ত্তে ফল মূল দুগ্ধাদি প্রস্তুত রহিয়াছে, আর ইতস্তত করিল না। আহারান্তে অপর গৃহে যাইয়া দেখে বেদিতে কে উত্তম শয্যা রচনা করিয়া গিয়াছে আর তথায় দুই একখানি পুস্তক এবং লিখিবার উপকরণ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু শৈল লিখিতে পড়িতে জানিত না, অতএব শৈল গ্রন্থাদি সযত্নে নামাইয়া হর্ম্ম্যতলে রাখিল। একবার মনে মনে ভাবিল "যদি আমি লিখিতে পড়িতে জানিতাম তবে এই নির্জ্জন স্থানে এক প্রকার সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। আর কিছুই না হউক, আমার যন্ত্রণা লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু তাহা লিখিয়াই বা ফল কি হইত? কে তাহা পড়িতে পাইত, পাইলেই বা কে তাহা যত্ন করিয়া পড়িত? শৈল কি কষ্ট পাইয়াছে তাহা জানিবার জন্য কাহার মাথা ব্যথা পড়িয়াছে? আমাকে কে ভাল বাসে যে, আমার যন্ত্রণার নিমিত্ত যন্ত্রণা পাইবে? যে আমায় নির্ব্বোধের মত ভাল বাসিত সে গিয়াছে! আর আমায় কে ভাল বাসে, আমিও কাহারে ভাল বাসি? আমি কেন ভাল বাসিব? কাহার কোন্ গুণে ভাল বাসিব? পাড়ার লোক ভাল খায় কি ভাল পরে, তাহাতে আমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি? তাহাদের ভাল মন্দে আমার কি সুখ? আমি কাজেই তাহাদের

কথায় থাকি না, তবে পাড়ার লোকে কেন আমার মন্দ করিতে যায়? লোকের কি মন্দ স্বভাব! আমি যদি কাহার মন্দ করিয়া থাকি তাহা আমার নিজের করিয়াছি, আমার পতির করিয়াছি, সে ত আমার আপনার; তাহাতে লোকের কি মাথাব্যথা পড়িয়াছে! তোরা যে আমায় কয়েদ করিস, কি বলে? আমি যে এই কয় মাস অন্নবিনা মরিতে বসিয়াছিলাম, কই, তোরা কি কেহ, তখন একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলি? সে সময় আমায় কাহারও মনে হইল না; আর এখন কয়েদ করিবার সময় মনে পড়িল। আরে কলি! আমায় যে কয়েদ করিল, যে এই যন্ত্রণা দিল, যদি ঈশ্বর সত্যের হন, তবে তারে ইহার প্রতিফল পাইতেই হবে। কয়েদ আর আমাকে কে করিবে, সেই পোড়ার মুখো গোপাল বাবু করিয়াছে! এসকল তাহার কর্ম্ম। ভাল! আমার এমন দিন থাকিবে না! আমিও দিন পাব, তখন যেন গোপাল বাবুর স্ত্রী গোপাল বাবুকে বাঁচায়।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু কয়েদী, জেলখানায় হাসিয়া গীত গাইয়া ঘানি ফিরাইয়া দিনপাত করিতেছে। রামদাস সন্ন্যাসী কি মোহান্তের সম্মুখে শম্ভু যেরূপ গম্ভীর, শৈলের সম্মুখে যেরূপ ভয়ানক জেলখানায় তাহার কোন চিহ্নও দেখা যায় না। শম্ভু ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, আপনি হাসিতেছে, সকলকে হাসাইতেছে। জেলখানায় শম্ভু যেন আরএক প্রকৃতির ব্যক্তি।

কোন্ কয়েদীর কি কর্ম্মনির্দ্দিষ্ট আছে শম্ভু তাহা সকলই জানিত; আবার কোন্ কয়েদী নিজ কর্ম্মে অপটু তাহাও শম্ভু জানিত। সর্ব্বদাই শম্ভু তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া কর্ম্ম দেখাইয়া

দিত, গল্প করিয়া তাহাদের শ্রান্তি দূর করিত, আবার সময়ে সময়ে তাহাদের কর্ম্ম আপনি লইয়া আশ্চর্য্য কৌশলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমাপন করিয়া দিত। শম্ভুকে তাহারা সকলেই ভাল বাসিত, শম্ভুও তাহাদের ভাল বাসিত। কোন্ কথায় কোন্ কয়েদীর মনোবেদনা হয় তাহা শম্ভু জানিত, আবার কোন্ কথায় কে সুখী হয় তাহাও শম্ভু জানিত। অতএব কয়েদীদিগের উপর শম্ভুর একাধিপত্য হইয়াছিল। তাহাদের বিপদে শম্ভু পরামর্শী; সম্পদে শম্ভু সুখভাগী। যাহারা খালাস হইত, শম্ভু তাহাদের গোপনে অর্থদান করিত, সদুপদেশ দিত। যাহারা খালাস হইবে তাহারা গৃহে যাইয়া কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে তাহা শম্ভুর সহিত পরামর্শ করিত। কয়েদীর মধ্যে কেহ গৃহসম্বাদ না পাইয়া ব্যস্ত হইলে শম্ভু তাহাকে সম্বাদ আনিয়া দিয়া সান্ত্বনা করিত, কখন কখন কয়েদীদিগের পুত্ত্রগণকে আনিয়া ব্যথিত পিতার ক্রোড়ে সমর্পণ করিত। যে ব্যক্তি অতি বিমর্শ সেও শম্ভুর যত্নে হৃষ্ট হইত, শম্ভুর গুণে সকলেই শম্ভুর বশতাপন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু কয়েকটি দায়মালী কয়েদী সম্বন্ধে শম্ভু কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ ছিল। তাহাদের সহিত শম্ভু আলাপ করিতে গেলে তাহারা বৈরক্তি প্রকাশ করিত; তাহারা দূরে থাকিয়া শম্ভুর প্রতি ঈর্ষা ভাবে কটাক্ষ করিত। শম্ভু কোন কারণ অনুভব করিতে পারিত না কোন প্রকারে তাহাদের উপকারও করিতে পারিত না।

মনুষ্য যতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হউন, কেহ না কেহ তাহার বিদ্বেষ করে; মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই তাহার বিদ্বেষ করে। পরোপকার যেমন কাহার কাহার স্বভাবসিদ্ধ, বিদ্বেষও সেইরূপ কাহার কাহার স্বভাব সিদ্ধ। যাহারা শম্ভুর বিদ্বেষী তাহারা এক দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে একত্রে দাঁড়াইয়া জেলখানার প্রাচীর সম্বন্ধে

তর্ক বিতর্ক করিতেছিল। কেহ বলিতেছিল, প্রাচীর ১২হাত উচ্চ হইবে, কেহ বলিতেছিল, এত হইবে না। এই সময় আর এক-জন ক্ষুদ্রকায় কয়েদী সেই স্থানদিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিল, "প্রাচীর যত হাত উচ্চ হউক ইহা কেবল শম্ভু পার হইতে পারে, আর কাহারও কর্ম্ম নহে।" এই কথায় দায়-মালীরা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া ক্ষুদ্রকায় কয়েদীকে আক্রমণ ক-রিতে গেল, কিন্তু ক্ষুদ্রকায় অতি চতুর, হাসিতে হাসিতে বিদ্যু-দ্বেগে পলায়ন করিল। দায়মালীরা ইহার প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শম্ভুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। শম্ভু তখন জেলদারগার নিকট বসিয়া কাথা বার্ত্তা কহিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে যে উদ্‌যোগ হইতেছিল তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। শম্ভু হাসিয়া জেলদারগাকে বলিল, "আমি কয়েদী না হইলে আপনার সঙ্গে বিলাত যাইতাম।" জেলদারগা বলিল, "আমা-রও বড় সাধ যে একবার তোমাকে আমাদের দেশে লইয়া যাই।"

শ। আমাকে লইয়া যাইতে আপনার সাধ কেন?

জে। বিলাতে সকলের বিশ্বাস আছে যে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল, একবার তোমাকে দেখিলে তাহারা আশ্চর্য্য হইবে।

শ। যাহারা সমুদ্র দেখে নাই, তাহাদের এক বিন্দু জল হিমালয় হইতে লইয়া দেখাইলে কি হইবে? আমরা দুর্ব্বল সত্য, আমি বলবান্ প্রতিপন্ন হইলে বাঙ্গালির দুর্নাম যাইবে না। প্র-ত্যেক বাঙ্গালি যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, পরস্পরের সমষ্টিতে সমুদ্রবৎ হইতে পারে। তাহা হইলে আমাদের কলঙ্ক ঘুচিবে।

জে। কেবল সমষ্টিতে হইবে না; সাহস আবশ্যক।

শ। ভয় আর সাহস এই দুই কথা যত প্রভেদ বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে আমার ততটা বিশ্বাস নাই। আমাদের বাঙ্গা-

লিকে ভীরু বলিয়া কখন আমি নিন্দা করি নাই। বাঙ্গালিপ্রণয়ী, বাঙ্গালি অন্যের নিমিত্ত এদেহের বোঝা বহিয়া বেড়ায়,তাহাতেই মরিতে চাহে না,তাহাতেই মরিতে ভয় পায়। বাঙ্গালি ভাবে আমি গেলে আমার স্ত্রীর দশা কি হইবে? ইংরেজ ভাবে আমি গেলে আমার স্ত্রী বিবাহ করিবে, ভাবনা কি? ভয় ও সাহসের মূল কেবল এই।

এই সময় জনেক প্রহরী আসিয়া বলিল, সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। কয়েদীরা শম্ভুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে।

জেলদারগা জিজ্ঞাসা করিল, কেন অপেক্ষা করিতেছে? প্রহরী কোন উত্তর দিতে না দিতেই শম্ভু বলিল, "আমি ব্রাহ্মণ এইজন্য আহারের পূর্ব্বে অনেকেই আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করে। অতএব অনুমতি হয় ত আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

জেলদারগা সম্মান পুরঃসর শম্ভুকে বিদায় দিলে শম্ভু অন্যমনস্কে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল, এই সময় অন্ধকারে একজন অপরিচিত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া শম্ভুর কর্ণে বলিল, "সাবধান।" শম্ভু ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পূর্ব্বরূপ সোপান অবতরণ করিতে লাগিল, "সাবধান" শব্দের কোন অর্থ বুঝিতে পারিল না। উদ্যানে উপস্থিত হইবার সময় শম্ভু আর একবার শুনিল, "সকল প্রস্তুত।"

এই সময় জেলদারগা আপনার ভোজন গৃহ হইতে মহাকলরব শুনিতে পাইলেন, ক্রমে সেই কোলাহল ভয়ানক হইয়া উঠিল, জেলদারগা ব্যস্ত হইয়া গৃহ-বহির্গত হইলেন, কিন্তু প্রহরীদিগের ছুটাছুটি দেখিয়া একটু দাঁড়াইলেন। যাহারেই জিজ্ঞাসা করেন কেহই উত্তর দেয় না, সকলেই উদ্যানের দিকে দৌড়িতেছে। জেলদারগা সোপান অবতরণ করিয়া অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল দেখিলেন উদ্যা-

নের মধ্যস্থলে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, চারি পার্শ্বে কতক গুলা লোক দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আর দূরে দুই একটা মশালের আলোক ছুটিতেছে।

এই সময় জেলদারগার মেম আসিয়া সাহেবের হস্তে তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র দিল, জেলদারগা সত্বর সসজ্জ হইয়া যাইতে যাইতেই গোলমাল থামিয়া গেল। একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, শম্ভু কয়েদী খুন হইয়াছে।

রাত্র প্রহরেক সময় ডাক্তার সাহেব তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিলেন যে শম্ভু কয়েদীর অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। কে তাহাকে খুন করিল তদন্তে তাহার কোন প্রমাণ হইল না। মেজেষ্টার সাহেব স্বয়ং আসিয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। দুই এক দিবসের মধ্যে জেলদারগা পদচ্যুত হইলেন। অযোগ্যদোষ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত তিনি পুনঃ পুনঃ জানাইলেন যে প্রহরিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া অপর কোন ব্যক্তির মৃতদেহ আনিয়া জেলখানায় ফেলিয়াছিল; শম্ভু কয়েদী মরে নাই, পলাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার একথা কর্তৃপক্ষ কেহ বিশ্বাস করিলেন না, প্রত্যুত্তরে জেলদারগাকে বলা হইল যে একথা সত্য হইলেও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, যে জেলখানা হইতে কয়েদী পলাইতেপারে তাহার দারগা অযোগ্য। অগত্যা একদিন অপরাহ্নে জেলদারগার মেম আপনার শয়ন গৃহ ত্যাগ করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে স্বামীর সঙ্গে গাড়িতে উঠিলেন।

গাড়ওয়ান কোচ বাক্স হইতে টিট কিরি দিয়া ঘোঁড়া চালাইতে লাগিল, ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। জেলদারগা গলায় কম্‌ফোর্টর জড়াইয়া ক্রোড়ে একটি সন্তানকে বসাইয়া, জেলখানার দিকে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে চলিলেন। যতক্ষণ জেলখানা দেখা গেল ততক্ষণ আপ-

নার স্ত্রীর প্রতি না চাহিয়া কি অন্য কাহার সহিত কথা না কহিয়া কেবল জেলখানার উচ্চ প্রাচীর, কারনিস, রুদ্ধ খড়খড়ি দেখিতে লাগিলেন; যখন আর তাহা দেখা গেল না তখন এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "উনিশ বৎসর আমি ঐ বাটীতে ছিলাম, উনিশ বৎসরের বসবাস সহজে ভুলা যায় না।" এই কথায় তাঁহার মেম আবার কাঁদিয়া উঠিলেন, জেলদারগার বক্ষে মাথা রাখিয়া সজল নয়নে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন "আমার এই সন্তান সন্ততিদিগের উপায় কি হইবে? তুমি কেন শম্ভু কয়েদীকে বিশ্বাস করিয়াছিলে? বাঙ্গালি অবিশ্বাসী চিরকাল; এখন দেখ দেখি সে তোমার কি দশা করিল।"

জেলদারগা বলিলেন যে "যাহা বলিতে চাহে বলুক কিন্তু শম্ভু যে অবিশ্বাসী এ কথা আমি শুনিব না। তোমার কি স্মরণ নাই কত দিন শম্ভু জেলখানা হইতে রাত্রে চলিয়া গিয়াছে আবার রাত্র প্রভাত না হইতে হইতেই জেলখানায় আসিয়াছে। পলাইবার যদি তাহার ইচ্ছা থাকিত তবে অনায়াসেই সেই সময় পলাইতে পারিত অতএব শম্ভু পলায় নাই, মরিয়াছে নিশ্চয়; তবে যে তাহার মৃতদেহ কেন পাওয়া গেল না, তাহা বলিতে পারি না। প্রহরীরা যে মৃতদেহ শম্ভুর বলিয়া এজাহার দিল, সে দেহ শম্ভুর নহে, অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তির হইবে। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ কিরূপে জেলখানায় আসিল, কেনই বা ঐ দেহ শম্ভুর বলিয়া প্রহরীরা পরিচয় দিল, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে রাত্রে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা যেন সকলই ভোজবাজি বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এই সময় হঠাৎ গাড়ি থামিল। জেলদারগা গাড়ি হইতে মাথা বাহির করিয়া দেখিলেন, যে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ তাঁহার

দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর একজন পথিপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র বনমধ্যে লুক্কায়িত ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। অস্ত্রধারীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া জেলদারগা একটি পিস্তল হস্তে তুলিতেছেন দেখিয়া তাহার মেম ভয়ে ক্রোড়স্থ শিশুকে বক্ষোপরে টিপিয়া ধরিলেন, শিশু চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সময় অস্ত্রধারী পুরুষ সাহেবকে ছেলাম করিয়া একখানি পত্র দিল; পত্রখানি এই—"মহাশয়ের পদচ্যুতি সম্বাদ শুনিয়া শম্ভু কয়েদীর কোন বিশেষ আত্মীয় এই পত্রমধ্যে লক্ষটাকার নোট পাঠাইতেছেন। তাঁহার আন্তরিক প্রত্যাশা যে আপনি এক্ষণে জেলদারগাগিরি পদের আর আকাঙ্ক্ষা করিবেন না।" জেলদারগা জিজ্ঞাসা করিলেন, এপত্র কে পাঠাইয়াছে, অস্ত্রধারী বলিল, "সে কথা বলিতে নিষেধ আছে।"

জেলদারগা একে একে নোট গণিতে লাগিলেন। গণনা সমাধা হইলে মস্তক তুলিয়া দেখিলেন অস্ত্রধারী পুরুষ আর সেখানে নাই; জেলদারগা তৎক্ষণাৎ গাড়ি হইতে লম্ফ দিয়া বনের দিকে ছুটিলেন। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন এক দীর্ঘাকার পুরুষ অস্ত্রধারীর সহিত অস্পষ্টস্বরে কি কথা কহিতেছে। জেলদারগা তাহাকে শম্ভু বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ হইতে যাইয়া হঠাৎ সবলে ধরিলেন, এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শম্ভু তুমি অবিশ্বাসী, তুমি জেল হইতে পলাইয়াছ, আমি তোমাকে ছাড়িব না, গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইব, তোমার নিমিত্ত আমি অপমানিত হইয়াছি।"

দীর্ঘাকার পুরুষ ভ্রূকুটী করিয়া সাহেবেরদিকে ফিরিলে সাহেব বুঝিলেন, যে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে, এব্যক্তি শম্ভু নহে। জেলদারগা অপ্রতিভ হইয়া শম্ভুর বার্ত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু অপরিচিত পুরুষ কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড। পৌষ ১২৮১। ৯ সংখ্যা।

বঙ্গে দেবপূজা।

প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর!

বঙ্গে দেবপূজা সম্বন্ধে গত কার্ত্তিক মাসের ভ্রমরে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, অগ্রহায়ণ মাসের ভ্রমরে বঃ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদ সম্পূর্ণ না হউক, বঃ অনেকগুলি কথা মহানুভবের ন্যায় বলিয়াছেন; বঃ বুদ্ধিমান্ এই জন্য আর দুই একটি কথা শুনিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু ভ্রমরের পাঠক বর্গ কি বলিবেন জানি না; বোধ হয় এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা তাঁহাদের ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধের কথা চিরকাল হইয়া আসিতেছে, কখন পুরাতন হয় নাই, এই সাহসে দুই চারিটি কথা উত্তরচ্ছলে বলিতে চাহি।

বঃ বলিয়াছেন, "সাকার নিরাকার মধ্যে যেটি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা সেইটিই প্রচলিত হওয়া উচিত। যদি সাকার পূজাই

প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা হয় তবে তাহার সহস্র অনুপকার থাকিলেও তাহা অবলম্বনীয়। আর যদি তাহা না হইয়া নিরাকার প্রকৃত ঈশ্বর স্বরূপ হয় তবে সাকার পূজা লুপ্ত হওয়াই উচিত। ইহার কারণ সত্য ভিন্ন অসত্যে কখন মঙ্গল নাই। সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই শুভ, সত্যই বাঞ্ছনীয়," ইত্যাদি। এখন জিজ্ঞাসা করি, এ অবস্থায় কোন্‌টি অবলম্বনীয়? সাকার উপাসনা? না, নিরাকার উপাসনা? যেটি প্রকৃত সেইটি যদি অবলম্বনীয় হয়, তবে কোন্‌টি প্রকৃত তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক, তাহা না করিলে সাকার উপাসনা যে অবলম্বনীয় নহে, সেকথা স্থির হইল না। কিন্তু এ মীমাংসা না করিয়া বঃ সাকার পূজার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা অনর্থক হইয়াছে।

বঃ বলিয়াছেন, যে "কোন্‌টি প্রকৃত উপাসনা তাহা আমি মীমাংসা করিব না। বুঝি বিচার করিতে গেলে দুইয়ের একটিও টিকিবে না।" এই কথার সামান্যতঃ অর্থ এই যে সাকার নিরাকার দুইয়ের একটিও প্রকৃত নহে; অথবা, মীমাংসা করিতে গেলে দুইটীই অপ্রকৃত স্থির হইবে। যদি তাহা হয়, তবে বঃ কেন নিরাকার উপাসনার পোষকতা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন? যে স্থলে দুইটিই অপ্রকৃত বলিয়া তাঁহার বোধ আছে, সেস্থলে একটি উপাসনাকে উপহাস করিয়া অপরটির আদর করিবার তাৎপর্য্য কি?

বঃ বলিয়াছেন, "বিশ্বাসের দার্ঢ্য থাকিলে সাকার নিরাকারে কোন প্রভেদ নাই।" যদি কোন প্রভেদ নাই, তবে আবার প্রতিবাদ কেন? সাকার উপাসনাকে "উপধর্ম্ম" বলিয়া আবার উপহাস কেন?

বঃ যাহাই বলুন, নিরাকার ঈশ্বরসম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস অধিক, ইহা তিনি স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর যে নিরা-

কার তাহার তিনি কি প্রমাণ পাইয়াছেন? বোধ হয় সে প্রমাণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের "তুলটে" বা সাহেবদিগের "ছাপায়" বরাত দিবেন না। যদি তাহা না দেন, তবে আর কোথা হইতে প্রমাণ দেখাইবেন? "তুলট" আর "ছাপা" ব্যতীত ঈশ্বরের নিরাকার সম্বন্ধে আর কোথায়ও প্রমাণ নাই। যাহা নিরাকার তাহা কেহ দেখে নাই, তবে বলিবে প্রত্যক্ষ একমাত্র প্রমাণ নহে; শব্দ, উপমিতি, অনুমিতি প্রভৃতি প্রমাণের অনেক পথ আছে, তাহার মধ্যে অনুমিতি অবলম্বন করিলেই নিরাকার ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে। তাহার পর "ঘটত্ব," "পটত্ব" এই সকল ন্যায় শাস্ত্রের পুরাতন কথা আসিয়া পড়িবে, তাহাও আমরা এক প্রকার অনুভব দ্বারা জানিতে পারিতেছি। কিন্তু অনেক পাঠক তর্কে ভুলিবার নহেন, তর্ক শাস্ত্রে কখন নিরাকারত্ব সপ্রমাণ হয় নাই। হইয়া থাকিলেও তাহা এক্ষণে অগ্রাহ্য। পূর্ব্বকালে কোন বিষয় স্থির করিতে হইলে ন্যায়ের আশ্রয় লইতে হইত; এক্ষণে ন্যায়ের "তামাদি" ঘটিয়াছে। এক্ষণে কোন বিষয় স্থির করিতে গেলে পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান শাস্ত্র অবলম্বন করেন। বঃ বলুন দেখি, কোন্ পণ্ডিত বিজ্ঞানবলে ঈশ্বরকে নিরাকার স্থির করিয়াছেন? যদি কেহ করিয়া থাকেন, বা তাহা করিবার কোন উপায় থাকে, তবে আমরা, সাকারবাদী বাঙ্গালিরা, সকলে একত্র হইয়া, দশভুজা, চতুর্ভুজা, দ্বিভুজা, শালগ্রামশিলা পর্য্যন্ত এই আগামী মাঘী পূর্ণিমায় সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিব। তাহা দেখিবার জন্য সেই দিন যেন বঃ একবার সমুদ্রকূলে দাঁড়ান; দৃশ্য বড় মন্দ হইবে না, চট্টগ্রাম হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত অর্দ্ধচক্রবৎ সমুদ্রের একটি বাঁকে অন্যূন ত্রিংশৎকোটী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে স্ব স্ব গৃহদেবতা আনিয়া দাঁড়াইবে। সহস্র সহস্র বৎসরের

দেবপূজা, বিসর্জ্জন হয় দেখিয়া সমুদ্র শিহরিয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে, বায়ু ছুটিয়া পলাইবে, চন্দ্র সূর্য্য আকাশে কাঁপিবে আর দুই এক জন নিরাকারবাদী অকূল সাগরে তৃণ অবলম্বন করিয়া হাসিবে।

পাঠকের নিকট ক্ষমা চাই, আমার কল্পনা শক্তি দড়ি ছিঁড়িয়াছিল। কি বলিতেছিলাম? ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রমাণের কথা। ঈশ্বর যে নিরাকার ইহা বিজ্ঞান বিদ্যা বা কোন বিদ্যা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না; হইতে পারে না। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে বঃ যে বলিয়াছেন "যেটি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা সেইটিই প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতেই মঙ্গল, তাহাতেই শুভ," এ সকল কথা নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে আর খাটে না। যাহা সত্য তাহা মঙ্গলদায়ক, একথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু যে বিষয়ের সত্যত্ব অনিশ্চিত সে বিষয়ে বঃ কি বলিবেন? ঈশ্বর যে নিরাকার একথা অনিশ্চিত, ইহার কোন প্রমাণ নাই। কেবল সত্যই যদি বাঞ্ছনীয় হয় তবে কাজেই নিরাকার উপাসনা আর বাঞ্ছা করা যাইতে পারে না।

আর; বঃ বলিয়াছেন "সত্য ভিন্ন অসত্যে কোন মঙ্গল নাই সত্যই শুভ" একথা সকল বিষয়ে, অন্ততঃ ধর্ম্মবিষয়ে খাটে কি না সন্দেহ। ইংলণ্ডীয় কোন মহানুভব একথার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

It is not enough to aver, in general terms, that there never can be any conflict between truth and utility; that if religion be false, nothing but good can be the consequence of rejecting it. For, though the knowledge of every positive truth is an useful acquisition, this doctrine cannot without reservation be applied to negative truth. When the only truth ascertainable is that nothing can be known, we do

not, by this knowledge, gain any new fact by which to guide ourselves; we are at best, only disabused of our trust in some former guide mark, which, though itself fallacious, may have pointed in the same direction with the best indications we have, and if it happens to be more conspicuous and legible may have kept us right when they might have been overlooked. *Utility of Religion by John Stuart Mill.*

ঈশ্বর যে নিরাকার তাহা জানা যায় না; তাহা জানিবার নহে। "তাহা জানিবার নহে" কেবল এই কথা সত্য। এই সত্যই কি শুভ? কেননা বঃ বলিয়াছেন "সত্যই শুভ।" তাহা হইলে সাকার উপাসনাতেও শুভ আছে, কেননা ঈশ্বরের আকার "জানিবার নহে" এসত্য সাকারবাদেও বলিতে পারা যায়।

সাকার পূজার সম্বন্ধে বঃ কতকগুলি দোষ দেখাইয়াছেন; প্রথমতঃ বলিয়াছেন "সাকারধর্ম্ম বিজ্ঞানবিরোধী। যেখানে সাকারধর্ম্ম প্রচলিত সেখানে জ্ঞানের উন্নতি হয় না। সেখানে সকল প্রশ্নের এক উত্তর "দেবতায় করেন্।" জিজ্ঞাসা করি এ দোষ কি নিরাকার ধর্ম্মে সম্ভবে না? "দেবতায় করেন্" এই কথা সাকার ধর্ম্মে যেমন সকল প্রশ্নের উত্তর, সেইরূপ, "ঈশ্বর করেন্" এই কথা নিরাকারধর্ম্মে সকল প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে, হইয়া থাকে। অতএব কেবল সাকার পূজা জ্ঞানোন্নতির কণ্টক নহে, ধর্ম্ম মাত্রই বিজ্ঞানবিরোধী। বঃ বলিয়াছেন "যাঁহারা কিছু জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন, সকলেই নিরাকারবাদী ছিলেন।" বঃ যদি এইসকল ব্যক্তির নাম করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। আর কিছুই না হউক, তাঁহারা সাকারবাদী কি নিরাকার বাদী ছিলেন, অথবা নাস্তিক ছিলেন তাহা আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতাম।

বঃ আর একটি দোষ দেখান যে "সাকার পূজা স্বানুবর্ত্তিতার বিরোধী।" কেন? বোধ হয় বঃ আমাদের কতকগুলি ব্যবহার আর তাহার কঠিন কঠিন গ্রন্থি দেখিয়া মনে করিয়াছেন এসকল কেবল সাকার পূজার দোষ। সাকার ধর্ম্মমতাবলম্বী অন্য দেশের অবস্থা প্রথমে দেখা উচিত। তাহার পর, নিরাকার ধর্ম্মমতাবলম্বী যদি কোন দেশ থাকে তবে তাহার অবস্থা বিচার করা কর্ত্তব্য। যদি বঃ এরূপ করিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় বলিতেন যে ধর্ম্ম মাত্রই স্বানুবর্ত্তিতার বিরোধী, কেবল সাকার ধর্ম্ম একা নহে।

বঃ তৃতীয় দোষ এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে সাকারপূজা সমাজের গতিরোধ করে। কিন্তু কেন করে তাহা তিনি বলিবার সাবকাশ পায়েন নাই; আমরাও তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, মিসর রাজ্য, রোমক রাজ্য, যুনানী রাজ্য প্রভৃতি সকল দেশেই সাকার পূজা ছিল অথচ এইসকল দেশই উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শেষ, বঃ স্বীকার করিয়াছেন যে সাকার পূজায় একটি গুরুতর লাভ আছে, সাকারপূজা কাব্যের অত্যন্ত পুষ্টিকর; বঙ্গদেশে সাকার পূজার ফল বৈষ্ণবদিগের গীতিকাব্য ইত্যাদি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ইহার কারণ কি, বঃ তাহা বলিতে পারেন? তাহা বলিতে গেলে অন্য কারণ মধ্যে এই একটি কারণ তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে সাকার পূজায় "ভক্তি, প্রীতি, প্রণয়" প্রভৃতি মনোবৃত্তি কিঞ্চিৎ বিশেষ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত এবং পরিপুষ্ট হয়। কেনই না হইবে? সাকার পূজায় আশৈশব এই সকল বৃত্তির চালনা হইতে আরম্ভ হয়, নিরাকার পূজায় তাহা হইতে পায় না। সাকার উপাসকের সন্তান সম্মুখে দেবতা দেখে, শৈশবেই ভক্তি অঙ্কুরিত হয়; নিরাকার উপা-

সকের সন্তান ঈশ্বর দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে না, তাহার ভক্তির অঙ্কুর অনেক বিলম্বে হয়।

আর একটি বিশেষ কথা আছে; সাকার দেবতাদিগের দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতির অতি মনোহর গল্প আছে; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাহা একাগ্রমনে শুনে, কখন নিপাড়িতের নিমিত্ত নয়নাশ্রু মুছে, আবার দেবতাকর্ত্তৃক তাহার উদ্ধার হইল শুনিয়া আহ্লাদে পরিপূরিত হয়। দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি হইতে থাকে। তাহার আপনার বিপদে দেবতা উদ্ধার করিবেন এমত বিশ্বাস জন্মিতে থাকে। নিরাকার উপাসকের সন্তান এ শিক্ষা পায় না; তাহার মাতা তাহাকে হয় ত বলিয়া দিলেন যে ঈশ্বর দয়াময়, বিপদে রক্ষা করেন। ঈশ্বর কিরূপে কোন্ বিপদ হইতে কাহাকে রক্ষা করিয়াছেন এসকল কথা গল্পচ্ছলে না শুনিলে বালকদিগের দয়া, ভক্তি, প্রণয় এসকলের উদ্দীপন হয় না। বঃ বলিবেন যে নিরাকার উপাসকদিগের সন্তানেরা পরস্পর মাতার নিকট অনেক নীতি কথা, অনেক গল্প শুনিয়া থাকে। তাহা হইতে পারে; কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরসম্বন্ধে কোন গল্প নাই। ঈশ্বরের গল্প শুনিলে বালকদিগের যেরূপ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রেম হইত গল্প না শুনিলে ততটা হয় কি না বঃ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এ বিষয়ে সাকারবাদী দিগের প্রথা ভাল, তাহাদের "বাঁদি" গল্প আছে; তাহা অশিক্ষিত মূর্খ স্ত্রীলোকেরাও জানে, তাহাদের সন্তানেরাও তাহা শুনিতে পায়। নিরাকার উপাসক দিগের সেরূপ "বাঁদি" গল্প নাই, তাহাদের সন্তানেরা দয়াদাক্ষিণ্য নীতিগর্ভসম্ভূত গল্প বড় শুনিতে পায় না। তবে যেসকল স্ত্রী লোকেরা সুশিক্ষিত, বা বিশেষ বুদ্ধিমতী, তাঁহারাই সন্তানদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারেন।

কিন্তু এসকল কথা বলা বাহুল্য, বঃ এসকল কিছুই বিচার

করিয়া দেখিবেন না। নিরাকার উপাসনাই ভাল এই কথা বঃ সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইবেন। অথচ নিরাকার উপাসনা যে প্রকৃত এ মত বঃ বিশ্বাস করেন না। সাকার নিরাকার উভয় মত যদি অপ্রকৃত হয়, তবে এখন কোন্‌টি অবলম্বনীয়? এ কথার উত্তর দিতে হইলে প্রথমতঃ ফল দৃষ্টে উত্তর দিতে হইবে। কিন্তু ফল সম্বন্ধে মীমাংসা হয় নাই। সাকার পূজার যে কয়েকটি ফল দেখাইয়াছিলাম, তাহা বঃ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নিরাকার উপাসনার বিশেষ ফল কি তাহা বঃ উল্লেখ করেন নাই। ফলানুসারে উপাসনা যে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা তাঁহার মত নহে। তিনি বলিয়াছেন, "যেটি প্রকৃত সেইটি অবলম্বনীয়। তাহাতে কোন ইষ্ট না থাকিলেও তাহা অবলম্বনীয়।" কিন্তু সত্যাসত্য বিবেচনা করিতে গেলে উভয়ই সমান, অসত্যের ছোট বড় নাই।

কোন্‌ উপাসনা অবলম্বনীয় তাহা স্থির করিতে হইলে ফল ব্যতীত আর একটি দেখা আবশ্যক। কোন্‌ উপাসনা লোকে গ্রহণ করিতে সক্ষম, আপামর সাধারণ লইয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কোন্‌ দেশে কোন্‌ কালে অপর সাধারণ সকলেই নিরাকার উপাসক হইয়াছে? পৃথিবীতে নিরাকার উপাসনা আছে সত্য, কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা অপর সাধারণ সকলেই নিরাকার ঈশ্বর উপাসনা করে, এমত কোন দেশই নাই, এবং কস্মিন কালে ছিল না। সকলে নিরাকার ঈশ্বর অনুভব করিতে পারে না, বলিয়াই নিরাকার উপাসনা কখন প্রচলিত হয় নাই। যদি ঈশ্বরোপাসনা মনুষ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়, তবে সাকার উপাসনাই ভাল। সাকার উপাসনা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী নিরাকার উপাসনা তাহা নহে। যাহাদের সাকার উপাসনায় অভক্তি থাকে তাহারা নিরাকার উপাসনা অবলম্বন করুন্‌

কিন্তু যাহাদের সাকার পূজায় আন্তরিক ভক্তি আছে, তাহাদের লইয়া টানাটানির প্রয়োজন কি ?

বঃ যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অনেক গুলির উত্তর দেওয়া হইল না।

সৎকার।

এক্ষণে এদেশে মৃত্যুর পরেই দেহের সৎকার করা হয়। যে কিছু বিলম্ব হয় তাহা কেবল কাষ্ঠ প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপকরণ আহরণ করিবার নিমিত্ত। কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। শাস্ত্রে বিধি আছে মৃত্যুর পর অন্যূন দ্বাদশ দণ্ড পর্য্যন্ত দেহ রাখিতে হইবে। এই বিধির কোন বিশেষ যুক্তি ছিল, এক্ষণে তাহা আমরা সকলে জানিনা এবং তাহার অনুসন্ধানও করি না। কিন্তু এক্ষণে সেই যুক্তি ইউরোপে আদরিত হইয়াছে।

মৃত্যুর অব্যহিত পরেই দেহের সৎকার না হয় এইরূপ একটি আইন করিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর হইল একবার ফরাসি দিগের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব হয়। তাহাতে অনেকে বলেন যে এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত আইন করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। তদুত্তরে সভাস্থ একজন বৃদ্ধ বলিলেন যে এরূপ আইন সর্ব্বদেশে আবশ্যক, তাহা প্রতীতি করিবার নিমিত্ত একটি অদ্ভুত ঘটনার পরিচয় দিই, আপনারা একটু মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। অন্যূন পঁচিশ বৎসর হইল কোন যুবা পাদ্‌রী একদিন একটি গির্জ্জায় ধর্ম্ম উপদেশ দিতে ছিলেন, বিস্তর লোক সমবেত হইয়া একাগ্র চিত্তে তাহা শুনিতে

ছিল; এমত সময় হঠাৎ পাদরির হাত হইতে বাইবেল পড়িয়া গেল, এবং সেই মুহুর্ত্তে পাদরি স্বয়ংও পড়িয়া গেলেন। নিকটস্থ লোকেরা ছুটিয়া আসিয়া দেখে পাদ্‌রির সংজ্ঞা নাই; পাদ্‌রির মৃত্যু হইয়াছে। তখন সকলে আর কি করে, সে দেহ ধরাধরি করিয়া পাদরির বাটীতে লইয়া গেল এবং গোর দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইত্যবকাশে ডাক্তার সাহেব আসিলেন। আসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া মৃত্যুর কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না; শেষ বলিলেন শব আর শয্যায় ফেলিয়া রাখা বৃথা; সমাধিস্থানে লইয়া যাও। তদনুসারে গোর দিবার বাক্স খাটের নিকট আনীত হইল। তাহার পর যখন বাক্সে শব তুলিবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল তখন একজন বলিল এখন এইরূপ থাকুক, পাদরির সহোদরকে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে তিনি আসিয়া অবশ্য সহোদরের দেহ একবার দেখিতে চাহিবেন। এইকথায় সকলে নিরস্ত হইল এবং অনেকে স্ব স্ব কর্ম্মে চলিয়া গেল।

পাদরির সহোদর প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে কোন গ্রামে থাকিতেন; সম্বাদ পাইবামাত্র অশ্বারোহণে বায়ুবেগে আসিয়া পাদরির গৃহপ্রবেশ করিলেন। সহোদরের শব দেখিয়া অতি কাতর স্বরে 'ভাই আমার' বলিয়া মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিলেন। মৃতদেহ যেন অল্প হস্ত নাড়িল, পরক্ষণেই মৃতদেহ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সহোদরের সহিত কথা কহিতে লাগিল।

পুনর্জ্জীবিত হইয়া পাদরি তখন সহোদরকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই আমি মরি নাই, আমার কেবল শরীর অবশ হইয়াছিল মাত্র। আমি অজ্ঞানও হই নাই, যে যাহা বলিতেছিল তাহা সমুদায় শুনিতেছিলাম। আমায় যখন সকলে ঘরে আনিল তাহাও জানি; তোমায় যখন সংবাদ দিবার নিমিত্ত

লোক গেল তাহাও জানি, ডাক্তার আসিয়া যাহা বলিলেন তাহাও শুনিয়াছিলাম; যখন আমায় বাক্সে বন্ধ করিবার নিমিত্ত বাক্স আনিল তখন আমার বড় কষ্ট হইয়াছিল। তাহারা জানে না যে আমি মরি নাই, আমিও তাহাদিগকে আমার জীবিত অবস্থা জানাইতে পারিতেছি না অথচ দেখিতেছিলাম তাহারা আমাকে বাক্সে বন্ধ করিতে আসিতেছে; আমি না মরিয়াও মরিতে চলিলাম ভাবিয়া সে সময় যে কি কষ্ট হইয়াছিল তাহা কি জানাইব! তখন হস্তপদ নাড়িতে এত চেষ্টা করিলাম কোনমতেই পারিলাম না। এই সময় তোমার আসিবার কথা উত্থাপন হওয়ায় আমার ভরসা হইল, আমি নিশ্চয় জানিতাম তুমি আসিলেই আমি হস্ত পদাদি চালনা করিতে পারিব, তাহা না হয় অন্ততঃ তুমি কোনমতে আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবে। যাহারা এক্ষণে উপস্থিত আছেন, ইহারা তোমার আগমন শব্দ প্রথমে কেহই শুনিতে পায়েন নাই। তোমার আসিবার সময় অতীত হইয়াছে বলিয়া ইহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিলেন, আমি তখন তোমার অশ্বপদধ্বনি শুনিতে পাইতে ছিলাম কিন্তু আমার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।”

বৃদ্ধ এই পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাহার পর পাদরি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিয়া অদ্যাপি জীবিত আছেন। এক্ষণে মহাশয়েরা বিচার করিয়া দেখুন মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেহের সৎকার করা অনুচিত কি না। কেহ কেহ বলিলেন আপনি যে পরিচয় দিলেন তাহা মহাশয় কোথায় শুনিয়াছেন, আমরা জানি না, কিন্তু এই অদ্ভুত ঘটনা যদি মহাশয়ের বিশ্বাস্য হইয়া থাকে তাহা হইলে দেহসৎকার সম্বন্ধে একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। বৃদ্ধ পুনরায় উঠিয়া বলিলেন, “যে পরিচয় দিলাম তাহা আমার

আপনার পরিচয়। যে পাদরির মৃত্যু হইয়াছিল বলিলাম সে পাদরি আমি স্বয়ং, অন্য নহে। আমি যে অদ্য আপনাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এই কথা কহিতেছি তাহা কেবল, আমার সৎকারের বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া, নতুবা আমি, কবে মাটী হইয়া যাইতাম।”

এইরূপ ঘটনা আরও অনেক ঘটিয়াছিল। একবার এক-জন ধনবান্ সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সাহেব অতি সমৃদ্ধি সহ-কারে তাঁহার গোর দেন। যাহারা শববহন করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন অলক্ষ্যে দেখিল যে শবের হস্তে একটি বহুমূল্যের অঙ্গুরি রহিয়াছে এবং তাহা কেহ খুলিয়া লইল না। এই ব্যক্তি লোভপরবশ হইয়া রাত্রিযোগে সমাধিস্থানে আ-সিল। কেহ কোথায় নাই, সকল নিস্তব্ধ, দেখিয়া শববাহক ধীরে ধীরে গোর খনন করিতে লাগিল শেষ শবের বাক্স ভাঙ্গিয়া মৃত ব্যক্তির অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরি মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইল কিন্তু পারিল না। তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া একখানি শাণিত ছুরিকাদ্বারা অঙ্গুলিটি কাটিয়া অঙ্গুরি বাহির করিয়া লইল। কিন্তু অঙ্গুলি কাটিবামাত্র রক্ত নির্গত হইতে লা-গিল, চোর তাহা কিছুই দেখিতে পাইল না, কেবল তাহার বোধ হইল যেন মৃতদেহ একটু নড়িল। চোর প্রথমে ইহা ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া পলায়নোন্মুখ হইল। এই সময় এক দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার কর্ণগোচর হইল। চোর না পলাইয়া বিশেষ পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া যাহা দেখিল তাহা স্ত্রীলোকটীর স্বামীকে যাইয়া বলিল। সাহেব তৎক্ষণাৎ লোক সহকারে তথায় আসিয়া দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী উঠিয়া বসিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে কিন্তু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পারিতেছে না। স্বামী নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন “আমায় শীঘ্র ঘরে

লইয়া চল, আমায় কোথায় আনিয়াছ? এখানে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। আর, আমার অঙ্গুলিতে কিসের আঘাত লাগিয়াছে বড় জ্বলিতেছে। সাহেব এই সকল কথা শুনিয়া নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রিয়তমাকে গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় যত্নে এবং শুশ্রূষায় মেম সাহেব শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিলেন; তাহার পর তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। সম্প্রতি বিলাতে একজন সাহেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার আত্মীয়েরা খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রথানুসারে তাঁহাকে বাক্সে বন্ধ করিলেন। বাক্সে পেরেক মারিয়া তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দিয়া আবৃত করিয়া রাখিলেন। বৈকালে সমাধিভূমিতে লইয়া যাওয়া হইবে, এই সম্বাদ জ্ঞাতি কুটুম্ব ও অন্যান্য আত্মীয় দিগের নিকট পাঠান হইল। আত্মীয়গণ ক্রমে ক্রমে আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন আসিয়াই মৃত ব্যক্তিকে একবার দেখিতে চাহিলেন। কতদিন তাঁহাকে দেখেন নাই, আর কখনও দেখিতে পাইবেন না, এজন্মের মত একবার দেখিতে চাওয়া নিতান্ত অন্যায় নহে বলিয়া সকলেই বাক্স খুলিতে অনুরোধ করিলেন। ছুতার ডাকাইয়া বাক্স খোলা হইল, কিন্তু খুলিয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইল। মৃত দেহ যে পার্শ্বে এবং যে অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল তাহা আর নাই; শব পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া রহিয়াছে, আর তাহার গাত্রবস্ত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিবামাত্র সকলেরই প্রতীতি হইল যে প্রথমে যখন মৃতব্যক্তিকে সমাধি বস্ত্র পরাইয়া বাক্স বন্ধ করা হয় তখন তিনি বাস্তবিক মরেন নাই, মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন, আত্মীয়েরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পর একসময় তাঁহার চেতনা

হইয়াছিল, কিন্তু তখন তিনি বাক্সে বন্ধ; তাঁহার চেতন হইয়াছে একথা তিনি কাহাকেও জানাইতে পারেন নাই, বাক্সও ভাঙ্গিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। নিরুপায় হইয়া যন্ত্রণায় বস্ত্র পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন; শেষ, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া কষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এ অবস্থায় বলিতে হইবে তাঁহার মরণের হেতু তাঁহার আত্মীয়গণ।

আমাদের মধ্যে এরূপ ঘটনা কতই হইয়া থাকে। অল্প দিবস হইল একজন ব্রাহ্মণকে গঙ্গাতীরে আনা হইয়াছিল। তাঁহাকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বৈদ্যেরা কতই তাঁহাকে বিষসেবন করাইল কিন্তু কিছুতেই তাঁহার রক্ষা হইল না। তাঁহার মৃত্যু হইলে আত্মীয়গণ গঙ্গার কূলে মৃত-দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিল। কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া চুল্লী সাজাইল; সকল প্রস্তুত, এমত সময় ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া বৃষ্টি আসিল। আত্মীয়েরা নিকটস্থ বৃক্ষাদির মূলে আশ্রয় লইলেন; বৃষ্টি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হইল, শেষ বৃষ্টি ধরিলে আত্মীয়েরা আসিয়া দেখিল, শব নাই! অনুসন্ধান করিতে করিতে একজন দেখিল যে মৃতব্যক্তি নিকটস্থ একটী বনমধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নিকটে গেলে তিনি বলিলেন যে বৃষ্টিতে আমার বড় উপকার করিয়াছে; বিষে আমার শরীর জরজরীভূত হইয়াছিল, তাহা না জানিয়া সকলে মনে করিয়াছিল, আমি মরিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমার বড় কম্প হইয়াছে আমাকে ঘরে লইয়া চল। তাঁহাকে সকলে গৃহে লইয়া গেলেন। অদ্যাপি তিনি সচ্ছন্দশরীরে আছেন। কিন্তু বৃষ্টি না আসিলে তিনি অনেক কাল ভস্মসাৎ হইতেন।

এই সকল ঘটনা দেখিলে বোধ হয় যে সৎকার করিতে বিলম্ব করা নিতান্ত আবশ্যক; না করায় অনেককে না মরি-

য়াও মরিতে হইতেছে। যাঁহারা দাহ করেন তাঁহাদের এই জন্য সময়ে সময়ে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের পাতকী হইতে হইতেছে, অতএব তাঁহাদের উচিত যে মৃত্যুর পর অন্যূন দ্বাদশ দণ্ড অতিবাহিত না হইলে দাহ করিতে স্বীকার না করেন।

আর, মৃতব্যক্তি যাঁহার পুত্র কি স্ত্রী, তাঁহারও একটু অপেক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যাহার জন্য চিরকাল কাঁদিতে হইবে, যাহার জন্য এ পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে হইবে, সে আবার পুনর্জ্জীবিত হয় কি না, একবার একটু বিলম্ব করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই। বিলম্ব না করায় কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে; কত লোক নির্ব্বংশ হইয়াছে; উন্মত্ত পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহার নিমিত্ত এরূপ হইয়াছে, তাহার সৎকারের সময় হয় ত কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলে তাহাকে ফিরিয়া পাইত। হয় ত সেই সর্ব্বস্ব ধনকে দাহ করিয়াই মারিয়াছে।

জীবিতদিগের দাহ করা যে প্রথা হইয়াছে তাহার মূল কারণ মৃত্যুর চিহ্ন কি, তাহা না জানা। আমাদের বিশ্বাস আছে যে শ্বাসরোধ হইলেই মৃত্যু হইল। এইজন্য লোকে বলে, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।" তাহার পর আশা নাই। কিন্তু এটি মিথ্যা কথা; শ্বাস গিয়াও শ্বাস হয়; ইহা আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি, জানিতেছি; তবে "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" এ কথা আর কেন মুখে আনি। যত শীঘ্র এই মিথ্যা প্রবাদটির লোপ হয় ততই ভাল; ইহাতে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, আর অধিক না হইতে পায়। বরং ইহার পরিবর্ত্তে এই নিম্নলিখিত কথা প্রচলিত হওয়া সঙ্গত—

"যদি যায় শ্বাস, তবু রাখ আশ।"

শ্বাস গেলেও আশা থাকে। অনেক প্রকার বায়ুরোগে

কি মূর্চ্ছারোগে সর্ব্বদাই দেখাযায় শ্বাস থাকে না, অথচ সে রোগীর আবার চেতনা হয়; অতএব শ্বাসরোধ কোনমতেই মৃত্যুর চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। স্পন্দনরহিতও মৃত্যুর পরীক্ষা নহে। শ্বাসরহিত হইলেই স্পন্দনরহিত হয় এবং সেই সঙ্গে নাড়ীও নিশ্চল হয়।

মরণের যে পরীক্ষা কি, তাহা এপর্য্যন্ত স্থির হয় নাই; যে স্থির করিতে পারিবে, সে বিশেষ পারিতোষিক পাইবে, বিলাতে এমত প্রস্তাবনা আছে। কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারে নাই। মূল কথা যে স্থলে মৃত্যুর কোন পরীক্ষা নাই সে স্থলে সৎকার করিতে বিলম্ব করাই ইহার পরীক্ষা।

কিন্তু কত বিলম্ব করা উচিত? বিজ্ঞ ডাক্তারগণ বলিবেন অন্যূন দশ ঘণ্টা বিলম্ব করা উচিত। কিন্তু বোধ হয় এত বিলম্বে অনেক আত্মীয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে; অতএব আমাদের শাস্ত্রে যে দ্বাদশ দণ্ডের বিধান আছে, তাহাই আপাতত ভাল; এই বিধান রক্ষা হইলে অনেকের ভরসা হয়।

আর একটি কথা আছে। কেবল সৎকারের বিলম্ব করিলেই হইল এমত নহে; মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইলে তাহাকে দানব পাইয়াছে বলিয়া হত্যা না করা হয়। এবিষয়ের একটি ঘটনা এস্থলে লিখিত হইল। একজনের দ্বাবিংশতি বর্ষের এক সন্তান মরিলে যথানিয়মে তাহার সৎকারের আয়োজন হইতেছিল, এমত সময় মৃতদেহ মুখের কাপড় খুলিয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল। রাত্রি অন্ধকার, নিকটে নদীর কল্লোল শুনিতে পাইয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মৃতব্যক্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। শবকে বসিতে দেখিয়া সকলে ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া পলাইল, কেবল একজন মাত্র দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার জানা ছিল, যে নক্ষত্রদোষ হইলে শবকে দানবে পায়, কিন্তু লৌহ

দানবের পক্ষে মহৌষধি। অতএব নিকট হইতে কোদালী তুলিয়া সবলে পুনর্জ্জীবিত ব্যক্তির মাথায় ফেলিয়া মারিল, সেই আঘাতে যুবার পুনর্মৃত্যু হইল। যে ব্যক্তি এই আঘাত করিয়াছিল, সে ব্যক্তি কে? মৃত ব্যক্তির পিতা!

কণ্ঠমালা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরিচিত পুরুষকে যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ জেলদারগা তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ যখন তাহাকে আর দেখা গেল না তখন জেলদারগা মাথা নাড়িয়া অস্ফুট বাক্যে বলিলেন "তুমি শম্ভু না হও তাহার কোন আত্মীয় কুটুম্ব হইবে, তাহা না হইলে বাঙ্গালি হইয়া সাহেবকে অগ্রাহ্য করে এমন সাধ্য আর কাহার! তোমার ঐ চলন ঐ ভঙ্গী তুমি অবশ্য শম্ভুর নিকট পাইয়াছ; তোমার দৃষ্টিতে ভয় না পাইয়া থাকি, আমি অপ্রতিভ হইয়াছিলাম; বড় বড় সাহেবের দৃষ্টি আমি কখন গ্রাহ্য করি নাই, তুমি বাঙ্গালি, তোমার নিকট আমি অপ্রতিভ হইলাম, ভাল, আবার যদি কখন সাক্ষাৎ হয় তবে তোমার চক্ষে কি আছে দেখা যাবে।" এই বলিয়া অপরিচিত ব্যক্তি যেদিকে গিয়াছে সেইদিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া ফিরিলেন। ফিরিয়াই আবার সেই দিকে চাহিয়া পকেট হইতে নোটের পুঞ্জ বাহির করিয়া গণিতে আরম্ভ করিলেন; গণিতে গণিতে একবার সহাস্য বদনে অপরিচিত ব্যক্তির পথপানে চাহিতে লাগিলেন; শেষ গণনা সমাধা হইলে নোটগুলি সযত্নে আবার রাখিলেন। তাহার পর একটি

"চুরট" বাহির করিয়া, তাহার দুই অগ্র দুই হস্তে ধরিয়া ছিদ্র আছে কি না নতশিরে তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে গাড়ির দিকে আসিতে লাগিলেন।

গাড়িতে মেম সাহেব অতি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে বনমধ্যে অপরিচিত অস্ত্রধারীকে দেখিয়া, তাঁহার ভয় হইয়াছিল; তাহার পর, পত্র এবং সেই সঙ্গে স্তূপাকার নোট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। সেই সময় নোটসম্বন্ধে সাহেবকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সাহেব তাহার কোন উত্তর না দিয়া বনমধ্যে দৌড়িয়া গিয়াছিলেন। মেম সাহেব এই সকলের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া, নিজ শ্বেত শরীরের অর্দ্ধাংশ গাড়ি হইতে বাহির করিয়া বনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। এমত সময় সাহেবকে আসিতে দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে শরীর কুঞ্চিত করিয়া যথাস্থানে স্থির হইয়া বসিলেন।

সাহেব গাড়ির নিকট আসিয়া চুরটের এক অগ্র দন্তমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গাড়িতে উঠিলেন, তাহার পর বিলাতি দীপ-শলাকা দ্বারা অগ্নিজ্বালিত করিয়া, চুরটের অপর অগ্রে ধরিলেন। এই সময় মেম সাহেব উপর্য্যুপরি কত প্রশ্নই করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া সাহেব একদৃষ্টে চুরটে অগ্নিসংস্কার হইল কি না দেখিতে দেখিতে টানিতে লাগিলেন। চুরট ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অগ্নিসংস্কার করিতে লাগিলেন; শেষ যখন দেখিলেন যে চুরট আর নির্ব্বাণের সম্ভব নাই, তখন দীপশলাকা গাড়ির দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া মেম সাহেবের দিকে চাহিলেন। মেম সাহেব আবার পূর্ব্বমত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সাহেব নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন, "সকল প্রশ্নের একেবারে উত্তর হয় না, একে একে

বলিতেছি।" এই বলিয়া গাড়িহইতে মাথা বাহির করিয়া, গাড়য়ানকে বলিলেন "ঘোড়া বড় ধীরে ধীরে চলিতেছে শীঘ্র চালাও।" তাহার পর ভস্ম ঝাড়িয়া চুরট আবার সযত্নে মুখমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, দুই হস্ত দুই পকেটের মধ্যে রাখিয়া অতি প্রশান্তভাবে মেম সাহেবের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "পত্র কে লিখিয়াছে, নোট কাহাকে দিতে হইবে, কত টাকার নোট?"

সাহেব দুই অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠ হইতে চুরট লইয়া একবার তাহার অগ্রভাগ দেখিলেন; তাহার পর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তোমার তিন প্রশ্নের একে একে উত্তর দিই—প্রথম কথা কাহার পত্র? উত্তম প্রশ্ন, সঙ্গত প্রশ্ন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, কেননা যে এ পত্র লিখিয়াছে সে আপন নাম স্বাক্ষর করে নাই।"

মেম। পত্র বাহককে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে না কেন?

সাহেব। একে একে প্রশ্ন কর, যে তিন প্রশ্ন করিয়াছ তাহার অগ্রে উত্তর দিই—তাহার পর নূতন প্রশ্ন করিও।

মেম সাহেব অগত্যা আপন কৌতূহল সম্বরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। সাহেব তখন বলিতে লাগিলেন "তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে; দ্বিতীয় প্রশ্ন নোট কাহাকে দিতে হইবে? ভাল, এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, নোট কাহাকেও দিতে হইবে না, আমাদের নিকট থাকিবে।"

মেম। আমাদের নিকট থাকিবে? সে কি! কেন? তবে কি ঐ নোট কেহ আমাদের দিয়াছে?

সাহেব। থাম, থাম, এখনও এসকল বলিবার সময় হয় নাই। তোমার তৃতীয় প্রশ্নের এখনও উত্তর বাকি আছে। তৃতীয় প্রশ্ন কত টাকার নোট? একথা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিতে

পারে না। তুমি আমার স্ত্রী, প্রিয়া,প্রাণাধিকা, অন্তরের অন্তর, তুমি একথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমিও অবশ্য উত্তর করিতে পারি, অতএব উত্তর করি। এই বলিয়া দুই চারিবার চুরট টানিলেন; চুরটের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, আবার দীপ-শলাকা বাহির করিয়া চুরট পুনর্জ্জ্বালিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় মেম সাহেব আবার বলিলেন "কত টাকার নোট একবার বল না?" সাহেব কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "ব্যস্ত হইও না এসকল ব্যস্তের কর্ম্ম নহে, সকলই সময়ে শুনিতে পাইবে।" এই বলিয়া সাহেব চুরট জ্বালিলেন, পূর্ব্বমত দুই পকেটে দুই হাত দিয়া, গাড়ি ঠেস দিয়া, পদদ্বয় ঈষৎ বিস্তার করিয়া চুরট টানিতে টানিতে মেম সাহেবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মেম সাহেব দেখিলেন যে এসময় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা; অতএব অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শেষ, সাহেব মুখ হইতে চুরট বহির্গত করিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া চুরটের ভস্ম ঝাড়িয়া বলিলেন "তোমার তৃতীয় প্রশ্ন, কত টাকার নোট," এই বলিয়া সাহেব এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া মাথা নামাইয়া মেম সাহেবের মুখের নিকট মুখ আনিয়া কিঞ্চিৎ অস্ফুট স্বরে বলিলেন "লক্ষ টাকার নোট—এনোট আমাদের হইল।" মেম সাহেব আহ্লাদে গদ্গদ স্বরে বলিলেন "তুমি আমার সর্ব্বস্ব।" তাহার পর, স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া, আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিলেন। সাহেব চুরট টানিতে টানিতে সস্নেহে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, চুরট হইতে দুই এক বিন্দু ছাই মেমের মাথায় পড়িতে লাগিল,সাহেব তাহা যত্নে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। সাহেব বিবির দাম্পত্যপ্রণয়ের আর সীমা রহিল না।

কিঞ্চিৎ পরে মেম সাহেব স্বামীর অঙ্গ হইতে মাথা তুলিয়া যথাস্থানে বসিলেন। বসিয়া আপনার সন্তান সন্ততিদিগের মুখচুম্বন করিয়া একে একে স্বামীর ক্রোড়ে দিতে লাগিলেন। সাহেবের আদর শেষ হইলে মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "এতটাকা লইয়া আমরা কি করিব? পরমেশ্বরের কি কৃপা, আমরা বিলাত যাইতেছি আর ঠিক এই সময়ে আমাদের টাকা পাঠাইয়াছেন। বিলাত পৌঁছিয়াই নিজগ্রামে যাওয়া হইবে না; লণ্ডন নগরে দশ দিন থাকিতে হইবে, দশপ্রকার দেখিয়া শুনিয়া গেলে, বা দশ প্রকার ভাল মন্দ সামগ্রী ক্রয় করিয়া লইয়া গেলে, বিবি নষ্টর আর আমাদিগকে দেখিয়া নাশা কুঞ্চিত করিতে পারিবে না। আর কিছু না হউক, তাহার অপেক্ষা ভাল পোষাক, আর একখানি ভাল গাড়ি লইয়া গেলেই বিবি নষ্টরের মাথা হেঁট হইবে, আমরা ভারতবর্ষে ছিলাম; আমরা "পাড়াগেঁয়ে" বলিয়া আর আমাদের ঘৃণা করিতে পারিবে না, আমি ত ভাল ভাল পোষাক পরিবই, কিন্তু তুমি যে এই দেশী দর্জির সেলাই কাপড় পরিয়া জন্তুর মত বেড়াইবে, তাহা হইবে না—"

এই সময় হঠাৎ আবার গাড়ি থামিল। সাহেব মুখ বাহির করিয়া দেখেন যে ইতিপূর্ব্বে যে অস্ত্রধারী পুরুষ নোটসহিত পত্র দিয়া গিয়াছিল, সেই আর তৎসঙ্গী অপরিচিত পুরুষ উভয়ে অগ্রসর হইতেছে। মেমসাহেব ভাবিলেন, ইহারা নোট ফিরাইয়া লইতে আসিতেছে, অতএব ব্যগ্রতা সহকারে সাহেবকে বলিতে লাগিলেন, "নোট শীঘ্র আমার নিকট দেও আর উহাদের বল, যে নোট নাই—"

এই কথা বলিতে বলিতে অপরিচিত পুরুষ গাড়ির নিকট আসিয়া অতি সুন্দর ইংরাজিতে বলিল, "সতর্ক হও,—মেজেষ্টর

সাহেবের অনুমতি অনুসারে তোমাকে ধরিবার নিমিত্ত চারিজন অশ্বারোহী শীঘ্র আসিবে, বোধ হয় এতক্ষণ তাহারা আসিতেছে।”

সাহেব বলিলেন, “মেজেষ্টর সাহেব কেন এমত অনুমতি করিয়াছেন, সে বিষয়ের কিছু জানেন?” অপরিচিত পুরুষ উত্তর করিল, “এই মাত্র শুনিয়াছি যে আপনার পদপ্রাপ্ত সাহেব জেলখানা সম্বন্ধে আপনার নামে কি অভিযোগ করিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয় আমি বিশেষ কিছুই জানি না।” সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, যে “এ সম্বাদ আপনি কোথায় পাইলেন, আর যদি পাইয়া থাকেন তবে ইতিপূর্ব্বে মহাশয়ের সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখনই বা বলেন নাই কেন?” অপরিচিত পুরুষ উত্তর করিলেন, “তৎকালে আমি এ সম্বাদ পাই নাই, এই মাত্র পাইয়া মহাশয়কে জানাইলাম।” সাহেব বলিলেন, “যেখানে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে স্থান এখান হইতে ন্যূনকল্পে পাঁচ ছয় ক্রোশ হইবে, এই পথে আপনি কিরূপে আমার অগ্রে আসিয়াছেন?” অপরিচিত পুরুষ ঈষৎ হাসিয়া চলিয়াগেলেন। জেল দারগা ইতিকর্ত্তব্যতা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বসিয়া রহিলেন, গাড়ি কলিকাতাভিমুখে চলিতে লাগিল। প্রায় দুইদণ্ড কাল অতীত না হইতে হইতেই অশ্বারোহিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া মেজেষ্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত ওয়ারেণ্ট দেখাইল। জেলদারগা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অশ্বারোহীদিগের সঙ্গে ফিরিলেন। সমস্ত পথে কোন কথা কহিলেন না, মেমসাহেব একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ওয়ারেণ্টে কি অপরাধ লিখিত আছে?” সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে শম্ভু সম্বন্ধে যে ঘটনা বিবরিত হইয়াছে তাহার প্রায় দশ বার দিবস পূর্ব্বে মোহান্ত আপন কুটীরে বসিয়া একখানি পত্র পড়িতে ছিলেন, সেখানে রামদাস সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন পত্রখানি শম্ভু কয়েদী লিখিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে মোহান্ত সচরাচর যেরূপ ক্ষুদ্র পত্র পাইতেন তদপেক্ষা এ পত্রখানি অনেক দীর্ঘ। মোহান্ত এই পত্রের যে যে অংশ রামদাস সন্ন্যাসীকে শুনাইলেন আমরা সেই সেই অংশ নিম্নে উদ্ধত ক-করিলাম।

"আমার এ অবস্থা আর ভাল বোধ হয় না, অবস্থান্তরিত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। এক্ষণে মৃত্যুই প্রার্থনীয়; অতএব যাহা উচিত বিবেচনা করেন তাহা আমার বিশেষ বিশেষ আত্মীয়গণকে জানাইবেন। এখানকার জেলদারগা ছুটি লইয়াছেন, শীঘ্র বিলাত যাইবেন। আমার এক্ষণে আর আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় নাই। এই সময় আর একটি কথা বলিয়া রাখি, যেরূপ অপরিমিত দান করিয়া আসিতেছেন তাহা হইতে বিরত হইলে ভাল হয়। আমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম এরূপ দানে কোন বিশেষ ফল নাই। বহুকালাবধি রাজারা দান করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালার কি উপকার হইয়াছে? বাঙ্গালার দৈন্যদশা সমভাবেই আছে। দুই চারি জন দরিদ্রকে অদৈন্য করিলে সমাজের কি উপকার হইবে? দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, জেলখানায় আর কয়েদী ধরে না। দানে ধন হস্তান্তরিত হয় বটে, কিন্তু বৃদ্ধি হয় না, এক্ষণে যাহাতে বাঙ্গালার ধনবৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা দেখা উচিত। ধনবৃদ্ধি করিতে গেলে ধনের সৃষ্টি করিতে হইবে অতএব তাহার

ব্যবস্থা করিবেন। আর এক কথা; বাঙ্গালির মধ্যে অনেকে বিবেচনা করেন যে এক্ষণে রাজ্যশাসন স্বদেশীর হস্তে না থাকাতে অত্যাচার হইতেছে। এবং কেহ কেহ আমার হস্তে দিবার নিমিত্ত উদ্যত আছেন। এই সকল লোক, বোধ হয়, মনে করিয়াছেন যে রাজ্য বালকের হস্তে আছে, ইচ্ছা করিলেই কাড়িয়া লইতে পারা যায়। এই সকল লোকের মধ্যে সাগরসুত একজন প্রধান; সাগরসুত আমার আত্মীয়, বাঙ্গালার শুভানুধ্যায়ী, আমি তাহাকে আন্তরিক ভাল বাসি। তাহাকে আপনি বলিবেন যে ইচ্ছা করিলে রাজ্যভার আমি অনায়াসে লইতে পারি, কিন্তু লইলে দেশের মঙ্গল হইবে না। যে অত্যাচারের নিমিত্ত সাগরসুত এবং তন্মতাবলম্বীরা অসন্তোষ, সে অত্যাচার সকলদেশেই আছে। আমাদের হস্তে রাজাভার থাকিলে সে অত্যাচার যে হইবে না ইহা কিরূপে জানিলেন? স্বার্থপরতা হেতু রাজপুরুষদিগের কিছু কিছু অন্যায় করিতে হয়, বাঙ্গালিরা যে স্বার্থপর একেবারে নহেন একথা কে বলিবে? আমাদের জমীদারদিগকে দেখিয়া ভবিষ্যৎ রাজ্যশাসন অনুভব করিতে বলিবেন।

"সাগরসুতকে বলিবেন যে বাঙ্গালায় একটি শুভানুধ্যায়ী সম্প্রদায় হওয়া আবশ্যক। স্বার্থপরতাশূন্য, পরোপকারী, ক্লেশসহিষ্ণু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সত্যবাদী লোক এই নিমিত্ত অতি সাবধানে বাছিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। আপাতত দ্বাদশ জন হইলেই যথেষ্ট। উহাদের চিনিবার নিমিত্ত একটি চিহ্ন আবশ্যক। সেই চিহ্ন উহাদের অঙ্গুরিতে এবং পতাকায় অঙ্কিত থাকিবে, উহাদের পতাকা যে কেন আবশ্যক তাহা সময়ান্তরে বলিব। আর ইহাদের একটি উপাধি দিতে হইবে; ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, যিনিই এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, তিনিই এই উপাধি গ্রহণ করিবেন; কিন্তু এই উপাধি গ্রহণ করিলে যে পূর্ব্ব উপাধিত্যাগ করিতে

হইবে এমত নহে: কেবল আপনাদিগের সম্প্রদায়মধ্যে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

"এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে মহাকুলীন বলিলে ক্ষতি নাই। যদি তাঁহারা যথার্থই স্বার্থপরতাশূন্য, পরোপকারী, সত্যবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ক্লেশসহিষ্ণু হন, তবে যে তাঁহারা বল্লালসেনের কুলীন অপেক্ষা মহাকুলীন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। মহাকুলীনের যে পাঁচটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা একাধারে পাওয়া সুকঠিন; কিন্তু তাহা না পাইলে কদাচ মহাকুলীন করা হইবে না; যদি একজন ব্যক্তির ইহার কোন লক্ষণের সামান্য ব্যতিক্রম থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায়কে যে গুরুতর ভার লইতে হইবে তাহার বিঘ্ন ঘটিবে। তদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ের গৌরব থাকিবেনা, একজনের নিমিত্ত সকলকে অবনত হইতে হইবে। শেষে, সম্প্রদায় নষ্ট হইবে অতএব মহাকুলীন মনোনীত করা বড় গুরুতর কার্য্য। এই কার্য্য আপাতত আমি সাগরসুতহস্তে ন্যস্ত করিলাম, এই কয়েকটি গুণ তাঁহাতে আছে, তিনি অদ্য হইতে মহাকুলীন হইলেন। কিন্তু আমার আক্ষেপ রহিল, যে আমি স্বয়ং যাইয়া বাঙ্গালার এই শুভানুষ্ঠান করিতে পারিলাম না, আর কিছু না হউক, আমার ইচ্ছা ছিল এই সম্প্রদায়ের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া একটি অঙ্গুরী স্বহস্তে সাগরসুতের অঙ্গুলিতে পরাইতাম এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিতাম। তাহা না হউক, এক্ষণে একদিন উত্তম সময়ে আপনারা সকলে প্রসন্ন চিত্তে বসিয়া সাগরসুতের ধ্বজাগ্রহণ এবং অঙ্গুরীধারণ দেখিবেন। ধ্বজা এবং অঙ্গুরী উভয়েই যেন এই সম্প্রদায়ের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। কি চিহ্ন মনোনীত হয় তাহা আমায় লিখিবেন। আমার মতে মৎস্যমূর্ত্তিগ্রহণ করিলে ভাল হয়। যে মূর্ত্তি বা চিহ্ন গ্রাহ্য হয় তাহা অঙ্গুরীতে

অঙ্কিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে পরিতে হইবে; ব্রাহ্মণের যেরূপ যজ্ঞোপবীত, মহাকুলীন দিগের সেইরূপ এই অঙ্গুরী থাকিবে। ভবিষ্যতে মহাকুলীনেরা বাঙ্গালায় মান্য হইলে অনেকে সেই সম্মান লোভে এইরূপ অঙ্গুরী পরিয়া জনসমাজকে প্রবঞ্চনা করিবে। কিন্তু এক্ষণেও অনেকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াও সেরূপ বঞ্চনা করিয়া থাকে। তাহার নিমিত্ত মহাকুলীনদিগের পরস্পর চিনিবার ব্যাঘাত হইবে না। চিনিবার নিমিত্ত কেবল অঙ্গুরী নহে আর একটি উপায় আছে; তাঁহাদের বীজমন্ত্র। সে মন্ত্র যে কি, তাহা এই পত্রে লিখিতে পারিলাম না, সাগরসুতকে তাহা স্বতন্ত্র বলিয়া দিব। যদি তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ আর না হয়, তবে আমার স্বহস্তলিখিত যে গ্রন্থ আমি তাহাকে দিয়াছি তাহাই পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে বলিবেন, তাহা হইলেই সে মন্ত্র অনুভূত হইবে।

"সাগরসুতকে এ অঞ্চলে যেরূপ মহাকুলীন করিলাম এইরূপ স্থানে স্থানে আর দুই একজনকেও অদ্য করিলাম। তাঁহারাও পরস্পর সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিবেন। তাঁহাদের সহিত কখন সাগর-সুতের সাক্ষাৎ হইলে ঐ বীজ মন্ত্রের দ্বারা পরিচয় হইবে।

"মহা কুলীনেরা প্রতিবৎসর দেবী পক্ষের দশমী রাত্রে সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিবেন। পরস্পরের নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠান যিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিবেন। কোন ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ঐ রাত্রে তাঁহাকে ব্রতগ্রহণ করাইবেন।

"মহাকুলীনেরা ব্রতগ্রহণ করিবার সময় একটি প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিবেন। তাহাতে যে পাঠ লিখিত হইবে তাহা তাঁহারা আপনারাই বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন। "স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া সাধ্যানুসারে পরোপকার করিবেন" একথা

সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে অবশ্য লিখিত থাকিবে। তদ্ভিন্ন আপনাদিগের মধ্যে "সর্ব্বস্ব দিয়া পরস্পরের উপকার করিতে হইলে তাহাও করিবেন," একথাও থাকিবে। কিন্তু উপকার করিবার নিমিত্ত যদি সত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে হয় তাহা করা হইবে না।

"মহাকুলীনের পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যদি কেহ স্ত্রীর অসঙ্গত বশতাপন্ন হন, তবে তাঁহাকে সম্প্রদায়ভুক্ত করা হইবে না। তাঁহার যতই গুণ থাকুক তিনি দীর্ঘকাল আপন ব্রত রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহার গুণ ক্রমে ক্রমে স্ত্রীতে লয়প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার নিজের অস্তিত্ব লোপ হইয়া ক্রমে তিনি স্ত্রীর ছায়া স্বরূপ হইবেন। স্ত্রীর মত কথা কহিবেন, স্ত্রীর মত কার্য্য করিবেন; অতএব তাঁহাকে কদাচ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তবে যাঁহাদের স্ত্রীও এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্তা তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার আপত্তি নাই, তাঁহাদের এই গুণ লোপ হইবে না, বরং আরও পুষ্টই হইবে।

"আর যাঁহারা মাদকসেবন করেন, তাঁহাদিগকেও সমাজভুক্ত করা না হয়। ইহাদের দ্বারা কোন উপকার হইবে না, বরং ভবিষ্যতে উপহাস্য হইতে হইবে।

"কি উদ্দেশে এই মহাকুলীনের দলবদ্ধ করা আবশ্যক এবং তাঁহাদের কি করিতে হইবে তাহা আর এক সময়ে বলিব।

"এইরূপ সম্প্রদায় যে শীঘ্র বাঙ্গালায় সৃজিত হইতে পারে এরূপ আমার বিশ্বাস আছে। পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি যে একেবারে বাঙ্গালায় নাই একথা মিথ্যা, আমি স্বয়ং দুই তিন জনকে জানি, সাগরসুত তাহার মধ্যে একজন। যদি আমার পরিচয়ের মধ্যে এই দুই তিন জন থাকে, তবে আরও অনেক আছে, অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে। এই সম্প্রদায় বাঙ্গালায় যে অগ্রাহ্য হইবে কি উপহাস্য হইবে এমত ভয় আমার নাই।

পূর্ব্বের কুলীনসম্প্রদায় মনুষ্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল, আর, এই মহাকুলীন সম্প্রদা ঈশ্বরকল্পিত,যাঁহারা এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত তাঁহাদিগকে মহাকুলীন ঈশ্বর করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মান সর্ব্বত্র। তাঁহাদের লোকে মহাকুলীন বলুক, আর নাই বলুক, তাঁহারা পরোপকারী বলিয়া সকলেই তাঁহাদের ভালবাসে, সত্যবাদী বলিয়া সকলেই মান্য করে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া সকলেই তাঁহাদের ভয় করে। এক্ষণে মহাকুলীন উপাধি দিয়া লোকের নিকট তাঁহাদের নিমিত্ত নূতন সম্মান ভিক্ষা করিতে হইবে না; সম্মান তাঁহাদের আছেই, কেবল তাঁহাদের এক্ষণে সমবেত করিতে হইবে, পরস্পরের সহিত আলাপ করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর, ফল জগদীশ্বরের হস্তে। এক্ষণে আমাদের মধ্যে ছোট বড় সকলের কর্ত্তব্য এই মহাকুলীনদিগের কিসে পরস্পর দলবদ্ধ হয়, তাহার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা।

"অদ্য এই পর্য্যন্ত। আমি মরণেচ্ছুক ইহা ভুলিবেন না। ইতি।"

শম্ভু কয়েদীর এই পত্র সমস্ত পাঠ শেষ হইলে রামদাস বলিলেন "এ আবার কি ভাব?" মোহান্ত বলিলেন, "সে যাহা হউক এখনই উদ্যোগ আরম্ভ করিতে হইবে। তুমি যাও সকলকে সমাচার পাঠাও।" "কাজেই" বলিয়া রামদাস উঠিয়া গেলেন।

মোহান্তের কুটীর হইতে বিদায় হইয়া, রামদাস সন্ন্যাসী একজন "চেলাকে" ডাকিলেন। "চেলার" সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা; পরিধানে কৌপীন, মস্তকে জটা; ললাটে ত্রিশূল অঙ্কিত। গুরুর অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়া "চেলা" মনে করিল, কোন বিশেষ লাভের আদেশ আছে; অতএব আহ্লাদে সর্ব্বাঙ্গের শিরা ফুলাইয়া, অস্থিময় স্কন্ধ তুলিয়া পা টিপিতে টিপিতে এক বৃক্ষের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় রামদাস সন্ন্যাসী যাইয়া

দুই চারিটি কি কথা বলিয়া আপনার কুটীরে প্রত্যাগমন করিল। "চেলা" আবার পূর্ব্ব মত পা টিপিতে টিপিতে চলিয়া গেল।

রামদাস আপনার কুটীরে আসিয়া ভগ্ন পালঙ্কে শয়ন করিল। দীর্ঘ শুষ্ক পদদ্বয় বিস্তার করিয়া শম্ভু কয়েদীর পত্রের অর্থ মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। "মহাকুলীনের দল আরম্ভ হইবে, তাহাতে অন্য লাভালাভের বিষয় না থাকুক, আধিপত্য লাভের বিষয় বটে। মহারাজ যাহাদের মহাকুলীন বলিয়া সম্মান করিবেন মোহান্ত অবশ্যই তাহারে সম্মান করিবেন। যত দিন মোহান্তের মান্য না হইতে পারি, বা, তাঁহাকে হস্তগত না করিতে পারি, তত দিন এই সন্ন্যাসীর বেশ আর সুখের হইবেনা।

"কিন্তু মহাকুলীনের মধ্যে প্রথমেই সাগরসুত মনোনীত হইল। পত্রে আমার উল্লেখ মাত্রই নাই। আমি কি মহাকুলীনের সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারিব না? আমার ত সকল লক্ষণই আছে, আমার অপেক্ষা পরোপকারী কে? আমি এই যে সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া নির্জ্জন স্থানে ভগ্নঘরে কদন্ন আহার করিয়া কালাতিপাত করিতেছি, ইহা কেবল পরোপকারের নিমিত্ত। আমাকে এখানে এই অবস্থায় রাখায় অবশ্য মহারাজের উপকার হইতেছে। নতুবা, তিনি কেন আমার পরিবর্ত্তে জেলখানায় থাকিবেন। যে পরোপকারী, তাহার স্বার্থপরতা নাই। মহারাজের যেসকল কার্য্য আমি নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, তাহাতে আমার স্বার্থ কি? অতএব আমি স্বার্থপরতাশূন্য। আমি যে ক্লেশসহিষ্ণু, তাহা বলা বাহুল্য। কস্মিনকালে ভস্ম মাখি নাই, জটা পরি নাই, নাম লুকাই নাই, গৃহ ত্যাগ করি নাই, এখন তাহা সকলই করিতে হইয়াছে। সত্যবাদিত্ব সম্বন্ধে দুই একবার দুই একজনের নিকটে আমি কখন কখন দোষী হইয়া থাকিব। কিন্তু, নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে,

সে দোষ আমার নহে। কার্য্যগতিকে দুই একবার মোহান্তের নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকি; না বলিলে, হয় ত আমার অনিষ্ট ঘটিত। আর প্রতিজ্ঞার কথা, নিজে বলা দাম্ভিকতা মাত্র। যখনই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাতে সহস্র বিপদ থাকিলে, জেল কি ফাঁসীর আশঙ্কা থাকিলেও তাহা প্রতিপালন করিয়াছি। আমি যে কত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাহা শৈলের সম্বন্ধে প্রকাশ পাইতেছে; নিত্য শৈল আমায় মিনতি করিতেছে, কাঁদিতেছে, তবুও একমুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে দেখা দিই নাই, কথার উত্তর দিই নাই, বা তাহার কাতরতা একবার মহারাজকে জানাই নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে তাহার রূপরাশি মাটী করিব, একান্ত তাহা না পারি, জলে পচাইব, তাহার অন্যথা কখনই হইবে না, এক্ষণে যদি মহারাজ স্বয়ং আসিয়া অনুরোধ করেন, তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা ইতস্ততঃ হইবে না।

"পঞ্চলক্ষণ আমাতে আছে। মহারাজকে স্মরণ করিয়া দিলেই তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্মরণ করিয়া দিতে হইবে। অদ্যই দিব।" এই ভাবিয়া পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দ্বারের নিকটে আসিল। দ্বার খুলিবামাত্র জোৎস্নালোকে দেখিল, শুভ্র বস্ত্র পরিধান একটি যুবতী এক বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া আছে। আর যেন বোধ হইল, যুবতীর বক্ষে একটি শিশু অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। রামদাস ভাবিল, এ আবার কে?

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড। মাঘ ১২৮১। ১০ সংখ্যা।

খাদ্যাখাদ্য।

খাদ্যাখাদ্য আমরা যত বিচার করি এত আর কোন জাতিই করে না। রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত আমরা এ বিচার করি না; বলবৃদ্ধির নিমিত্ত এ বিচার করি না; ব্যয়ানুরোধেও এ বিচার বড় করি না; কেবল পরকালের নিমিত্ত এ বিচার করি। আমাদের পরকাল অতি নশ্বর, অতি অল্পেই যায়; একটি ক্ষুদ্র পলাণ্ডু খাও, তোমার পরকাল একেবারে যাইবে; প্রস্তরপাত্রে নারিকেল খাইয়াছিলে, আবার কাংস্যপাত্রে খাও তোমার পরকাল তৎক্ষণাৎ যাইবে; আমাদের পরকাল রক্ষা করা বড় কঠিন।

আহার সম্বন্ধে আবার আর এক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তুমি নিত্য অলাবু বা লাউ খাইয়া থাক কিন্তু যদি তাহা নবনীতে খাইলে তবেই তুমি গোমাংস খাইলে; তুমি যতই বল আমি লাউ খাইতেছি, ইহাতে অস্থি নাই, মাংস নাই, রক্ত

নাই; কিন্তু শাস্ত্রকার মাথা নাড়িয়া বলিতেছেন, "না—তুমি গোরু খাইতেছ, অস্থিমাংস উহাতে নাই থাক; উহা লাউ নহে, গোরু,—উহা নিশ্চয় গোরু। শাস্ত্রকার অভ্রান্ত।"

সে যাহাই হউক আর বড় ভয় নাই—আমরা এক্ষণে শাস্ত্রকারদিগের হস্ত হইতে প্রায় মুক্তিলাভ করিয়াছি। একবার এই সমস্ত খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আপনাপনি বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আহার দেহরক্ষার্থ, ধর্ম্মরক্ষার্থ নহে। একথা যদি সত্য হয় তবে "এই আহারে পাপ, এই আহারে মহাপাপ" ইত্যাদি ভয়প্রদর্শক বাক্য আর আমাদের গ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। যখন দেখিতেছি, আহার কেবল ঐহিকের নিমিত্ত, পারত্রিকের নিমিত্ত নহে; তখন একথার বিপরীত, যিনিই বলুন, আমরা তাহা শুনিব না।

কিন্তু আহার যদি কেবল দেহ রক্ষার্থ হয়, তবে কোন্ জাতীয় দ্রব্য আহার করিলে দেহের মঙ্গল হইবে, তাহা স্থির করা আবশ্যক। অনেক দ্রব্য আছে যে জন্তু বিশেষের পক্ষে তাহা পুষ্টিকর কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে তাহা অনিষ্টকর। আবার, অনেক দ্রব্য আছে যে তাহা আহার করিলে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তি হয় বটে কিন্তু দেহের বিশেষ ইষ্ট হয় না, কেবল অনর্থক পাক যন্ত্রকে ক্লান্ত করা হয়। আবার কোন কোন সামগ্রী আছে, যে তাহা অল্পপরিমাণে আহার করিলেও দেহের বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু সে কোন্ সামগ্রী?

খাদ্যের মধ্যে মাংসই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর বলিয়া ইংরেজদিগের মধ্যে রাষ্ট্র। মাংসই তাঁহাদের প্রধান আহার, কাজেই তাঁহাদের বল বীর্য্য দেখিয়া, আমরা মনে করি এসকল মাংস

আহারের ফল, অতএব ভাবি, যে আমরা যদি ইংরেজদিগের তুল্য বলিষ্ঠ হইতে চাই, তবে আমাদের পক্ষে মাংস আহার বিধেয়।

কিন্তু আবার দেখা যায় যে অনেক হিন্দুস্থানি, পাঞ্জাবি, কস্মিন কালে মাংস আহার না করিয়াও ইংরেজদিগের তুল্য বলিষ্ঠ ও বীর্য্যবান্। আবার অনেক ফিরিঙ্গি ও মুসলমান প্রচুর পরিমাণে মাংস নিত্য আহার করিয়াও আমাদের অপেক্ষাও দুর্ব্বল। কিন্তু বোধ হয় অনেকে বলিবেন, যে এ সকল ব্যক্তি-বিশেষের উদাহরণ মাত্র, সমুদায় জনসাধারণ লইয়া বিচার করিতে গেলে "ভেতো" বাঙ্গালি অপেক্ষা গোখাদক ইংরেজ বলিষ্ঠ।

আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে যখন দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর ছোট বড় প্রায় সমুদায় জাতিই মাংসভোজী, তখন নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে মাংসাহার মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক।

একথা মন্দ নহে। মাংস যদি আমাদের স্বাভাবিক আহার হয়, তবে মাংস দ্বারা আমাদের যেরূপ বলবৃদ্ধি ও শরীর সচ্ছন্দ হইবে এমত আর কোন দ্রব্যেই হইবে না। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্য, মাংস আহার করে বলিয়াই যে মাংস আমাদের স্বাভাবিক আহার একথা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বলা যায় না।

পৃথিবীর যাবতীয় জন্তুর আহার এই ছয় প্রকার; তৃণ, পত্র, ফল, মূল, মৎস্য, এবং মাংস। মেষ তৃণ ভক্ষণ করে, হস্তী পত্র ভক্ষণ করে, বানর ফল ভক্ষণ করে, শূকর মূল ভক্ষণ করে, বক মৎস্য ভক্ষণ করে, ব্যাঘ্র মাংস ভক্ষণ করে। কিন্তু মেষ কখন মাংস ভক্ষন করিতে পারে না, ব্যাঘ্রও কখন তৃণ ভক্ষণ করিতে পারে না। তৃণ স্বাভাবিক অবস্থাতেই মেষের আহার।

মাংস স্বাভাবিক অবস্থাতেই ব্যাঘ্রের আহার। মেষ কখন তৃণ অবস্থান্তর করিয়া খায় না, ব্যাঘ্রও কখন মাংস অবস্থান্তর করিয়া খায় না; এই জন্য মেষের পক্ষে তৃণ স্বাভাবিক এবং ব্যাঘ্রের পক্ষে মাংস স্বাভাবিক আহার বলা যাইতে পারে। এই নিয়মানুসারে মনুষ্যের পক্ষে কোন্ আহার স্বাভাবিক? তৃণ, পত্র, মৎস্য, মাংস এই সকল আহার করিতে গেলে অগ্নিসংস্কার দ্বারা তাহাদের অবস্থান্তর না করিয়া আমরা আহার করিতে পারি না, অতএব উহা আমাদের স্বাভাবিক আহার নহে বলিতে হইবে। ফল আর কোন কোন মূল আহার করিতে হইলে তাহা বিনা অগ্নিসংস্কারে আহার করিতে পারি, অতএব বোধ হয় কেবল সেই ফল মূলই আমাদের স্বাভাবিক আহার। এই ফলশব্দে কেবল বৃক্ষের ফল বলিতেছি এমত নহে; তৃণের ফল, লতার ফল সকলই বুঝাইবে; যথা, মুগ, মটর, সীম, তণ্ডুল ইত্যাদি।

যে সামগ্রী বিনা অগ্নিসংস্কারে আহার করা যায়, তাহাই আমাদের স্বাভাবিক ভক্ষ্য, এ কথা বলিলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন; তাঁহারা বলিতে পারেন যে অভ্যাস করিলে মাংসও বিনা অগ্নিসংস্কারে আহার করা যাইতে পারে। এবং এবিষয়ে তাঁহারা ভূরি ভূরি প্রমাণও দেখাইতে পারেন। তদুত্তরে আমরা এই মাত্র বলি যে, বিনা অভ্যাসে ফল মূল খাওয়া যায় কিন্তু বিনা অভ্যাসে কাঁচা মাংস আহার করা যাইতে পারে না। অভ্যাসে যাহা হয় তাহাকে স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না।

কথিত আছে এক বাঘিনী কর্তৃক একটি শিশু প্রতিপালিত হইয়াছিল। শিশু অন্য শাবকদিগের সঙ্গে একত্র কাঁচা মাংস খাইত। শিশুর দন্ত ছিল না, কিরূপে কাঁচা মাংস চর্ব্বণে সক্ষম হইত, তাহা আমরা শুনি নাই; বোধ হয়, গল্পকার

বলিয়া থাকিবেন যে, শিশুর দুই চারিটি "দুদে দাঁত" উঠিয়াছিল। আর এক কথা শুনিয়াছিলাম, শিশু ক্রমে পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্ক হইয়াও ব্যাঘ্র শাবকের ন্যায় চলিত অর্থাৎ চলিবার সময় চতুষ্পদের ন্যায় হস্ত পদ ব্যবহার করিত; কখন দুই পদে চলিত না। এটিই অভ্যাসের ফল; তাহা বলিয়া কি দুই পদে গতায়াত করা মনুষ্যের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিব?

খাদ্য বিচার সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা আছে। পাকস্থলী, অন্ত্রী, দন্ত, ইত্যাদি শারীরিক গঠন পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কোন্ জীবের স্বাভাবিক আহার কি, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। গো মহিষাদি তৃণভুক্ জন্তুদিগকে মৃত্তিকা হইতে তৃণ গ্রহণ করিতে হয় এই জন্য তাহাদের পদাগ্র হইতে স্কন্ধ যত উচ্চ, স্কন্ধ হইতে দন্ত পর্য্যন্ত সেই পরিমাণে দীর্ঘ; গলদেশ নত করিলে তাহাদের ওষ্ঠ ও দন্তে অনায়াসে মৃত্তিকা স্পর্শ হয়। হস্তীকে মৃত্তিকা হইতে তৃণচ্ছেদ করিতে হয় না এই জন্য তাহাদের গলদেশ দীর্ঘ নহে। ব্যাঘ্র বানর প্রভৃতিরও গলা যে দীর্ঘ নহে তাহারও সেই কারণ। যাহারা তৃণভুক্ তাহাদের দন্ত অতীক্ষ্ণ, চক্রাকার, কেবল চর্ব্বণোপযোগী, একটিও সূচল নহে, মধ্য ভাগের যে দন্তদ্বারা তৃণচ্ছেদ করিতে হয় কেবল সেই গুলিই কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ। ব্যাঘ্র শৃগাল প্রভৃতির দন্ত স্বতন্ত্র প্রকার; মাংস বিঁধিবার নিমিত্ত তাহাদের এক প্রকার সূচল দন্ত আছে, মাংস কাটিবার নিমিত্ত আর এক প্রকার দন্ত আছে; তৃণ কি পত্রভুক্ দিগের সে প্রকার নাই। বানরদিগের দন্ত গোমহিষাদির দন্তের ন্যায় নির্ধার নহে, উভয় প্রকার দন্তের মধ্যবর্ত্তী; তাহাদের প্রয়োজনোপযোগী, মনুষ্যের দন্তও সেইরূপ মধ্যবর্ত্তী, মাংসাশী দিগের মত নহে এবং তৃণভুক্দিগেরও মত নহে।

মাংসভুক্ জন্তুদিগের অন্ত্রী ক্ষুদ্র; তাহাদের দেহাপেক্ষা প্রায়

তিন চারি গুণ দীর্ঘ। কিন্তু যে সকল জন্তুরা তৃণাদি ভক্ষণ করে তাহাদের অন্ত্রী শরীর অপেক্ষা প্রায় দশ কি বার গুণ দীর্ঘ। মনুষ্যের অন্ত্রী মাংসভুক্ জন্তুদিগের অন্ত্রীর ন্যায় ক্ষুদ্র নহে, তৃণভুক্‌দিগের অন্ত্রীর ন্যায় অতি দীর্ঘও নহে। তাহার কারণ মনুষ্য মাংসভুক্ নহে, তৃণভুক্‌ও নহে। মনুষ্য ফল মূলভোজী, তাহাদের অন্ত্রীর দৈর্ঘ্য কাজেই স্বতন্ত্র।

এই স্থলে ডারুইন সাহেবের মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, যে আহারোপযোগী অন্ত্রী হইয়া থাকে, অন্ত্রীর উপযোগী আহার হয় না। মনুষ্য যদি কেবল তৃণপত্র ভোজন করে তাহা হইলে কয়েক পুরুষমধ্যেই তাহাদের অন্ত্রী তৃণপত্র ভোজী চতুষ্পদের অন্ত্রীর ন্যায় দীর্ঘ হইয়া যাইবে। আবার মনুষ্য যদি পুরুষানুক্রমে মাংস ভোজন করে, তাহা হইলে কয়েক পুরুষ পরে ব্যাঘ্রাদির অন্ত্রীর ন্যায় তাহাদের অন্ত্রী ক্ষুদ্র হইয়া যাইবে। এক্ষণে মনুষ্য কেবল মাংস আহার করে না, মাংসের সহিত ফল মূল ইত্যাদি আহার করে, এইজন্য তাহাদের অন্ত্রী মাংসভুক্‌দিগের অন্ত্রীর ন্যায় ক্ষুদ্র নহে এবং তৃণ পত্র ভোজীদিগের ন্যায় দীর্ঘও নহে।

এই কথার প্রত্যুত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ভারতবর্ষে অনেকে পুরুষানুক্রমে কেবল ফল মূল ভোজন করিয়া আসিতেছেন, কখন মৎস্য বা মাংস আহার করেন নাই, তাঁহাদের অন্ত্রী কি গো মহিষাদির অন্ত্রীর ন্যায় দীর্ঘ হইয়াছে?

সে যাহাই হউক মনুষ্যের গঠন ফলমূল ভক্ষণোপযোগী। এ অবস্থায় আমরা কেবল ফলমূল না খাইয়া কেন মাংস আহার করি একথা জিজ্ঞাসা হইতে পারে। ইহার উত্তর নিশ্চয় করিয়া দেওয়া কঠিন। অনেকে স্বীকার করেন প্রথমাবস্থায়, মনুষ্যের বাস পৃথিবীর মধ্যস্থানে ছিল। পৃথিবীর কটি দেশ সদা

উত্তপ্ত থাকে,নানাবিধ ফল মূল প্রসব করে। অতএব ফল মূল-ভোজীদিগের জন্ম প্রথম এই স্থানে হইয়া থাকিবে। বানরগণ অদ্যাপি পৃথিবীর কেবল এই অংশেই বাস করিতেছে, নর দিগের মধ্যে কতকগুলি ক্রমে শীতপ্রদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু যৎকালে কৃষিকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিতা জন্মে নাই সেই সময় যাহারা শীতপ্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রথমে মাংস আহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শীতপ্রদেশে আহা-রোপযোগী ফলমূল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে না, কৃষি কার্য্যের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয় তাহাতে অকুলান হইলে, মৎস্য মাংস ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

যে কারণেই মাংসব্যবহার হইয়া থাকুক এক্ষণে পাকের পারিপাট্য গুণে মাংস ভক্ষণ বিশেষ সুখদ হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সুখদ হইয়াছে বলিয়া দেহের গুণকারক হয় নাই। একাল পর্য্যন্ত ডাক্তার গণ মাংসকে পুষ্টিকারক বিবেচনা করিয়া আসি-তেছেন। কিন্তু শুনা যাইতেছে যে এক্ষণে রসায়ন বিদ্যার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ফল মূল অপেক্ষা মাংস পুষ্টিকর নহে। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে যেঅংশ বিশেষ পুষ্টিকর, তাহাকে ইংরে-জিতে gluten বা albumen গ্লুটন বা এল্‌বুমেন বলে; এই অংশ মাংসে যত পাওয়া যায়, তাহার তিন চারি গুণ ফলমূলে পাওয়া যায়। একজন বিশেষ পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে মাংসে শতকরা ২৫ ভাগ পুষ্টিকর সামগ্রী আছে,কিন্তু চাউল মটর গম ইত্যাদিতে শতকরা ৮২ হইতে ৯২ ভাগ পর্য্যন্ত পুষ্টিকর সামগ্রী আছে।

একথা যদি সত্য হয়, তবে কেন আর বলাধানের নিমিত্ত মাংস ব্যবহার করি? একথা যে সত্য কি না তাহা "ফলেন পরিচীয়তে।" ফলেরও কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক-

বার ডাক্তার ফার্ব সাহেব কতকগুলি ইংরেজ, স্কচ, ও আইরিস যুবা একত্রিত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যুবকেরা সকলেই সমবয়স্ক। তাহাদের মধ্যে আইরিস যুবকগণ দৈর্ঘ্যে, গুরুত্বে, এবং শক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। ঐ আইরিস যুবারা গোল আলু ভিন্ন কখন মাংস খায় নাই। আর এক জন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে তিনি পৃথিবীতে যতই বলিষ্ঠ লোক দেখিয়াছেন নিরামিষভোজী তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কএক বৎসর হইল একটি ব্যাঘ্র এক জন গয়ালিকে আক্রমণ করিয়াছিল, গয়ালি এতই বলবান্ ছিলেন যে ব্যাঘ্রটিকে টানিয়া আপন বাটীতে আনিতে পারিয়া ছিলেন। আমাদের মনোহর চক্রবর্ত্তী, রামদাস বাবু প্রভৃতি যাঁহারা বিখ্যাত বলিষ্ঠ ছিলেন, শুনা যায় তাঁহারা কখন মাংস আহার করেন নাই।

কিন্তু এসকল ব্যক্তিবিশেষের উদাহরণ মাত্র। জনসাধারণের উল্লেখ করিতে গেলে প্রথমেই পূর্ব্বতন গ্রীক্‌দিগকে স্মরণ হয়। যাঁহাদের কীর্ত্তি অদ্যাপি ইউরোপে ঘোষিত হইয়া থাকে তাঁহারা নিরামিষভোজী ছিলেন। থারমাপিলির যোদ্ধারা কখন মাংস আহার করেন নাই। মিসর জাতিরা ফলমূল আহার করিতেন, তাঁহাদেরও বলবিক্রমের পরিচয় আছে। আর আর্য্যেরা? তাঁহাদের বীরত্ব কে না জানে? বর্ত্তমান কালের কথা স্বতন্ত্র, এক্ষণে যাঁহারা বিলাতে বিখ্যাত, তাঁহারা কেহই বাহুবলে প্রশংসনীয় নহেন, কেবল অস্ত্র বলে তাঁহাদের বল। তাঁহারা মাংস আহার করুন আর ফলমূল আহার করুন, পরিণাম তুল্য। তথাপি যে সকল জাতিরা অস্ত্রকৌশলে বিখ্যাত নহে, তাহাদের মধ্যে তুলনা করিলে মাংসাশী অপেক্ষা ফলমূলভোজীদিগের প্রাধান্য সপ্রমাণিত হইবে। লাপলাণ্ডীয়েরা মাংস আহার করে তাহারা দুর্ব্বল এবং ঘৃণিত। কিন্তু তাহাদের দেশে ফিন (Fins)

নামে আর এক জাতি বাস করে, তাহারা মাংস খায় না, লাপলাণ্ডীয় অপেক্ষা তাহারা বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘকায়। নরওএর লোকেরা নিরামিষভোজী অথচ তাহারা বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী।

তবে, আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? আমরা অধিকাংশ বাঙ্গালিই ফলমূলভোজী, আমাদের বল নাই কেন? এ বিষয় আলোচনা করা উচিত।

মনুষ্যের পক্ষে কোন্ আহার বিধেয় এ বিষয়ে যাঁহারা অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রথমে নিম্নোক্ত ইংরাজি গ্রন্থগুলি পাঠ করিবেন।

1. Fruits aud Farinacea the Proper Food of Man by John Smith.
2. The Primitive Diet of man by Dr. F. R. Lees.
3. The Scientific Basis of Vegetarianism by K. I. Trali.

কণ্ঠমালা।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষণকাল রামদাস সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী যে কে, তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে বৃক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, যুবতীর বক্ষে যাহা শিশু বলিয়া দূর হইতে বোধ হইয়াছিল, তাহা একটি ক্ষুদ্র সারঙ্গ মাত্র। রামদাস

পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? মাধবী? কখন আসিলে?"

বিনোদের সহিত যে নর্ত্তকীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারই নাম মাধবী।

মাধবী উত্তর করিল, "অদ্য আসিয়াছি অনেকক্ষণ অবধি দাঁড়াইয়া আছি কিন্তু আপনাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিতেছিলাম অদ্য নৌকায় ফিরিয়া যাই।"

রাম। না গিয়াছ, উত্তম হইয়াছে, আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম। বিনোদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

মাধ। হইয়াছিল।

রাম। কেমন দেখিলে?

সন্ন্যাসী এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র নর্ত্তকীর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিল, দৃষ্টি নত হইল। রাত্রি-কাল বলিয়া রামদাস এ সকল কিছুই দেখিতে পাইলেন না, উত্তরের বিলম্ব দেখিয়া রামদাস আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলে?"

মাধ। অবস্থা বড় ভাল নহে।

রাম। কেন? বৈদ্য সে দিবস বলিয়া গিয়াছেন, যে বিনো-দের নিমিত্ত আর কোন ভয় নাই, তিনি আরোগ্যলাভ করিয়া ছেন।

মাধ। তাঁহার শরীর ভাল আছে—

রাম। তবে, তাঁহার মনের অবস্থা ভাল নহে। শৈলের পরিচয় তাঁহাকে দিয়াছ?

মাধ। দিয়াছি।

রাম। তাহার পর?

মাধ। তাহার পর, আমি যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই

ঘটিয়াছে। এই বলিয়া মাধবী ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল।

রাম। কি ঘটিয়াছে?

মাধবী মাথা তুলিয়া উত্তর করিল, "ঘরে অগ্নি লাগিলে যদি কেহ তাহা নিবাইবার নিমিত্ত চালে লাঠি মারে তাহা হইলে অগ্নি যেরূপ আরও জ্বলিয়া উঠে।—"

রাম। তবে কি তুমি বিনোদের যন্ত্রণা বাড়াইয়া আসিয়াছ?

নর্ত্তকী আর কোন উত্তর দিল না।

রাম। তাহা বড় আমার ইচ্ছা ছিল না, আসল কথা শৈলের প্রতি তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়াছে কি না?

মাধ। তাঁহার ক্রোধ বাড়াইয়া আপনার লাভ কি?

রাম। আমার যাহা লাভ তাহা তোমায় এক্ষণে বলিবার নহে। সে কথা যাউক, আমি যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলাম তাহা সকলই করিয়াছ?

মাধ। করিয়াছি।

রাম। মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি যাহা তোমায় দিয়াছিলাম তাহা কই? সঙ্গে আনিয়াছ?

মাধ। আনিয়াছি; কিন্তু মহাশয়ের যদি আর প্রয়োজন না থাকে তবে প্রতিমূর্ত্তি খানি আমি রাখিতে অভিলাষ করি।

রাম। এক্ষণে উহা আমাকে দেও, পরে মোহান্তের অনুমতি লইয়া তোমাকে দিব। বিনোদ বাবু এক্ষণে শৈলকে হাতে পাইলে কি করেন তাহা কিছু বুঝিতে পারিলে? যদি শৈলের ব্যবহার তাঁহাকে বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া দিয়া থাক তাহা হইলে শৈলকে তিনি যে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কেমন তুমি কি বল?

মাধ। আমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমি তাঁহার যে স্বভাব দেখিলাম তাহাতে বোধ হয় না যে তিনি রাগান্ধ

হইয়া কখন সামান্য কীট পতঙ্গকেও আঘাত করিতে পারেন। বরং নিজের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিবেন তথাপি অপরাধীকে একটি নিষ্ঠুর কথা বলিবেন না।

রাম। বিনোদ কি তবে এতই অপদার্থ! তিনি শৈলকে পাইলে যে কিছুই বলিবেন না একথা আমার বিশ্বাস হয় না। যদি সত্যসত্যই কিছু না বলেন তবে বিনোদ অসার, কাপুরুষ।

মাধ। ও কথা মুখে আনিবেন না, যদি তিনি শৈলকে হত্যা করিতে পারিতেন তাহা হইলেই তাঁহাকে কাপুরুষ বলা যাইত। আপনি সে স্বভাব অনুভব করিতে পারিতেছেন না। আমি এক্ষণে যাই।

রাম। এত শীঘ্র কেন যাইবে? মহারাজ সম্বন্ধে যে কথার নিমিত্ত সে দিবস এত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলে, যে কথা শুনিতে পাইবে বলিয়া তুমি বিনোদের নিকট যাইতে সম্মত হইয়াছিলে এক্ষণে সে কথা একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া যে বড় চলিলে?

মাধ। কই বলুন না,আমি তাই শুনিব বলিয়াই আসিয়াছি।

রাম। তাহা কল্য বলিব,তুমি কি নিশ্চয় বুঝিয়াছ শৈলকে হাতে পাইলে বিনোদ সত্যসত্যই কিছু বলিবেন না?

মাধ। তিনি কিছু বলুন আর না বলুন তাহাতে মহাশয়ের লাভালাভ কি?

রাম। আমার লাভালাভ কি, তুমি স্ত্রীলোক তাহা কিছুই বুঝিতে পারিবে না; যদি কিছু আমার লাভ না থাকিবে তবে তোমায় বিনোদের নিকট কেন পাঠাইব?

মাধ। আমিও তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। কিন্তু যদি কাহার মন্দ করিবার ইচ্ছা থাকে তবে আমায় বিদায় দিন, আর

আমায় ডাকিবেন না।

রাম। তুমি যদি এতই ধর্ম্মিষ্ঠা তবে আর তোমায় ডাকিব না। কিন্তু বিনোদকে দেখিয়া আসিলে, একবার শৈলকে দেখ; তাহাকে বালিকা কালে দেখিয়াছিলে একবার তাহাকে এবয়সে দেখ।

মাধ। শৈল কোথায়?

রাম। তাহা এক্ষণে বলিব না; কল্য অতি প্রত্যূষে যদি আসিতে পার তবে তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতে পারে। আসিবার সময় তোমার সারঙ্গটি সঙ্গে আনিলে ভাল হয়, কেন না সঙ্গীত শুনিলে তাহার কষ্ট কিঞ্চিৎ নিবারণ হইতে পারিবে।

মাধ। শৈলের কি নিমিত্ত কষ্ট হইয়াছে?

রাম। আসিলে তাহা জানিতে পারিবে, তাহার ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। মৃত্তিকার নিম্নে আবদ্ধ রহিয়াছে একাকিনী বলিয়া তার বিশেষ যন্ত্রণা হইয়াছে।—

মাধ। এ কষ্ট তাঁহাকে কে দিতেছে?

"সে সকল কথা কল্য জানিতে পারিবে।" এই বলিয়া রামদাস সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মাধবী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। রামদাস অদৃশ্য হইলে মাধবী ভাবিতে ভাবিতে তরুমূল হইতে চারিদিক্ অবলোকন করিতে লাগিল। সম্মুখে শ্বেত দেবমন্দির, জ্যোৎস্নালোকে আরও শ্বেত দেখাইতেছে; তাহার ছায়া অন্ধকারময় হইয়া পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সূর্য্যালোকের ছায়ায় আলোক থাকে। চন্দ্রালোকের ছায়া কমিয়া যায়।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। বাতাস নাই, কোন শব্দও নাই; কেবল একটি শব্দ অনুভব হয়, তাহা কর্ণস্পর্শ করে না অথচ অন্তরস্পর্শ করে। সে শব্দ রাত্রির, রাত্রির নিজের—অতি গম্ভীর,

অতি ভয়ানক, অতি নিঃশব্দ। রাত্রির কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া যায় না অথচ সেই কণ্ঠে অঙ্গ কণ্টকিত হয়। যে বলিয়াছে রাত্রি ঝম ঝম করিতেছে, সে কতক বুঝিয়াছে; যে বলিয়াছে রাত্রি হু হু করিতেছে, সেও কিছু বুঝিয়াছে; আর যে কিছুই বলিতে পারে নাই সে আরও বুঝিয়াছে।

মাধবী একা দাঁড়াইয়া শৈলের কথা ভাবিতেছে। একবার শিহরিয়া বলিল "যদি আমায় এই মৃত্তিকার নীচে রাখিত তবে আমি কি করিতাম? চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিতাম? আমার কে আছে? ডাকিলেই বা কে শুনিত। শৈলের কি কঠিন প্রাণ, এখনও শৈল জীবিত আছেন। সেই শৈল! তখন শৈল কত সুন্দর, কত কোমল, কত আদরের ধন ছিলেন, এখন সেই শৈল অযত্নে মৃত্তিকার নীচে একাকিনী দিবা নিশি কাঁদিতেছেন! আমি তাঁহার সঙ্গে কাঁদিব—আমি তাঁহার সঙ্গে থাকিব!" এই বলিয়াই মাধবী সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে চলিল। তাঁহার দ্বারে যাইয়া মৃদু মৃদু সারঙ্গ রব করিল। সন্ন্যাসীর তখন অল্প নিদ্রা আসিয়াছিল; সারঙ্গ রবে আরও তাঁহার নিদ্রা গাঢ় হইল। মাধবী অনন্যোপায় হইয়া দ্বারে আঘাত করিল। সন্ন্যাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দ্বারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আঘাত করিল?" মাধবী বলিল "আমি আপনার দাসী—এক্ষণে কিছু দিনের নিমিত্ত বিদায় হইতে আসিয়াছি।" সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, কোথায় যাইবে? এই মাত্র এখানে ছিলে কই তখন ত কোন কথা বল নাই।"

মাধ। তখন অন্য অভিপ্রায় ছিল এক্ষণে আমার মন বড় ব্যস্ত হইয়াছে।

রাম। কাহার নিমিত্ত?

মাধ। আমি তাঁহার নাম করিব না, পরে জানিতে পারিবেন।

রামদাস অবাক্ হইয়া ক্ষণেক নর্ত্তকীর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন "তোমার এ দুর্দ্দশা কতদিন হইতে হইল জানি না, কিন্তু যাহার কাছে যাইবে যাও একবার শৈলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইও: কল্য অতি প্রাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

মাধ। অদ্যই ভাল, কল্য কেন?

রাম। এক্ষণে শৈল নিদ্রা গিয়া থাকিবে।

মাধ। আমি তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গাইব।

রাম। তুমি তাহার ঘরে যাইতে পাইবে না কিরূপে নিদ্রা ভঙ্গ করিবে?

মাধ। যদি তাঁহার ঘরেই আমায় যাইতে দিবেন না তবে সাক্ষাৎ কিরূপে হইবে?

রাম। সাক্ষাৎ করিতে বলা আমার ভুল হইয়াছিল, শৈলের সহিত দুইটা কথা কহিবার নিমিত্ত পাঠাইতেছি।—

মাধ। সে কথা আপনি স্বয়ং বলিবেন আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি তাঁহারে বালিকা কালে দেখিয়াছিলাম এক্ষণে কত বড় হইয়াছেন তাহা যদি দেখিতে পাই তবেই যাইব; নতুবা কেবল দুইটা কথা বলিবার নিমিত্ত যাইব না।

রাম। ভাল, নিতান্ত আবশ্যক হয় দেখা করিও কিন্তু এই কথা গুলি তাহাকে জানাইও। এই বলিয়া সন্ন্যাসী গুটি কত কথা বলিয়া দিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবিত কিছু দেখিতে না পাইলে যে কি কষ্ট তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারি না। যে নির্জ্জনে কখন আবদ্ধ থাকিয়াছে সেই কেবল এই কষ্ট জানে। মনুষ্য অভাবে যদি বিড়াল, কুক্কুর বা পক্ষীকে পাওয়া যায় তবুও নির্জ্জন বাসের অসহনীয় কষ্ট কিছুদিন একপ্রকার সহা যায়। বিড়াল আমার কথা বুঝিতে পারুক বা না পারুক তবু কথা কহিবার সময় সে আমার মুখপ্রতি চাহিবে; আদর করে আমার ক্রোড়ে আসিয়া বসিবে এই যথেষ্ট! বিড়ালের পরিবর্ত্তে এই অবস্থায় কুক্কুর পাইলে আরও সুখ। বিড়াল অপেক্ষা কুক্কুরের সহিত আমাদের সহৃদয়তা আরও অধিক। যেখানে বিড়াল কি কুক্কুর নাই সেখানে একটি পক্ষী পাইলেও কষ্ট নিবারণ করা যায়। পক্ষী তোমাকে দেখিতেছে, তোমার কথা শুনিতেছে, তোমার কথা শুনিবে বলিয়া কর্ণ পাতিতেছে; একবার বামভাগে মাথা হেলাইয়া আবার দক্ষিণ ভাগে মাথা হেলাইয়া তোমাকে দেখিতেছে অথবা তোমার কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে। তুমি কথা কহিলে না, পক্ষী আপনি কলবল করিতে লাগিল, আবার আপন কণ্ঠরোধ করিয়া তোমার কণ্ঠ শুনিবে বলিয়া মাথা হেলাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তুমি তথাপি কথা কহিলে না। পক্ষী আর সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; তুমি বুঝিলে তোমায় তিরস্কার করিতেছে। তুমি বুঝিলে যে তুমি একা নহ।

একা, অসহ্য, অস্বাভাবিক। পশুরাও একা থাকিতে পারে না, যেখানে স্বজাতি না পায় সেস্থলে অপর জাতিকে সঙ্গী পাইলেও শান্ত থাকে। একসময় একটি অশ্ব একা আবদ্ধ ছিল। ক্রমে তাহার সেই অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিল; শেষ

একটি হংস তথায় আগত হওয়ায় অশ্ব যেন প্রাণ পাইল। অশ্ব মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত আর হংসের নিকট ছাড়া থাকিতে পারিত না। হংস অশ্বের সজাতি নহে, হংসকে পাইয়া কেন অশ্ব প্রাণ পাইল? হংস আসিয়া তাহার কি উপকার করিল? অশ্ব কি ভয় পাইয়াছিল? কিসের ভয়? হংস কি তাহাহইতে অশ্বকে উদ্ধার করিতে সক্ষম?

একা থাকিলে একপ্রকার ভয় হয়, নিকটে কেহ সঙ্গী থাকিলেই আবার সে ভয় যায়। ভয়ের কারণ হইতে সঙ্গী উদ্ধার করিতে পারগ কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ে না। অনেক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে তাহারা রাত্রে একা এক ঘরে বাস করিতে পারে না কিন্তু একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু নিকটে শয়ন করিয়া থাকিলে নির্ভয়ে বাস করিতে পারে। তাহাদের এ কিসের ভয়? কোন বিপদের ভয় নহে, কেননা তাহা হইলে দুগ্ধপোষ্য বালক উপলক্ষে সে ভয় যাইত না—শিশু কোন্ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারে? এ ভয় ভৌতিকও নহে, কেননা দুগ্ধপোষ্য বালক সহায় হইলে কিরূপে ভূত নিবারণ হইবে।

এ ভয় পশুদিগের মধ্যেও বিলক্ষণ আছে—পশুদিগের মধ্যে ভৌতিক ভয় অসম্ভব। বিপদের ভয়ও নহে, হংস অশ্বকে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তবে ইহা কোন্ বিষয়ের ভয়? মনুষ্য, পশু সকলেই এই ভয় করে অথচ কিসের ভয় কেহ জানে না, কেহ অনুভব করিতে পারে না।

দেঁতোর মা হয় ত বলিবে ইহা একা থাকিবার ভয়। তাহা সত্য, কিন্তু একা থাকিতে ভয় কেন হয়, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। মূল কথা ইহা যেভয়ই হউক, অতি আশ্চর্য্য ভয়।

হয় ত ইহা ভয় নহে ইহা আর কিছু। কে জানে, কে বলিতে পারে।

শৈল একা, জীবিত কিছুই দেখিতে পায় না, তাহার অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে তথাপি শৈল নিদ্রা যায় যাই। তাহার আর নিদ্রা যাইবার কোন নিয়ম নাই, কখন দিবসে নিদ্রা যায় রাত্রে বসিয়া কাঁদে, কখন রাত্রে নিদ্রা যায় দিবসে বসিয়া গবাক্ষ দ্বারপ্রতি চাহিয়া থাকে। কখন একটি পতঙ্গ উড়িয়া আসিবে এই প্রত্যাশায় সেইদিকে চাহিয়া থাকে। জীবিত কীট পতঙ্গ দেখিবার তাহার এক্ষণে একমাত্র অভিলাষ; দেখিতে পাইলে স্বর্গ বোধ করে, দেখিতে না পাইলে কাঁদিতে থাকে। একবার একটি মাছি ধরিতে মাছিটী মরিয়া গিয়াছিল; শৈল তাহার নিমিত্ত কতই কাঁদিল, থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, পুত্র-শোকাকুলা বোধ হয় কখন এত কাঁদে না।

আর একবার একটি প্রজাপতি গবাক্ষদ্বারে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল সেজন্য শৈল কতই ব্যথা পাইয়াছিল; নায়ক ফিরিয়া গেলে নায়িকা কখন তত ব্যথা পায় নাই। শৈল উৰ্দ্ধমুখে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া মনে করিতে লাগিল "প্রজাপতি আবার আসিবে, এইখানেই আছে, এই দ্বারের পার্শ্বে উড়িতেছে, পার্শ্বে কোথায় কি কি আছে তাহা দেখিয়া আসিতেছে, প্রজাপতির এইরূপ স্বভাব, উড়িতে উড়িতে চারিদিকে দেখে, সকল দেখা হইলেই আসিবে। কই, এখন ত আসিল না, তবে কি উড়িতে উড়িতে দূরে গেল? গবাক্ষ কি ছাড়াইয়া গেল? তবে ত আর খুজিয়া পাইবে না, প্রজাপতিকে কে পথ বলে দিবে, আমি কেমন করে তায়ে ফিরাব, আমি কি বলে তাহারে ডাকিব, ডাকিলে কি সে শুনিতে পাবে? এই আমি এখানে" বলিয়া

চীৎকার করিয়া শৈল প্রজাপতিকে ডাকিতে লাগিল, ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু প্রজাপতি ফিরিল না।

তার পর শৈল ভাবিল আমি চীৎকার করিয়াছি বলিয়া হয় ত প্রজাপতি ভয় পাইয়াছে—শব্দ না করিলে আবার আসিবে। অতএব নীরব হইয়া শৈল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গবাক্ষ প্রতি চাহিয়া রহিল তথাপি প্রজাপতি আসিল না; তখন আবার চীৎকার করিয়া শৈল কাঁদিয়া বলিল, "কে হয় ত আমার প্রজাপতিকে মেরে ফেলেছে, তাহা না হইলে সে আসিত—অবশ্য আসিত—অভাগিনীকে দেখা দিতে সে আবার আসিত। এখনও হয় ত সে মরে নাই, হয় ত প্রাচীরের মূলে পড়ে আছে, পাখা যোড় করিয়া উঠিতে উঠিতে টলিয়া পড়িতেছে. আমি গেলে এখনও তারে বাঁচাতে পারি, কে তারে বাঁচাবে! সে আমার কাছে আসিতেছিল—দুঃখিনীর দুঃখ ভেবে আসিতেছিল, কে এ বাদ সাধিল।"

শৈল আর পাষাণী নাই, পাষাণ গলিয়াছে; গলিয়াছে বলিয়া সে এখন বালিকার মত এত কাঁদে। পূর্ব্বে কখন শৈল কাঁদে নাই। যে স্বামীর মরণ দেখিয়া কাঁদে নাই সে এক্ষণে একটা পতঙ্গ কি প্রজাপতির নিমিত্ত কাঁদে। বিনোদকে দেখিবার নিমিত্ত যে শৈল কখন চক্ষু ফিরায় নাই সেই শৈল এক্ষণে অতি কদাকার মনুষ্যকে দেখিতে পাইলে স্বর্গভোগ মনে করে। রামদাস সন্ন্যাসী অতি কুরূপ, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, অস্থিময়, বৃদ্ধ, কূপচক্ষু তাহাতে কতকগুলা পক্ক ভ্রূকেশ জঙ্গালবৎ আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, শৈল এই কদাকার পুরুষকে দেখিবার নিমিত্ত কত ব্যাকুলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্ন্যাসীও কখন দেখা দিত না; শৈল কতবার কাঁদিয়া বলিয়াছে "একবার দেখা দেও, না হয়, একবার কথা কও, তাহাও না হয়, একবার তোমার ছায়া

দেখিতে দেও।” সন্ন্যাসী পাষাণ; ইহার কোন কথাই শুনিত না। মনুষ্যকণ্ঠ শুনিবে বলিয়া শৈল পাগল হইয়া ফিরিত; মনুষ্য কণ্ঠ কেন? কোন কণ্ঠ শুনিতে পাইত না।

শৈল কেবল মনুষ্য দেখিতে চায় মনুষ্য কণ্ঠ শুনিতে চায়; আর কিছুই চায় না। এক দিন শৈল বসিয়া প্রতিবাসী দিগের আকৃতি, তাহাদের স্বর, তাহাদের হাসি, তাহাদের কথা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কোনপ্রকারে স্পষ্ট স্মরণ হইল না; শেষে যন্ত্রণায় শৈল অমনি আপন গলদেশ টিপিয়া ধরিল। আবার এক এক দিন শৈল ভাবিত “আমার চারি দিগে এত লোক ছিল আমি কেন তাহাদের ভাল বাসি নাই? কেন তাহাদের আদর করি নাই, কেন দিবারাত্র তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরি নাই। সেই সকল অমূল্য রত্ন থাকিতে কেন পোড়া ডাইমন কাটা মলের প্রতি লোভ করিয়াছিলাম। অলঙ্কার পরিলে আমার কি সুখ হইত।”

এই অবস্থায় এক দিন শৈল আহারান্তে অপর ঘরে আসিয়া দেখে সন্ন্যাসী এক খানি স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ হীরক ও মুক্তা-খচিত অলঙ্কার রাখিয়া গিয়াছে। শৈল তাহা দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, “আর কেন আমায় যন্ত্রণা দাও, আমি এসকল আর কিছুই চাই না, আমায় একবার দেখা দেও, একবার আমায় শৈল বলে ডাক, অনেক দিন আমায় কেহ ডাকে নাই।”

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে রাত্রি দুই প্রহর, তথাপি শৈল নিদ্রা যায় নাই, বসিয়া কত কি ভাবিতেছে। কখন পূর্ব্বাবস্থা,

কখন বর্ত্তমান অবস্থা, কখন মেঘ বৃষ্টি, কখন রন্ধন কার্য্য ভাবিতেছে; একবার মনে হইল যেন সম্মুখে হুহু করিয়া চুল্লি জ্বলিতেছে তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ হাঁড়িতে অন্ন পাক হইতেছে; শৈল অনেক দিন অন্ন খায় নাই অতএব মনে মনে অন্ন পাক করিতেছে। মনেমনে দেখিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ একটি দুইটি করিয়া হাঁড়ির অঙ্গে গ্রথিত মুক্তামালার ন্যায় লাগিতে লাগিল। তাহার পর অসংখ্য বুদ্বুদ, বুদ্বুদের উপর বুদ্বুদ উঠিতে লাগিল, আর তাহাদের স্থান হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদেরা যেন পরামর্শ করিয়া পরস্পর পরস্পরে মিলিতে লাগিল; চারি পাঁচটি একত্রে একএকটি বড় বদ্বুদ হইয়া ফুটিতে লাগিল। ক্রমে স্ফীত হইয়া হাঁড়ি হইতে উছলিয়া পড়িতে লাগিল। শৈল মনে মনে অন্নযষ্টি দ্বারা তাড়না করিল; করিবামাত্র বুদ্বুদ অদৃশ্য হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে উত্তপ্ত জল টগ্‌বগ্ করিয়া স্থানে স্থানে লাফাইতে লাগিল। শৈল হাসিতে হাসিতে মনে মনে চুল্লি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া একটু সরিয়া বসিল। ভাবিল অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত, এখন দৈতের মা কোথায়? আহারের স্থান পরিষ্কার করুক।

দৈতের মার নাম মনে আসিবা মাত্র সকল স্মরণ হইল। শিহরিয়া শরীর কুঞ্চিত করিয়া নত শিরে শৈল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। আপনার হৃদয়াঘাত আপনি শুনিতে পাইতে লাগিল।

তাহার পরে ভাবিতে লাগিল "সে কত দিন হবে। কত দিন হবে আমি এখানে এসেছি? কত দিন, কি কত বৎসর! অধিক বৎসর হবে না, অধিক বৎসর হইলে আমি বুড়ি হইতাম, বোধ হয় আমি বুড়ি হই নাই। আজ কি বার? জানি না। কি মাস তাহাও জানি না, দিন গিয়াছে দিন এসেছে, এমনি করে কত দিন গিয়াছে, হয় ত কত মাসও গিয়াছে। ফাল্গুন মাসে এখানে এসেচি, এখন কি মাস? আর

মাস জানিয়াই বা আমার কি হইবে? এক্ষণে আমার পক্ষে সকল মাস,সকল বার, সকল সময়, সমান হইয়া পড়িয়াছে। তবু কোন মাস জানিলে সুখ আছে। ফাল্গুন মাসে যখন আমি এখানে আসি, তখন বৎসরের কি সুখের দিন ছিল; বৈকালে মেয়েরা মুখ মুছে গালভরে পান খেয়ে,কলসি কাঁকে লইয়া, আঁচল ধরে জল আনিতে যাইত; আর সেই সময় মধুর বাতাস কেমন অল্পে অল্পে কাণের পাশ দিয়া যাইত; সুখে শরীর রোমাঞ্চিত হইত। আজও মেয়েরা কি সেইরূপ সুখে হাসিতে হাসিতে নদীতে যায়? যায় বই কি। তাহারা কত সুখে আছে: যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যাইতেছে,যার সঙ্গে ইচ্ছা কথা কহিতেছে, পৃথিবীর কুৎসিত সামগ্রীর উপর তাহারা দৃষ্টিপাতও করে না সুন্দর সামগ্রীই তাহারা দেখিয়া ফুরাইতে পারে না। আর আমি? আমি কুৎসিতেও বঞ্চিত। সুন্দর কুৎসিত কিছুই দেখিতে পাই না, এ পোড়া চক্ষু তবে কেন হইয়াছিল? ইচ্ছা করে নখ বিঁধিয়া তুলিয়া ফেলি। আর কাণই বা আমার কেন, আমি ত আর কিছুই শুনিতে পেলাম না। এক দিন যদি মেঘ ডাকিত তাহা হইলে হয় ত এখান হইতে শুনিতে পাইতাম। মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন সকলের শয়ন ঘরে যায়, তবে আমার ঘরে কেন নির্দ্দয় হবে। মেঘের শব্দ কি মধুর কি গম্ভীর, শব্দ কেমন আকাশে গড়াইয়া বেড়ায় আবার কেমন ধীরে ধীরে দূরে মিলাইয়া যায়। যখন মেঘের ডাক শুনিতে পেতাম, তখন তাহা শুনি নাই, তাহা বুঝি নাই। তিনি কত বলিতেন "একবার শুন।" একবারও কাণ পাতি নাই; তিনি বলিতেন বলিয়াই শুনি নাই। এখন যে আমার বুকের ভিতর কেমন করে। আবার কি কখন সেই মেঘের ডাক শুনিতে পাব? যখন শুনিতে পেতাম তখন শুনি নাই।

এই সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ বাদোদ্যম হইয়া উঠিল। শৈল চমকিয়া কর্ণে হাত দিল। উৎকট শব্দ শুনিয়া বাদ্য যেন অপ্রতিভ হইয়া আপনিই থামিল; শৈল সভয়ে মাথা ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না; কেবল এই মাত্র বোধ হইল যেন পশ্চিমদিগের লৌহদ্বার ঈষৎ মুক্ত রহিয়াছে। শৈল সেইদিকে যাইবার নিমিত্ত উঠিল কিন্তু যাইবার পূর্ব্বেই শব্দ আবার আরম্ভ হইল, এবার শব্দ অতি কোমল, অতি মনোহর: কিন্তু তথাপি শৈলের অসহ্য হইয়া উঠিল। শৈল অনেক দিন কর্ণে কিছুই শুনে নাই এখন অল্প শব্দই কর্ণের কষ্টকর হয়। তাহাতে আবার যেস্থান হইতে শব্দ বিনির্গত হইতেছিল তথায় ছাদ নাই সমুদায় খিলান। সেই স্থানের সামান্য শব্দের প্রতিধ্বনিতে ঘর পুরিয়া যায়।

শৈল কাতর স্বরে বলিল সন্ন্যাসী, তুমি আমায় কি বলিতেছ স্পষ্টকরে বল—মৃদুস্বরে বল; আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

এ কথার কেহ কোন উত্তর দিল না। শৈল ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া দেখিল আর কোন শব্দ হইল না। তখন শৈল পুনর্ব্বার কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে কথা কহিলে কি শব্দ করিলে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসি! আমি অনাথা—আমার আর কেহ নাই, আমায় রক্ষা কর। ধীরে একটি কথা কও, কথা না কও একবার কোনপ্রকারে জানাও যে তুমি ঐখানে আছ। নিকটে মানুষ আছে জানিলেই আমি আর তোমায় বিরক্ত করিব না, আমায় এখানে যতদিন রাখিবে ততদিন থাকিব কিন্তু আর একা থাকিতে পারি না। আমার ভয় করে।

এই সময় একটি গীত আরম্ভ হইল। নির্ব্বাণোন্মুখী তারা যদি কখন দূর হইতে চুপি চুপি কাঁদিয়া থাকে তবে সে যে

ম্লান মৃদু স্বরে কাঁদিয়া ছিল গীতটী সেই স্বরে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। গীতটীর প্রথমভাগ এই।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার।
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার॥

গীতটী পূর্ব্বে শৈল শুনিয়াছিল কিন্তু তখন ইহার মর্ম্ম বুঝে নাই, কর্ণপাতও করে নাই; কিন্তু এক্ষণে শুনিয়া শৈল দুইহস্তে মস্তক ধরিয়া নতশিরে নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। যে গাইতে ছিল সেও গাইতে গাইতে কাঁদিয়া ফেলিল, আর গাইতে পারিল না। অশ্রু সম্বরণ করিয়া গায়ক আর একটী গীত স্বতন্ত্র স্বরে গাইল।

প্রণয় মোর সাগর তুল, সেকি অনাদরে শুকাবার।
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার॥
সখি, কতদূরে ভানু রয়, সাগর তাহে কাতর নয়;
পসারি সে অগাধ হৃদয়; তবু তারে দেয় উপহার॥

এগীতে শৈল কাঁদিল না, মুখ তুলিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। গীত শেষ হইলে শৈল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? তুমি কোথায়? একবার আমার কাছে এসো, একবার তোমার গায়ে হাত দিয়া দেখি। আমায় বাঁচাও।"

"যাইতেছি" এই মধুর উত্তর একটী স্ত্রীকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের নিকট বসন ঘর্ষণের মরমর শব্দ হইল; তাহার পর পবিত্র পদ্ম গন্ধ, তাহার পর একটি রূপবতী আসিয়া শৈলকে ক্রোড়ে করিয়া বসিল; শৈলকে বুকে করিয়া ডাকিতে লাগিল "শৈল! ভগিনি! রাজনন্দিনী! অভাগিনি!" ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিয়া ফেলিল আর কথা কহিতে পারিল না।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ফাল্গুন ১২৮১। [১১ সংখ্যা।

কণ্ঠমালা।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলকে বুকের উপর টিপিয়া ধরিয়া কে কাঁদিল শৈল তাহা একবারও ভাবিল না; তাহাকে আদর করিয়া ভগিনী বলিয়াছে, এই বিপদ্‌কালে তাহাকে বুকে করিয়াছে, ইহাতেই শৈল গলিয়া গেল। অপরিচিতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া শৈল নিঃশব্দে কাঁদিল এবং নয়নজলে অপরিচিতার বাহুমূল আর্দ্র করিতে লাগিল। স্বামিগৃহে শৈল নানা সুখাভিলাষ করিয়াছে, সুখের নিমিত্ত চুরি পর্য্যন্ত করিয়াছে, ডাইমন কাটা মলও পরিয়াছে, কিন্তু কখন সুখী হয় নাই। অদ্য শৈল এই প্রথম সুখী হইল। সুখে কাঁদিল।

ক্ষণেক পরে শৈল সরিয়া বসিয়া চক্ষের জল মুছিল। অপরিচিতাও চক্ষের জল মুছিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল; পরস্পরে কি ভাবিতে লাগিল। একবার শৈল দুই হস্ত অপরিচিতার অঙ্গে হঠাৎ দিয়া অতি ব্যগ্র ভাবে

আপনাপনি বলিয়া উঠিল "এ কি সত্য? হয় ত আমার ভ্রম। তুমি একবার কথা কও, আমার ভ্রম কি না একবার বুঝাইয়া দেও; কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিবে? আমি কেমন করে বুঝিব? এই সুখ কতবার ভেবেছি। কে যেন আসিতেছে, কে যেন আসিল, এ আমি কতবার দেখিয়াছি। এখনও কি তাই? বল, কেমন করে বুঝাইয়া বলিবে, একবার বল। আমি একা থেকে, একা ভেবে, কেমন হইয়াছি, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সকল গিয়াছে; চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা সকলেই এখন আমায় ঠকায়। একবার ভাবি ধরেছি, আবার ভাবি কই? না। একবার ভাবি এই দেখিতেছি, আবার ভাবি কই? না। এই আমি তোমায় ধরে আছি আবার ভাবিতেছি হয় ত এসকল ভ্রম।"

অপরিচিতা কোন উত্তর না করিয়া শৈলের মস্তক আপন বুকে লইয়া শৈলের কেশগুচ্ছ মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল। শৈল বুঝিল।

গবাক্ষ দ্বার দিয়া চন্দ্রকিরণের অল্প আভা আসিয়াছিল; সেই আলোকে শৈলের আকার এক প্রকার অনুভব হইতেছিল। অস্থিময়, ক্ষুদ্রদেহ, রুক্ষ কেশ।

শৈল যখন বিলক্ষণ করিয়া বুঝিল যে সত্য সত্যই অন্যের বুকে তাহার মাথা রহিয়াছে তখন হঠাৎ উঠিয়া দুই হস্তে রুক্ষ কেশরাশি সরাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় অপরিচিতার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। অন্ধকারে থাকিয়া শৈলের দৃষ্টিশক্তি বড় তীক্ষ্ণ হইয়াছিল; যে অন্ধকারে অন্য কেহই দেখিতে পায় না সে অন্ধকারে শৈল সকলই দেখিতে পাইত। এক্ষণে জ্যোৎস্নার ঈষৎ প্রতিবিম্ব আসিয়াছিল; অপরিচিতার মুখমাধুরী শৈল বিলক্ষণ স্পষ্ট দেখিতে পাইল। কিন্তু দেখিয়া চিনিতে পারিল না।

একবার শৈল জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" অপরিচিতা

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া চক্ষের জল কষ্টে সম্বরণ করিয়া বলিল "আমি অনাথিনী, তোমার মত অভাগিনী।" উত্তর শুনিয়া শৈলের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ হইতে লাগিল, তাহার পর শৈল আবার জিজ্ঞাসা করিল "তোমার আর কে আছে?" অপরিচিতা অনেকক্ষণ পরে উত্তর করিল "আমার আর কেহই নাই, আমি একাকিনী।" শৈল ভগ্নস্বরে বলিল "বুঝেছি, তোমার কেহ থাকিলে তোমায় কেন এখানে আসিতে দিবে: তুমিই বা কেন আসিবে; অনাথিনী না হইলে কেন অনাথিনীর দুঃখ ভাবিবে।" এই বলিয়া শৈল আবার নীরব হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি?" অপরিচিতা মৃদুস্বরে উত্তর করিল, আমার নাম মাধবী। শৈল চিনিতে পারিল না।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল "তুমি যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যাইতে পাও? তোমায় কেহ বারণ করিতে পারে না?"

মাধ। আমায় কে বারণ করিবে?

শৈ। গত রাত্রে কোথায় ছিলে? মাধবী উত্তর করিল "নুরপুরে।"

শৈল আর কোন কথা কহিল না, কিঞ্চিৎ ভীতা এবং লজ্জিতা হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল। মাধবী তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিল "নুরপুরে আমার সহিত কাহারও আলাপ নাই, তথায় আর কখন যাই নাই, এই প্রথম গিয়াছিলাম। নুরপুরে গিয়া কোথাও স্থান পাই নাই; শেষ তোমার বাড়িতে গিয়াছিলাম। প্রতিবাসীরা তোমার সংবাদ কিছুই জানে না, তাহারা বলিল ঘর দ্বার গহনাপত্র সকল ফেলিয়া শৈল একা পলাইয়া গিয়াছে; কখন গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, কেন গিয়াছে, তাহাও তাহারা জানে না।"

এই কথায় শৈলের ভয় গেল। শৈল জিজ্ঞাসা করিল "কে কে একথা তোমায় বলিল?"

মাধ। আমি তাহাদের নাম জানি না, তাহারা তোমার প্রতিবাসী।

শৈ। নুরপুরে কত লোক দেখিলে? অনেক?

মাধ। অনেক।

শৈ। তাহারা কি পূর্ব্বের মত আছে?

মাধ। আগে তাহারা যেমন ছিল এখনও সেই মত আছে।

শৈ। সেই মত হাসে, গল্প করে, সেইমত বেড়িয়া বেড়ায়?

মাধ। সেই মত।

শৈ। আর গাছ পালা সেই মত আছে? বাতাস আসিলে সেই মত দোলে? চন্দ্রের আলোতে সেই মত চক্ চক্ করে?

মাধ। ঠিক সেই মত করে।

শৈল। আর আকাশ? যে দিকে যত দূর দৃষ্টি দেও তত দূর দেখা যায়?

মাধ। যায়।

শৈল। আমার একবার তাই দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহা আর কি দেখিতে পাব? আর ঘুম ভাঙ্গিলে ভোরে সেখানে সেই মত পাখী ডাকে?

মাধ। ডাকে।

শৈল। এখানে ডাকে না। নুরপুরে লোকে এখন আর কোঁদল করে?

মাধ। করে।

শৈল। আহা! কেন করে! মানুষের পক্ষে মানুষ যে কি তা তারা এখনও বুঝিল না। তুমি নুরপুরে কেন গিয়াছিলে?

মাধ। আমার কোথায়ও মনস্থির হয় না এখানে সেখানে ফিরিয়া বেড়াই।

শৈল। পূর্ব্বে তোমার কে কে ছিলেন?

মাধ। ঈশ্বর জানেন, আমি ত কাহারেও দেখি নাই।

শৈল। মা, বাপ?

মাধ। কেহই না। এক এক বার ভাবি আমি আকাশ হতে পড়িয়া থাকিব।

শৈল। যিনি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন?

মাধ। তিনিও স্বর্গে গিয়াছেন।

শৈল। পতি?

মাধ। বিবাহ হয় নাই।

শৈল। কেন?

মাধ। কে বিবাহ দিবে? আর কেই বা বিবাহ করিবে?

শৈল। তবে কি তোমার কেহই নাই, কেহই ছিল না?

মাধ। কেহই না।

শৈল। আমার সকলই ছিল, কেবল চক্ষু ছিল না। এই বলিয়া শৈল অন্যমনস্ক হইল। মাধবী বলিল "শয়ন কর রাত্রি আর বড় নাই, ঘুম না হইলে অসুখ হবে।" শৈল বিকট হাসি হাসিয়া ঐ কথা পুনরুক্ত করিল, "কষ্ট হবে! শৈলের কষ্ট হবে।" আবার ক্ষণেক বিলম্বে ধীরে ধীরে বলিল, "কষ্ট হবে" একথা আমি অনেক কালের পর শুনিলাম।

মাধবী শয়ন করিতে পুনরায় অনুরোধ করিল। শৈল অস্বীকার করিয়া বলিল, এখনও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তুমি কেমন করে আসিলে? সন্ন্যাসী জানে কি না? কেন আসিলে? এসকল না শুনিয়া আমি ঘুমাইব না।

মাধ। আমি একটু না ঘুমাইয়া আর কোন কথার উত্তর দিব না।

শৈল। তবে তুমি ঘুমাও, আমি এখানে বসিয়া থাকি।

মাধ। কেন?

শৈল। আমি ঘুমাইলে পাছে তোমায় হারাই।

মাধ। সে বিষয়ে কোন ভয় নাই। আমি কোথাও যাব না।

শৈল আর কোন আপত্তি না করিয়া মাধবীর পার্শ্বে শয়ন করিল, কিন্তু দেখিলে বোধ হয় যেন পার্শ্বে নহে, বালিকার ন্যায় শৈল মাধবীর ক্রোড়ে শয়ন করিল। পাছে মাধবীকে হারায়. এই ভয়ে শৈল মাধবীর অঞ্চল ধরিয়া নিদ্রা গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। গবাক্ষ দ্বার দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিয়া শৈলের মুখে পড়িয়াছে, শৈল তখনও নিদ্রা যাইতেছে, তখনও শৈলের হস্তে মাধবীর অঞ্চল রহিয়াছে। শৈল নিদ্রা-বসে কি স্বপ্ন দেখিতেছে; ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিতেছে যেন কি বলি-তেছে। ক্রমে মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল, ভ্রূকুঞ্চিত হইল, নাসা রন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল, শৈল রোদনোন্মুখী হইল। এমত সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল; শৈল বিস্ফারিত লোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল, যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না। চক্ষু মুছিয়া আবার চাহিতে লাগিল, এবার নিশ্চয়ই বুঝিল স্বপ্ন মিথ্যা, সেই ঘর, সেই খিলান, সেই গবাক্ষ, সেই প্রস্তর ময় প্রাচীর, সেই সকল রহিয়াছে শৈল পূর্ব্বমত বন্দী। মর্ম্ম যন্ত্রণা তাহার দ্বিগুণ বাড়িল, শেষ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। বসিবা মাত্র নিদ্রিতা মাধবীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অমনি শৈল হঠাৎ পলায়নোন্মুখীর ন্যায় শরীর বামে হেলাইয়া, আবার

বিস্ময়াপন্নের ন্যায় দক্ষিণে মাথা ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। রাত্রির কথা অল্পে অল্পে মনে আসিল।

এই সময় মাধবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়া বলিল " ও আমার দিদিরে? এখনই উঠেছ? তবে ঘুমুলে কই?" শৈল একথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল " তবে রাত্রের কথা সত্য? স্বপ্ন নহে।"

মাধ। না দিদি, স্বপ্ন নহে। তুমি একা ছিলে এখন আমরা দুই জন হইলাম, আর আমাদের ভাবনা কি? এখন দুই জনে একত্রে ঘুমাব, একত্রে জাগিব, একত্রে গল্প করিব, একত্রে হাসিব, একত্রে কাঁদিব, আর আমাদের ভয় কি?

শৈ। তবে কি তুমি আমার সঙ্গে এই খানেই থাকিবে? আমার জন্যই কি তবে এখানে থাকিতে আসিয়াছ? এত দয়ার শরীর? তুমি কি আর যাবে না?

মাধ। এজন্মে নহে। আমি কোথায় যাব? আমার কে আছে? যতকাল তুমি এখানে থাকিবে, ততকাল আমিও এখানে থাকিব।

শৈল উপাধানে মুখ লুকাইল। নিঃশব্দে কাঁদিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু মুছিয়া মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, মাধবী তখন মুখ নত করিয়াছিল। একবিন্দু নয়নজল নাসাগ্রে মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছিল, মাথা তুলিতে তাহা হর্ম্ম্যপ্রস্তরে পড়িয়া গেল। কিন্তু শীঘ্র শুকাইল না, পাষাণে নয়নজল কেন শুকাইবে? কোমল মৃত্তিকা সে জল পাইলে শুষিয়া লইত, পাষাণে সে জল অমনি পড়িয়া রহিল। মাধবী তাহাতে অঙ্গুলি লিপ্ত করিয়া একটি চক্ষু চিত্রিত করিতে করিতে বলিল "আমি এখানে থাকিব, চিরকাল থাকিব, তুমি ভিন্ন আর কেহই আমাকে তোমার

নিকট ছাড়া করিতে পারিবে না, সন্ন্যাসী কি কেহই পারিবে না কিন্তু—"

শৈ। না, না, সন্ন্যাসী জানিতে পারিলেই তোমায় লইয়া যাইবে; এখন তোমায় কোথায় লুকাব?

মাধ। আমায় লুকাইতে হইবে না, আমি যে এখানে আসিয়াছি, সন্ন্যাসী জানেন; সন্ন্যাসী আপনিই আমায় সঙ্গে করে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি আবার রাত্রে আমায় লইতে আসিবেন। কিন্তু আমি যাব না।

শৈলের মুখ শুকাইয়া গেল, আর কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তক হেলিয়া বেদির উপর ন্যস্ত হইয়া রহিল।

শৈলের দৃষ্টি পূর্ব্বমত তীব্র কিন্তু প্রখর নহে, এখন স্নিগ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব দীপ্তি যেন মেঘে ঢাকিয়াছে। শৈলের কাতরতা দেখিয়া মাধবী বুঝিল যে সন্ন্যাসী তাড়না করিলে আমি যে যাব না একথা শৈলের বিশ্বাস হয় নাই। অতএব মাধবী নানা প্রকারে তাহা বুঝাইতে লাগিল। ক্রমে শৈলের ভয় গেল, কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল।

একবার শৈল জিজ্ঞাসা করিল "আমি যে এখানে এই অবস্থায় আছি তাহা তুমি কেমন করিয়া সন্ধান পাইলে? আমায় আর কখন দেখ নাই, আমার কথা কখন শুন নাই, আমার তত্ত্ব কি গতিকে পাইলে?"

মাধ। সে অনেক কথা, তাহা আর এক সময়ে বলিব। আমি তোমায় বালিকা কাল অবধি ভাল বাসি; পূর্ব্বে তোমায় কোলে করে বেড়াইতাম, তুমিও আমার কোলে থাকিতে ভাল বাসিতে। আমায় দিদি বলে ডাকিতে। সেই বয়সেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল। তুমি আমায় ভুলিয়া গেলে কিন্তু আমি

ভুলি নাই। তাহার পর কত দিন গেল, কত কাণ্ড হল, আমিও কত দেশ বেড়াইলাম, তোমার কত সন্ধান করিলাম, কোথাও তোমার সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি শুনিলাম যে তোমার নুরপুরে বিবাহ হইয়াছিল।

শৈল। বালিকা কালের কত কথাই মনে আছে কিন্তু তোমার আকার ত ভাল মনে হয় না।

মাধ। মহারাজকে মনে পড়ে?

শৈল। কে মহারাজ?

মাধ। বটে? সত্যসত্যই তবে তুমি কিছুই জান না। তা তোমারও দোষ নাই, তুমি তখন তিন বৎসরের।

শৈল। মহারাজের বিষয় কি বল না?

মাধ। স্নানাদির পর বলিব। এখানে কোথায় স্নান করে?

শৈ। এই পার্শ্বের ঘরে স্নান আহারের সকল আয়োজন থাকে।—

এই বলিয়া শৈল সেই ঘরের দিগে চাহিয়া দেখে দ্বার খোলা রহিয়াছে। শৈল বলিল চল, সকল প্রস্তুত হইয়াছে; কিন্তু তোমার আহারের বড় কষ্ট হবে, আমি ফল মূল খাইয়া থাকি, তোমার নিমিত্তও যদি তাহাই আনিয়া থাকে।

মাধ। তুমি অন্ন খাও না কেন?

এই বলিয়া দুই জনে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে মাধবীর নিমিত্ত অন্নব্যঞ্জন পৃথক্ স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। উভয়ে স্নানাদি করিয়া আহার করিতে বসিল। এই সময় মাধবী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল যে "তুমি অন্নত্যাগ করিয়াছ কেন? কোন পীড়া হইয়াছে কি?"

শৈল। পীড়া কিছুই নহে, কে পাক করে তাহা জানি না এই জন্য খাই না।

মাধ। কেন? ব্রাহ্মণে পাক করে, দেখিতেছ না ইহা দেবতার প্রসাদী ভোগ।

শৈ। তথাপি আমার স্বপাক আহার করা উচিত।

মাধ। কেন?

শৈ। আমি বিধবা।

মাধবী আর কোন উত্তর করিল না। আহারান্তে অপর ঘরে গিয়া আবার সেই কথা উত্থাপন করিল।

মাধ। তোমায় কে বলিল যে তুমি বিধবা?

শৈ। একথা কে আর বলে থাকে? লোকে আপনিই জানিতে পারে।

মাধ। অমন অকল্যাণের কথা আর মুখে এন না, সাধ কল্পে এসকল কথা বলিতে নাই।

শৈল। অমি সাধ করে বলি নাই। বিধবা হতে কার কবে সাধ গিয়া থাকে?

মাধ। তবে তোমার ভ্রম হইয়াছে।

শৈ। ভ্রম নহে, তাঁর মৃত্যু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

মাধ। আমি তা জানি, তুমি মনে করিয়াছিলে বিনোদ বাবু মরিয়াছেন কিন্তু তিনি তখন বাস্তবিক মরেন নাই, কেবল বাক্ রোধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্যে তাঁহার সহিত কয়বার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এখন তিনি ভাল হইয়াছেন শরীরে আর কোন পীড়া নাই।

শৈল অবাক্ হইয়া মাধবীর প্রতি চাহিয়া রহিল। একবার ভাবিল মাধবী উপহাস করিতেছে। আবার ভাবিল মাধবীর মুখ ভঙ্গী সেরূপ নহে। মাধবীর ভ্রম হইয়া থাকিবে, বোধ হয় আর কাহারে দেখিয়া থাকিবে।

শৈলের সন্দেহ মাধবী বুঝিতে পারিল। মাধবী বলিল

"সন্দেহ করিও না। বিনোদ বাবু নিশ্চয় জীবিত আছেন যে বেহারা তাঁহাকে তোমার বাটীহইতে লইয়া গিয়াছিল তাহাদের সহিত আমার আলাপ আছে। আর অন্য কথা কি? তোমার দৈত্যের মা সে দিন আমার সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কেঁদে মরে।"

শৈল আর কোন কথা কহিল না নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে পদদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া ভাল হইয়া বসিল, একবার আপনার শীর্ণ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পরিধেয় ছিন্ন ক্ষুদ্র বস্ত্র টানিয়া অঙ্গাবরণ করিল, রুক্ষকেশে এক-বার হাত দিল। তাহার পর কি বলিবে মনে করিয়া মাধবীর দিগে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। মাধবী এই সময় শয়ন করিয়া অন্যমনস্কে প্রস্তরের সংযোগস্থানে নখ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতেছিল। শৈল কি বলিবে ভাবিয়া তাহার প্রতি যে চাহিতেছিল, তাহা মাধবী দেখিতে পাইল না। শৈল মুখ ফিরাইল।

কিঞ্চিৎ বিলম্বে শৈল আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া মাধবীর দিগে চাহিল। মাধবী তখনও অন্যমনস্ক। শৈল কণ্ঠ পরিষ্কার করিবার শব্দ করিল। মাধবী তখন মাথা তুলিল। শৈল এইবার সাহস করিল; দুই তিনবার উদ্যমের পর জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা কিছু হইয়াছিল?" মাধবী গম্ভীর হইয়া ক্ষণেক থাকিয়া বলিল, "তোমার কি কথা?" শৈল আর কোন উত্তর করিল না। উভয়ে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক রহিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইল, তখনও উভয়ে অন্যমনস্ক। শৈল কেন অন্যমনস্ক হইল, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় কিন্তু মাধবী কেন অন্যমনস্ক হইল, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। বিনোদ জীবিত আছেন, শৈলের ইহা প্রতীতি করাইয়া অবধি মাধবী অন্যমনস্ক। রাত্রি হইল; পরস্পর কেহ কাহাকেও আর ভাল দেখিতে পাইতেছে না, তখনও উভয়ে নীরব।

এই সময় পশ্চিমদিগের দ্বার দিয়া ঘরে দীপালোক আসিল। আসিবামাত্র শৈল চক্ষু আবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি ও কি?" শৈল অনেক কাল আলোক দেখে নাই, সামান্য আলোকও আর তাহার চক্ষে সহে না।

মাধবী আলোকের দিগে চাহিয়া দেখিল, রামদাস সন্ন্যাসী প্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। মাধবী আর কিছু বলিল না; শৈল কোন উত্তর না পাইয়া সেইদিগে চাহিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, আলোক বড় তীব্র বলিয়া বোধ হইল। আবার মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিল। এবার মাধবী বলিল, "সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।" শৈল অমনি দুই বাহুদ্বারা মাধবীকে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া ধরিয়া বলিল "সন্ন্যাসি! আগে আমায় খুন কর, তবে মাধবীকে লইয়া যাইও।" সন্ন্যাসী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাধবীকে উঠিতে বলিল। মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার ইচ্ছাকরে আমি এই খানে থাকি।"

সন্ন্যাসী। ইচ্ছা করিলেই থাকিতে পাবে না।

মাধ। এখানে থাকিলে আপনার কি ক্ষতি?

সন্ন্যা। ক্ষতি থাক আর নাই থাক, তুমি বাহির হও।

মাধ। তোমার পায়ে ধরি, আমাকে এখানে থাকিতে দেও,

আমি বাহিরে ঘুরে ঘুরে জ্বালাতন হয়েছি, এখন দুদিন এখানে থাকি। এ উত্তম স্থান; আমার মত লোকের এই স্থানই ভাল।

সন্ন্যা। ভাল হউক মন্দ হউক, তুমি এখানে থাকিতে পাবে না।

মাধ। আমি শৈলকে একা রাখিয়া যাব না।

সন্ন্যা। সহজে না যাও, গলাধরে বাহির করে দিব।

মাধ। কেন এ সকল কথা মুখে আন? তুমি চিরকাল আমাকে কন্যা বলে যত্ন করেছ, আজ তুমি আমাকে হঠাৎ কেন রূঢ় কথা বল? ও কথায় কেবল মনে ব্যথা বাড়ে।

সন্ন্যা। কন্যা হও আর যাই হও, তুমি এখনই বাহির হও, নতুবা তোমার পক্ষে ভাল হবে না। আমাকে রাগাইও না। রাগিলে তোমার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটি এই খানেই টিপিয়া বাহির করিয়া দিব।

মাধ। আমার প্রাণ বাহির করা বড় শক্ত কাজ নহে। জলবিম্ব হইতে বাতাস বাহির করা যত সহজ আমার বুকের ভিতর হইতে প্রাণ বাহির করা ততই সহজ।

সন্ন্যা। তবে আমার কথা কেন শুন না।

মাধ। এ প্রাণ লইয়া আমি কি করিব? কার জন্য বাঁচিব?

সন্ন্যাসী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ক্রোধভরে মাধবীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল। দ্বার খোলা রহিল, প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। মধবী তখন শৈলের প্রতি চাহিয়া দেখে শৈল পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমে শৈল সবলে মাধবীকে ধরিয়াছিল, ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মাধবীকে ছাড়িয়া দিয়া পার্শ্বে পড়িয়া গিয়াছিল।

মাধবী সযত্নে শৈলকে তুলিয়া আপনার ক্রোড়ে শয়ন করাইল, "ভয় কি দিদি, সন্ন্যাসী গিয়াছে" এই বলিয়া শৈলকে

বুঝাইতে লাগিল। শৈল কোন উত্তর না দিয়া চাহিয়া রহিল। শৈলের রুক্ষ কেশরাশি পাষাণময় হর্ম্ম্যোপরে পড়িয়াছিল, মাধবী তাহা তুলিতেছে, এমত সময় সন্ন্যাসী আবার আসিল। এবার সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি ভয়ানক, হস্তে শূল; সদর্পে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাধবীর সম্মুখে দাঁড়াইল, একবার বলিল, "এখনও বাহির হও।"

মাধবী কোন উত্তর করিল না। তখন সন্ন্যাসী শূল উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে মাধবীর বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া পুনরপি বলিল, "এখনও বাহির হও।" মাধবী আপন হৃদয়োপরি স্থাপিত শূল ফলাকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সন্ন্যাসীর মুখপ্রতি চাহিয়া মৃদুভাবে ঈষৎ হাসিল। "এখনও বাহির হও" বলিয়া সন্ন্যাসী শূলে শক্তি সংযুক্ত করিল। মাধবীর মুখ ম্লান হইয়া গেল: শূলের অগ্রভাগ বস্ত্রের উপর সন্নিবিষ্ট ছিল, হঠাৎ বস্ত্রে রক্ত দেখা দিল, মাধবী সন্ন্যাসীর দিকে মুখ তুলিয়া আবার একটু হাসিল। সন্ন্যাসী রক্ত দেখিতে পাইল। অমনি শূল তুলিয়া লইল; শূলাগ্রের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত আরও ছুটিয়া বাহির হইল। রামদাস শূল তুলিয়া দেখিল অগ্রভাগে রক্ত লাগিয়াছে। শৈলের অঞ্চলে তাহা পরিস্কার করিয়া চলিয়াগেল, আর মাধবীর দিকে চাহিল না। প্রদীপ পূর্ব্বমত জ্বলিতে লাগিল।

মাধবী কিয়ৎক্ষণ নতমুখে আপনার রক্তাক্ত বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পর অঞ্চল দিয়া হৃদয়ের বস্ত্র আবরণ করিয়া শৈলকে তুলিল। শৈল নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চারিদিগ্ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি সন্ন্যাসী গিয়াছে?" মাধবী বলিল, "গিয়াছেন।" পশ্চিম দিকের দ্বার খোলা রহিয়াছে, দেখিয়া শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "দ্বার খোলা কেন? তবে কি সন্ন্যাসী আবার আসিবে?" মাধবী বলিল, "জানি না, কিছু ত বলিয়া যান নাই।"

শৈলের তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; জলের কথা স্মরণ হইবা মাত্র দক্ষিণ দিকের দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দক্ষিণ দ্বার খোলা রহিয়াছে, দেখিয়া শৈল অপর কক্ষে জলপান করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে উঠিল, মাধবীরও পিপাসা হইয়াছিল কিন্তু মাধবী উঠিল না। মাধবী ধীরে ধীরে সারঙ্গটি ক্রোড়ে লইল, একে একে সকল তন্ত্রী গুলিতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া দেখিল। তাহার পর সারঙ্গ বাজিয়া উঠিল, কতক্ষণ বাজিল, তাহা মাধবী আপনিই জানিতে পারে নাই।

মাধবী সারঙ্গ রাখিয়া ভাবিল, শৈল ওঘরে এতক্ষণ কি করিতেছে। ও ঘরের দিকে চাহিয়া দেখে দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। শৈল তথায় প্রবেশ করিবামাত্রই দ্বাররুদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু সেই সময় বাদ্য আরম্ভ হওয়ায় শৈল একাগ্র চিত্তে তাহা শুনিতে-ছিল, দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল, বলিয়াই বাদ্য শৈলের কর্ণে সহ্য হইয়াছিল। বাদ্য থামিলে শৈল জানিল যে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। তখন শৈল চীৎকার করিয়া মাধ-বীকে ডাকিল; মাধবী উঠিয়া দ্বার খুলিতে গেল; কিন্তু এই দ্বারের কৌশল কিছুই জানিত না, বৃথা যত্ন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহার ক্ষত হইতে আবার রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, মাধবী পড়িয়া অচেতন হইল। শৈল প্রথমে চীৎকার করিয়া মাধবীকে ডাকিতেছিল, তাহার পর কাঁদিতে লাগিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার স্বরভঙ্গ হইয়াগেল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার ভগ্নস্বর শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই ভগ্নস্বর আরও মৃদু হইয়া পড়িল, রাত্রি শেষে আর তাহা শুনা গেল না। শৈল তখনও মাধবীকে ডাকিতেছে কিন্তু স্বর ফুটিতেছে না, অথচ ডাকিতেছে।

বাহুবল।

সাংসারিক কার্য্যের নিমিত্ত এপৃথিবীতে নিত্য কত শক্তি ব্যয় হইতেছে তাহা অনুভব করা মনুষ্যের অসাধ্য, তথাপি একবার অনুভব করিতে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সে অনুভব কি প্রকারে করা যাইবে? আমরা কস্মিন কালে শক্তির নিমিত্ত খ্যাতি লাভ করি না; শক্তি লইয়া বড় একটা কথা বার্ত্তা কই না, কাজেই শক্তিপরিমাণের আমাদের কোন ভাষা নাই। ইংরেজেরা শক্তির আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে শক্তিপরিমাণের উপায় আছে, ভাষাও আছে। এই দ্রব্য স্থানান্তর করিতে কত শক্তি লাগিবে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিবেন, এত অশ্ববল লাগিবে। অশ্ববল লইয়া তাঁহারা শক্তি পরিমাণ করেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দিগের মধ্যে হস্তিবল দ্বারা শক্তি পরিমিত হইত; তাঁহারা আপনারা শক্তিমান্ ছিলেন. শক্তির পরিমাণ করিতে পারিতেন। এক্ষণে আমরা দুর্ব্বল, আমাদের মধ্যে শক্তিপরিমাণের কোন কথা নাই।

কিন্তু আমরা যতই দুর্ব্বল হই না কেন, আমাদের মধ্যে শক্তি নিত্য ব্যবহৃত হইতেছে; শক্তি না থাকিলে সংসারের কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হয় না। আমাদের এই দুর্ব্বল অবস্থায় নিত্য কত শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা অনুভব করিতে হইলে আশ্চর্য্য হইতে হইবে। কেবল জল আহরণ সম্বন্ধে নিত্য কত শক্তি ব্যয়িত হয় তাহা অনুভব করিয়া দেখুন; জলের কলস অনবরত পুষ্করিণী হইতে পূর্ণ করিয়া আনিতে হইতেছে; প্রত্যেক বার জল আনিতে কত শক্তিব্যয় হয়? প্রত্যেক সংসারে জলের নিমিত্ত নিত্য কত শক্তির আবশ্যকতা হয়? তাহার পর অনুভব করুন, প্রত্যেক গ্রামে জলের নিমিত্ত কত শক্তিব্যয় হয়। শেষ,

অনুভব করুন, বাঙ্গালার সমস্ত গ্রামে কেবল এই এক বিষয়ে নিত্য কত শক্তিব্যয় হয়।

এইরূপে আবার কৃষিকর্ম্ম, গৃহনির্ম্মাণ, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে নিত্য কত শক্তিব্যয় হইতেছে। এই শক্তিহীন বাঙ্গালায় প্রত্যহ যে শক্তি ব্যয়িত হইতেছে তাহার অতি সামান্য অংশ অনুভব করিতে পারিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। নিত্য এইরূপে সমস্ত পৃথিবীতে কত শক্তিব্যয় হয়, তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করুন। তাহার পর সৃষ্টি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কত শক্তিব্যয় হইয়াছে, তাহা অনুভব করুন, কিন্তু তাহা অনুভব করা মনুষ্যের অসাধ্য, সে অনুভব করিতে পারিলে স্বয়ং মহাদেবও অবাক্ হইবেন। এত শক্তির ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এত শক্তি নিত্য ব্যয়িত হইতেছে, তথাপি শক্তি ফুরায় না! শক্তি অনন্ত! তাহাই বুঝি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ শক্তির পূজা করিতেন!

পূজার নিমিত্ত শক্তির নানাপ্রকার রূপ কল্পিত হইয়াছে। সে সকল মূর্ত্তির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, তাঁহারা যে শক্তি পূজা করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাপি আমরা যে শক্তি পূজা করিতেছি, তাহা কেবল বাহুবল, অন্য শক্তি নহে। শক্তির মূর্ত্তি দৃষ্টি করুন; কোন প্রতিমা চতুর্ভুজা, কোনটি ষড়্‌ভুজা, কোনটি দশভুজা। অধিক বল কল্পনা করিবার নিমিত্ত অধিক বাহু কল্পনা করা হইয়াছে। আবার সেই সকল বাহুর প্রতি দৃষ্টি করুন; তাহার কোনটিতে খড়্গ, কোনটিতে শূল, কোনটিতে মূষল, এইরূপ নানাবিধ বাহুবলব্যঞ্জক অস্ত্র রহিয়াছে। অতএব আমরা বাহুবলের পূজা করিয়া থাকি, তাহার আর সন্দেহ নাই।

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বাহুবলই সর্ব্বস্ব, বাহুবল থাকিলে আর কিছুরই অপ্রতুল থাকে না। এ অবস্থায় সকলি আপন

আপন রক্ষক। যাহার বাহুবল থাকে, কেবল সেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, কেবল সেই আত্মোদর পূরণ করিতে সমর্থ হয়। বাহুবল না থাকিলে আদিম অবস্থায় প্রাণধারণ করা অতি কঠিন। অতএব এই অবস্থায় বাহুবল যথার্থই পূজ্য।

আদিম অবস্থার পর যতই সমাজের উন্নতি হইতে থাকে, ততই অধিক বলের প্রয়োজন হয়। প্রথমে, আত্মরক্ষা, পশু-হনন প্রভৃতি দুই চারিটি বিষয়ে বলের প্রয়োজন হইত কিন্তু সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে বলের প্রয়োজন হইতে থাকে। অধিক বলের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু বাহু-বলের প্রয়োজন আর পূর্ব্বমত থাকে না। বাহুবল, আর শারীরিক বল, আমরা এক অর্থে গ্রহণ করিয়া বলিতেছি।

আদিম অবস্থার পর কৃষি কর্ম্ম আরম্ভ হয়। ভূমি কর্ষণে বিস্তর বাহুবল প্রয়োজনীয় কিন্তু এই সময় মনুষ্যেরা পশুদিগকে বশ করিতে শিখে: ভূমিকর্ষণের অনেক কর্ম্ম পশুদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতে থাকে। দ্রব্যাদি গৃহে আনিতে হইলে বা অন্য স্থানে লইয়া যাইতে হইলে, গো মহিষাদি আসিয়া সে কার্য্য সম্পন্ন করে, সে কার্য্যে আর আমাদের শারীরিক বল ব্যয়িত হয় না। আদিম অবস্থায় সকল বিষয়ে আমাদের আপন আপন বাহুবলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। তাহার পর অবস্থায় আমাদের নিজ বাহুবলের প্রতি নির্ভর করিলে যে সকল কার্য্য কস্মিন কালে আমরা উদ্ধার করিতে পারিতাম না, তাহা অশ্ব, গজ প্রভৃতির শারীরিক বলের সাহায্যে অনা-য়াসে উদ্ধার হইতে থাকে। যাহা আমরা ভাঙ্গিতে কি তুলিতে পারি না, তাহা হস্তী দ্বারা ভাঙ্গাই, বা তুলাই; অথবা যাহা আমাদের আপনাকে বহন করিতে হইত, তাহা অশ্ব গবাদি দ্বারা বহন করাই। আদিম অবস্থাপেক্ষা এই অবস্থায় বলব্যয়

অধিক হয় বটে কিন্তু সে সমুদয় বল আমাদের আপনাদের শারীরিক বল নহে, তাহার অনেকাংশ পশুর বল। আদিম অবস্থার পর এই দ্বিতীয় অবস্থাকে স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত আপাতত পাশব বলিব।

এই পাশব অবস্থার পর, সমাজের তৃতীয় অবস্থায় নানাবিধ শিল্প যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। আমাদের শারীরিক শক্তির আবশ্যকতা তখন আরও কমিয়া যায়। যে কার্য্যে শতজনের বাহুবল আবশ্যক হইত, সেই কার্য্য এক্ষণে একজনের বাহুবলে সম্পন্ন হইতে থাকে। যে ভার শত লোকে তুলিতে পারিত না, সেই ভার এক্ষণে কপি কল, বা কপি যন্ত্রের দ্বারা দুই চারিজনে তুলে। সমাজের এই অবস্থাকে শিল্পাবস্থা বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না।

তাহার পর সমাজের বৈজ্ঞানিক অবস্থা। বিজ্ঞান বলে অসাধ্যসাধন হয়। তখন অগ্নি, বায়ু, বরুণ, পরস্পর সকলেই সমাজের দাসত্ব স্বীকার করে। তখন তাহারা আমাদের গাড়ি টানে, নৌকা চালায়, জল সেচে; আমাদের বলের কত সাশ্রয় করে। দিল্লি হইতে এক দিবসের মধ্যে দ্রব্যাদি আনিতে হইলে, অগ্নি, বরুণ রেলের গাড়িতে করিয়া দ্রব্যাদি অবিলম্বে আনিয়া দেয়; সমুদ্রপারে দ্রব্যাদি শীঘ্র পাঠাইতে হইলে, অগ্নি, বায়ু, বরুণ কলের জাহাজে করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া ছুটে। সমুদ্রে তোমার দ্রব্যাদি ডুবিয়াছে, আকাশ হইতে বিদ্যুৎ আসিয়া তোমার দ্রব্যাদি তুলিয়া দিল; বিজ্ঞান আমাদের বাহুবলের কার্য্য করিতেছে, অনেক সময় আমাদের বাহুবলের অতিরিক্ত কার্য্য করিতেছে। কাজেই বাহুবলের অপ্রতুলতা আর বিশেষ অনুভূত হয় না। যাহাও কিছু এক্ষণে অনুভূত হয়, পরে তাহা আর

হইবে না। বৈজ্ঞানিক অবস্থার এই প্রথম আরম্ভ মাত্র, ইহার পরে আর কি হয় বলা যায় না।

যে চারি অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত হইল তদ্দ্বারা দুইটি মূল বিষয় উপলব্ধ হইতেছে।

প্রথম বিষয়। অসভ্যাবস্থা অপেক্ষা সভ্যাবস্থায় বলব্যয় অধিক হয়। সমাজ যত উন্নত হইবে, বলব্যয় ততই বাড়িবে। বলব্যয় স্থগিত কর, সমাজের উন্নতিও স্থগিত হইবে। কোন সমাজে বলব্যয় কত হয়, জানিতে পারিলে, সে সমাজের উন্নতির অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। যে সমাজে এক কোটি লোক আছে, সে সমাজে যদি এক কোটি লোকের উপযুক্ত বলব্যয় হয়, তবে বলিব যে, সে সমাজের আদিম অবস্থা মাত্র, তাহার কোন উন্নতি হয় নাই। আর যে সমাজের এক কোটি লোক আছে কিন্তু শত কোটি লোকের উপযোগী বলব্যয় হয়, সে সমাজের বৈজ্ঞানিক অবস্থা বলিব, সে সমাজ বিলক্ষণ উন্নত।

এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে। পূর্ব্বকালের রাজারা প্রজাবৃদ্ধির বড় উৎসাহ দিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন প্রজা বাড়াইলে রাজ্যের বলবৃদ্ধি হইবে। তাঁহারা এক্ষণে জীবিত থাকিলে বুঝিতে পারিতেন, যে প্রজাবৃদ্ধি না হইয়াও রাজ্যের বলবৃদ্ধি হইতে পারে। বাঙ্গালায় এক্ষণে অতিশয় প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ বলবৃদ্ধি হয় নাই। সমাজোন্নতির একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে সমাজে যত লোক থাকে, উন্নত সমাজ তাহার অতিরিক্ত লোকের বল ধারণ করে। যে সমাজে শত লোক আছে, সে সমাজ উন্নত হইলে সহস্র লোকের কার্য্য করিবে, সহস্র লোকের সঙ্গে তুল্য হইবে; আবার সে সমাজ আর একটু উন্নত হইলে সেই শতলোক শতসহস্র লোকের বল ব্যয় করিতে সক্ষম হইবে কিন্তু তাহা বলিয়া যে সেই শত

লোকের শারীরিক বল বাড়িবে তাহা নহে। তাহাদের বৈজ্ঞানিক বল বাড়িবে।

দ্বিতীয় বিষয়। সমাজের বল বৃদ্ধি হইলে সঙ্গে সঙ্গে কেবল বাহুবল বৃদ্ধি হয় না। বৈজ্ঞানিক বল যে কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার সীমা নাই, কিন্তু বাহুবলের সীমা আছে। আদিম অবস্থায় বাহুবল সেই সীমাপ্রাপ্ত হয়; সে অবস্থায় বাহুবল ভিন্ন আর উপায় থাকে না, কাজেই সেই বলের সম্পূর্ণ চালনা হইতে থাকে। পাশব অবস্থায় বাহুবলের চালনা লোপ হয় না, তখনও বাহুবলের বিলক্ষণ গৌরব থাকে; কিন্তু শিল্পাবস্থায় কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আরম্ভ হয়। শেষ বৈজ্ঞানিক অবস্থায় বাহুবলের আর বিশেষ আলোচনা আবশ্যক হয় না; যাহা বাহুবলে হইত, তাহা বিজ্ঞান বলে হইতে থাকে। যুদ্ধের উদাহরণ গ্রহণ করিলে এ কথার কতক মীমাংসা হইবে।

আদিম অবস্থায় মল্লযুদ্ধ; বাহুবলে বাহুবলে যুদ্ধ হইয়া থাকে: যেদিকে বাহুবল অধিক, সেই দিকেই জয়। তাহার পর কাষ্ঠ নির্ম্মিত বা লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহৃত হইতে থাকে। তখনও বাহুবলের প্রয়োজন; বাহুবল অনুসারে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়, যেদিকে বাহুবল অধিক সেই দিকেই জয়লাভ হয়। শেষ বৈজ্ঞানিক অস্ত্র প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইলে আর অস্ত্র নিক্ষেপের জন্য বিশেষ বাহুবলের প্রয়োজন হয় না। তখন বলিষ্ঠ ও দুর্ব্বলের গুলি শত্রু সংহারে তুল্যই কার্য্য করে।

যে পর্য্যন্ত যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত যোদ্ধার বাহুবিক্রম লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে কোন্ যোদ্ধা বাহুবলের নিমিত্ত বিখ্যাত? এক্ষণকার যুদ্ধ প্রায় অঙ্ক শাস্ত্রের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে।

যুদ্ধে পূর্ব্বে যত বলব্যয় হইত, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক

ব্যয় হইতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যত বাহুবলের আবশ্যকতা হইত, এক্ষণে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। বণিজ্যেও ঐ রূপ। পূর্ব্বে বাণিজ্য উপলক্ষে যত শারীরিক বল আবশ্যক হইত, এক্ষণে তত আবশ্যক হয় না, অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা বাণিজ্যে অধিক বলব্যয় হইতেছে। যুদ্ধ কি বাণিজ্যে এক্ষণে যে অতিরিক্ত বল ব্যয় হইতেছে, তাহা অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক বল। পূর্ব্বে বাহুবল প্রধান ছিল, এক্ষণে বৈজ্ঞানিক বল প্রধান হইয়াছে; বৈজ্ঞানিক বল ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা আরও বৈজ্ঞানিক বলের উন্নতি সাধন করুন। বাহুবলের সময় গিয়াছে, বৈজ্ঞানিক অবস্থায় যে পরিমাণে বাহুবল প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় আমাদের যথেষ্ট আছে।

সৎকার।

সকল দেশে এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা আছে, কোথাও বা দাহ করা রীতি কোথাও বা মাংসাশী পশু পক্ষী দ্বারা মৃতদেহ ভক্ষণ করাইবার রীতি, কোথায়ও বা সমাধি দেওয়া প্রথা প্রচলিত। ইহার মধ্যে বোধ হয়, পৃথিবীস্থ তৃতীয়াংশ মনুষ্য এই শেষ প্রথাবলম্বী। মৃত্তিকাভ্যন্তরে অনেক দিন পর্য্যন্ত শবদেহ বিনষ্ট হয় না। যদ্যপি কাষ্ঠের সিন্দুকে করিয়া মৃত্তিকাশায়ী করা হয়, তবে ঐ দেহ প্রায় আট দশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। পুরাকালে মিশর দেশে মৃত্যুর পর উদর হইতে অন্ত্রী নির্গত করিয়া একপ্রকার মশলা পূর্ণ করিয়া আত্মীয় কুটুম্বেরা নিজ নিজ সমাধিস্থলে বসাইয়া রাখিয়া আসিত। এই অবস্থায় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঐ শরীর

অবিনষ্ট থাকিত। অদ্যাপিও ঐ শুষ্ক দেহ (মামী) কোন কোন মিউজিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়। নিজ নিজ ভূতে বিলয়প্রাপ্ত হওয়া বোধ হয় শরীরের শেষ উদ্দেশ্য। দগ্ধ করিলে পর শরীর শীঘ্রই ঐ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকাসাৎ হইলে ঐ পরিবর্ত্তনে কালবিলম্ব হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত উহার ধ্বংস না হয়,ততদিন মৃতশরীর হইতে পূতিময় অস্বাস্থ্যকর বায়ু উৎপাদিত হইতে থাকে। এই জন্য গোরস্থান সন্নিহিত আবাস অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিগণিত। মৃতদেহ দাহ করিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সে আশঙ্কা নাই বলিয়া এখন ইউরোপীয় সুসভ্য দেশে দাহ প্রথা প্রচলিত করিবার আন্দোলন হইতেছে। জারমানী দেশে অনেক স্থানে লৌহময় চিতা প্রস্তুত হইয়াছে এবং তথায় অল্প সময় মধ্যে অনেক শবদাহ হইয়াছে। ঐ যন্ত্রে এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত শরীর ভস্মীভূত হইয়া অত্যল্পমাত্র থাকে। স্বজনবর্গ তাহাই সযত্নে একত্র করিয়া রৌপ্যময় পাত্রে স্নেহ-নিদর্শনস্বরূপ লইয়া যান।

আমাদিগের দেশে দাহ করিবার যে রীতি আছে, তাহা নিতান্ত নিষ্ঠুর। শবদেহ চিতার উপর শয়ান করাইয়া সন্তান দ্বারা তাহার মুখাগ্নি করান পৈশাচিক কার্য্য। আবার তদুপরি মধ্যে মধ্যে লগুড়াঘাত করা আরও নিষ্ঠুরতা।

সামর্থহীন লোকেরা নদীতীরে মৃতশরীর নিক্ষেপ করিয়া যায়। তথায় শৃগাল কুক্কুরে এক রাত্রের মধ্যে উহার অস্থি-ব্যতীত সমুদায় নিঃশেষ করিয়া রাখে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শৃগাল, কুক্কুরেরা আমাদিগের পল্লীগ্রামে কত প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবেক। ইহারাই তথাকার মিউনিসিপাল কার্য্যের তত্ত্বাবধারক।

পারসী দিগের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্বতন্ত্র প্রথা। তাহারা

মৃত্যুর পর ঐ দেহ নদীতীরস্থ সমাধি স্থলে এক উচ্চ স্তম্ভোপরি রাখিয়া আসে। তথায় শকুনী গৃধিনী আসিয়া অত্যল্প সময়-মধ্যে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। ভক্ষণের পর অবশিষ্টাংশ নিম্নস্থ জলে পতিত হইয়া মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তুর আহার হয়। আত্মীয়বর্গেরা দূরহইতে ঐ মর্ম্মভেদী দৃশ্য লক্ষ্য করিতে থাকেন এবং যদ্যপি মৃতদেহের চক্ষু শকুনীদ্বারা সর্ব্বাগ্রে ভক্ষিত হইতে দেখেন, তবে আত্মীয় পুণ্যাত্মাছিলেন মনে করিয়া আনন্দ লাভ করেন। পশু পক্ষীর দ্বারা মৃতদেহ ভক্ষণ করান, শুনিতে নিষ্ঠুরতা কিন্তু মৃত্যুর পর পরের উপকারে কলেবর সমর্পণ করা এই প্রথার প্রধান উদ্দেশ্য।

দেশভেদে যে প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথা ভেদ আছে, ঐ প্রকার আবার সৎকারের সময়ভেদ আছে। আমাদিগের দেশে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং শরীরের উত্তাপ স্বত্বেও দেহ চিতাশায়ী করা হয়। এপ্রকার তৎপর হইবার কারণ প্রথমতঃ এদেশে উত্তাপ প্রবল, কাল-বিলম্ব করিলে দেহ পচিতে আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ সৎকার কার্য্য যতক্ষণ সমাধা না হয় ততক্ষণ বালক বালিকাদিগকে অনাহারী থাকিতে হয়। তৃতীয়তঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৃতদেহ আত্মীয়বর্গের নয়নগোচর থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শোক প্রবল থাকে। এই শেষ বিষয়ে ইংলণ্ডীয়দিগের মানসিক অবস্থার আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা দেখা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৃতদেহ গৃহে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা ধৈর্য্য ও শোক সম্বরণ করিয়া থাকেন। তৎপরে শব বাহির করিবার সময় মৃত ব্যক্তি চিরকালের জন্য অদৃশ্য হওয়ায় তাঁহাদের শোক একবারে উছলিয়া উঠে।

ক্রমশঃ

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড।| চৈত্র ১২৮১। |১২ সংখ্যা।

সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর আপস।

এই প্রবন্ধটি আমরা বহুদিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু যথাসময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই।

সং

এক দিবস বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী অন্তঃপুরে বসিয়া পাদপদ্মে অলক্তক পরিতেছেন, এমত সময় স্বয়ং ভগবান্ জনার্দ্দন কতক গুলিন বঙ্গদেশীয় সম্বাদপত্র হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং নিকটে বসিয়া লক্ষ্মীর করকমল আপন হস্তমধ্যে লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বলিলেন, "হে কমলা, আমি কিঞ্চিৎ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি বলিবে বিষ্ণুর আবার বিপদ্ কি? আমার বিপদ্ আছে; স্মরণ করিয়া দেখ, অনেকবার বিপদে পড়িয়াছিলাম; সম্প্রতি আবার বিপদে পড়িয়াছি। এই সকল সমাচার পত্র পড়িয়া দেখ, বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ

উপস্থিত। শিব সংহারকর্ত্তা, মনুষ্য মরিলেই তাঁহার খোষনাম। আমি পালনকর্ত্তা, অপালনে বাঙ্গালি মরিলে আমার বদনাম, ইহার নিমিত্ত একান্ত পদচ্যুত না হই, অভাবপক্ষে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই, অপালন দোষের প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা জান ত?"

লক্ষ্মী একে একে সম্বাদপত্র গুলিন পড়িয়া তাহা স্বামীর হস্তে পুনরর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে উপায়?

নারায়ণ বলিলেন, এক্ষণে উপায় তুমি। তুমি যদি একবার বাঙ্গালায় যাও, তাহা হইলে বাঙ্গালির সকল ক্লেশ নিবারণ হয়। মনে করে দেখ, তুমি অনেক কাল বাঙ্গালায় যাও নাই। বাঙ্গালিরা তোমার নিতান্ত অনুগত; তুমি একবারও যাও না, অথচ তাঁহারা প্রায় প্রতিমাসে তোমার পূজা করে।

লক্ষ্মী উত্তর করিলেন, আমি যাই না কিন্তু আমার পেচক গিয়া থাকে। আমি যে যাই না, তাহার কারণ আছে। শুনিয়াছি ইদানীং সরস্বতী নাকি বাঙ্গালায় যাতায়াত করিতেছে, সরস্বতীর সঙ্গে আমার চিরবিরোধ, সরস্বতী বাঙ্গালায় গেলে আমি যাব না।

নারায়ণ বলিলেন, যে কথা শুনিয়াছ, তাহা মিথ্যা। সরস্বতীও বলিয়া থাকেন, যে এক্ষণে বাঙ্গালায় লক্ষ্মী যাতায়াত করিতেছেন, অতএব আমি যাব না। এইরূপে বাঙ্গালার প্রতি তোমাদের উভয়ের অযত্ন জন্মিয়াছে। সময় পাইয়া মনসা, শীতলা, ওলাদেবী প্রভৃতি বাঙ্গালা এক্ষণে অধিকার করিয়াছে। ইহা ত ভাল নহে। আর সরস্বতী বাঙ্গালায় যাতায়াত করিতেছেন, শুনিয়া যে তুমি বাঙ্গালায় যাবে না, তাহাও ত ভাল নহে। তাঁহার প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ কেন? সময়ে সময়ে দেখিয়াছি তুমি সরস্বতীর সহিত এক ঘরে বাস করিয়াছ, আবার

বিরোধও করিয়াছ। ইহা কেবল তোমাদের স্ত্রী স্বভাব বশতঃ হইয়া থাকে। সে যাহাই হউক এক্ষণে আর বিরোধ করিও না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া আমার সম্ভ্রম রক্ষা কর। তুমি অদ্যই একবার বাঙ্গালায় যাও। তথায় তোমার নিমিত্ত পূজার আয়োজন হইয়াছে।

লক্ষ্মী বলিলেন, প্রভো! আমি কখনই আপনার অবাধ্য হই নাই। আপনি অনুমতি করিতেছেন, আমি অবশ্য যাইব। কিন্তু আমার সঙ্গে লোক দিতে হইবে, বাঙ্গালায় একা যাইতে আমার বড় ভয় করে। বহুকাল হইল একবার দুর্গোৎসবের পরে বাঙ্গালায় গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। সকল বাড়িতেই দেখি যে এক বিকটাকার নির্লজ্জ মাগি উলঙ্গ হইয়া আপন স্বামীর বুকে দাঁড়াইয়া আছে—আর বাঙ্গালিরা তাহাকে মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছে। মাগির হাতে নরমুণ্ড, অঙ্গে রুধির, ওষ্ঠে রুধির, দন্তে রুধির, মাগি বুঝি মানুষ খাইয়াছে, আমার দেখিয়া ভয় হইল, আমি পলাইলাম। আমার সেই পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যাইতে ভয় হয়।

নারায়ণ বলিলেন, তুমি অল্পতেই ভয় পাও, কিছুই তদন্ত না করিয়া পলাও এই তোমার দোষ। যাহা দেখিয়াছিলে তাহা গঠিত প্রতিমা মাত্র। বাঙ্গালিরা ভগবতীর এই প্রকার রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিয়াছিল। লক্ষ্মী শিহরিয়া বলিলেন, সেকি জনার্দ্দন! ভগবতীর দেব মূর্ত্তি থাকিতে বাঙ্গালিরা কেন পৈশাচিক মূর্ত্তি অনুভব করিয়া লইয়াছে? জনার্দ্দন বলিলেন, বোধ হয় যে যেমন, সে সেইরূপ দেবদেবী চায়, নতুবা ভক্তি করিতে পারে না, তাহাই তাহারা আপনাদের জগজ্জননীর এইরূপ মূর্ত্তি বাছিয়া লইয়াছে। লক্ষ্মী বলিলেন, মনুষ্যেরা যে দেবতাকে ভক্তি করে, সতত তাঁহার অনুকরণ করে। বাঙ্গালিরা যদি এই

মূর্ত্তির অনুকরণ করিয়া থাকে, তবে বাঙ্গালা কি ভয়ানক স্থান হইয়া উঠিয়াছে? অতএব আমি আর তথায় যাইব না।

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বাঙ্গালিরা এক সময় বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে সে সকল নাই, তবে দুই একটি সামান্য বিষয়ে এই মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় এক্ষণে পুরুষেরা স্ত্রীচরণে আপনাদিগের বুক পাতিয়া দিয়া থাকে, এবং স্ত্রীকে উলঙ্গ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত শান্তিপুরে ধুতি পরাইয়া দেয়, এতদ্ভিন্ন আর কোন অনুকরণ চিহ্ন আমি দেখিতে পাই না। মৎস্য হত্যা ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কোন হত্যা প্রায় নাই। বঁটী ব্যতীত আর কোন অস্ত্র নাই—অতএব বাঙ্গালায় কোন ভয় নাই, কোন পৈশাচিক নিয়ম নাই। অদ্য পূর্ণিমা তুমি একবার বাঙ্গালায় যাও।

লক্ষ্মী যে আজ্ঞা বলিয়া উদ্যোগ করিতে কক্ষান্তরে গেলেন। নারায়ণ আনন্দোৎফুল্ল লোচনে লক্ষ্মীর অলক্তক শোভিত পাদপদ্ম দেখিতে দেখিতে সদর বাটীতে চলিলেন।

পর দিবস অপরাহ্নে নারায়ণ অন্তঃপুরে আসিয়া পরিচারিকাকে লক্ষ্মীর প্রত্যাগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচারিকা বলিলেন, ভুবনেশ্বরী বাঙ্গালা হইতে আসিয়া শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার পীড়া বোধ হইয়াছে। শুনিতেছি জ্বর হইয়াছে। নারায়ণ ভাবিলেন, অনেক কালের পর বাঙ্গালিরা লক্ষ্মীকে গৃহে পাইয়া অতিরিক্ত আহার করাইয়া থাকিবে। স্ত্রীজাতি সর্ব্বদাই লোভ পরবশ; লোভ সম্বরণ করিতে না পারায় পীড়া বোধ হইয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে নারায়ণ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন লক্ষ্মী শিরঃপীড়ায় বড় কাতর, আর শ্লেষ্মায় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নারায়ণকে দেখিয়া লক্ষ্মী কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, বাঙ্গালায় বড় কষ্ট পাইয়াছি। নারায়ণ বহু যত্নে

সান্ত্বনা করিয়া বিরিনি কোম্পানির দোকান হইতে হমিওপাথির পলসাটিনা ঔষধি তৎক্ষণাৎ আনাইয়া এক মাত্রা খাওয়াইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। পরে নারায়ণের অনুরোধানুসারে আপন ক্লেশ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, প্রভো, বাঙ্গালায় যাইয়া প্রথমে আমি একটি মনোহর গৃহের উপবন দেখিয়া বড় প্রীতি লাভ করিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া হাসিতেছে—নিকটে ছোট ছোট ছেলে গুলি হাসিতে হাসিতে দৌড়িতেছে। গৃহাভ্যন্তর আরো মনোহর; কক্ষপ্রাচীর অমল শ্বেত, স্থানে স্থানে স্বর্ণবেষ্টিত পট, হর্ম্ম্যতলে বিবিধ বিচিত্র আসন। সকল স্থানে, সকল দ্রব্য পরিষ্কার, পবিত্র, যেন দেবতাদিগের নিমিত্ত রক্ষিত। কোথাও কোন অসুখ শব্দ নাই—কলহ নাই—সকলই শান্ত; সকলে যেন আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি প্রসন্ন ভাবে বসিতে উদ্যোগ করিতেছি, এমত সময় সঙ্গিনী আমার অঞ্চল টানিয়া মৃদু স্বরে বলিল কর কি? এ তোমার অবস্থিতির স্থান নহে, শীঘ্র পলাও এ ম্লেচ্ছের গৃহ। আমি শুনিবামাত্রই পলাইলাম। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলাম, ম্লেচ্ছগৃহ যদি এরূপ পরিষ্কার, তবে না জানি হিন্দুগৃহ আরো কতই পরিষ্কার হইবে। বাঙ্গালি পূর্ব্বাপেক্ষা কত উন্নত হইয়াছে; আমি বাঙ্গালায় আসি নাই তাহাতে বাঙ্গালার কোন ক্ষতি হয় নাই।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম এমত সময় সঙ্গিনী বলিল "এই গৃহে প্রবেশ করুন এ গৃহ হিন্দুর।" আমি প্রথমে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিলাম, কিন্তু শেষে সঙ্গিনীর কথানুসারে অন্দরে প্রবেশ করিয়া আমার নিমিত্ত রক্ষিত আসনে উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিগ্ অবলোকন করিতে লাগিলাম। দেখি ঘরটি অতি ক্ষুদ্র, জলসিক্ত, এবং অপরিষ্কার; হর্ম্ম্যতল সম্প্রতি

প্রক্ষালিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ রূপে মার্জ্জিত হয় নাই এবং গোময় সংযোগে তাহা আবার কর্দ্দমময় হইয়াছে; তদুপরি দুই এক পদ বিচরণ করিয়াই আমার অলক্তক রাগ লুপ্ত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে কর্দ্দমের প্রলেপ লাগিল, বসিতে কষ্ট হইল, সংস্পর্শে তাহা আবার বস্ত্রে লাগিতে লাগিল। ঘরে কেবল গোময়ের দুর্গন্ধ। দেওয়ালের কোন কোন ভাগে চূণকাম করা পরিস্কার, আবার কোন ভাগ হইতে চূণকাম খসিয়া গিয়াছে, ইষ্টক দেখা দিতেছে এবং তাহার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া কীট পতঙ্গরা আশ্রয় লইয়াছে।

এই সকল দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছি যে, বাঙ্গালার হিন্দুরাই ম্লেচ্ছ, এমত সময় গৃহিণী আপন কন্যা ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে আমার আহারের নিমিত্ত নৈবেদ্যাদি আনিলেন। আমি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ভাবিলাম, ইহারা এই গৃহের যোগ্য অধিবাসী বটে; যেমন ঘরের এক স্থানে চূণকাম এক স্থানে ভগ্ন ইষ্টক তেমনি ইহাদের এক স্থানে স্বর্ণালঙ্কার এক স্থানে ছিন্ন কদর্য্য মলিন বস্ত্র। তাহারা যে নৈবেদ্য আনিয়া রাখিল তাহা সেই গোময়সিক্ত স্থানের উপযুক্ত বটে; কতকগুলা ভিজা চাল আর কতকগুলা অপক্ক কদলি ভগ্ন কাষ্ঠ পাত্রে আনিয়া ফেলিল। আমার সঙ্গিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার পর আর একটি ক্ষুদ্র পাত্রে করিয়া একজন মিষ্টান্ন আনিল। তাহাতে যে ক্ষীরের ছাঁচ ছিল, তাহার বর্ণ প্রায় গৃহবাসীদিগের বস্ত্রের বর্ণ অপেক্ষা নিতান্ত পরিষ্কার নহে। এবং ছানা বলিয়া যে একটি সামগ্রী ছিল তাহার অম্ল গন্ধ গোময় গন্ধ ঢাকিয়া ফেলিল।

পরে এক মূর্খ পুরোহিত আসিয়া কি কতক গুলা বলিল। তাহা না আমি বুঝিতে পারিলাম, না গৃহিণী, না সেই পুরোহিত স্বয়ং বুঝিতে পারিল। পরে শুনিলাম সে গুলিন পূজার মন্ত্র;

এক কালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করায় তাহার অনেক বর্ণ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক পুরোহিত চলিয়া গেল। গৃহস্থরা আহারান্তে শয়ন করিল। আমি আর সঙ্গিনী অভুক্ত এবং জাগ্রত রহিলাম। দীপ অনেকক্ষণ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। গবাক্ষ দিয়া চন্দ্র কিরণ আসিয়া সঙ্গিনীর শ্বেত অঞ্চলে পড়িয়াছে। আমি অন্যমনস্কে তাহাই দেখিতেছিলাম এমত সময় কতক গুলা ইন্দুর আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। ক্রমে কীট পতঙ্গ সকলেই স্ব স্ব স্থান হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। সঙ্গিনী বলিল, চল আমরা পলাই। আমি ভাবিলাম, যখন প্রভু অনুরোধ করিয়াছেন তখন যতই কষ্ট হউক আমি সমস্ত রাত্রি এখানে থাকিব এবং সেই মত সঙ্গিনীকে বলিলাম। কিন্তু ভিজা ঘরে থাকায় ক্রমে শ্লেষ্মায় আমার শরীর অবসন্ন করিতে লাগিল, শিরঃপীড়া আরম্ভ হইল। সৌভাগ্য ক্রমে শীঘ্রই রাত্রি শেষ হইল। কক্ষান্তর হইতে ছেলেরা কলরব করিতে লাগিল। গৃহিণী নিদ্রাভঙ্গে ভক্তিভাবে পঞ্চবেশ্যার নাম করিতে লাগিলেন। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ পলাইয়া আসিলাম। বাঙ্গালার কি অধঃপতন হইয়াছে। বাঙ্গালায় বেশ্যারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। বাঙ্গালায় মূর্খ ধর্ম্মোপদেশকগণ কুলকামিনী দিগকে শেষ এই ঘৃণিত শিক্ষা দিয়াছেন। এক্ষণে বুঝিলাম যে বাঙ্গালায় সরস্বতীর গতায়াত সত্যই বড় অল্প, এবং অল্প বলিয়া পাষণ্ডরা আপনাদিগকে পণ্ডিত পরিচয় দিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। বাঙ্গালায় সরস্বতীর সর্ব্বদা যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহার অভাবে যে, দেশের এরূপ অধঃপতন হয় এরূপ নীচ শিক্ষা হয়, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, প্রভো! সত্য বলিতেছি, আমি তাহা জানিতাম না এবং তাহা না জানিয়া

একাল পর্য্যন্ত সরস্বতীর সহিত বিরোধ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার সম্মুখে আমি স্বীকার করিতেছি আর আমি তাঁহার সহিত বিরোধ করিব না, তাঁহার সহচরী স্বরূপ থাকিব; তিনি যেখানে অগ্রে যাইবেন আমি সেই খানে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব।

সরস্বতীর প্রতি লক্ষ্মীর এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া নারায়ণ পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, এত কালের পর যে একথা বুঝিলে ইহা জগতের পরম সৌভাগ্য। এশুভ সম্বাদ বাঙ্গালায় জানাইবার নিমিত্ত আমি ভ্রমরকে নিযুক্ত করিলাম। ভ্রমর ঘরে ঘরে এই কথা গুণ্‌গুণ্‌ করিয়া বলিবে। ইতি

চন্দ্রলোক।

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়,—বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে, খোস মোদে,—তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকর লেখা, শশীমসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরে ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি গিয়াছেন; সুধাকর, হিমকর করনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য কুঞ্জে লীলা খেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য বৃন্দাবনে লীলা খেলা চলে না—কুঞ্জদ্বারে, সাহেব

অক্রূর রথ আনিয়া দাঁড়াইয়া আছে; চল, চন্দ্র, বিজ্ঞান মথুরায় চল; একটা কংস বধ করিতে হইবে।

যখন অভিমন্যুশোকে, ভদ্রার্জ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগনসমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ সোনার থালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না—এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে, সৌরজগতের সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে—উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্ত্তী—কিন্তু পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশিগুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক, যে সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন, যে চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী। যে সকল কবিগণ নায়িকাদিগকে আর প্রাচীন প্রথামত চন্দ্রমুখী বলিয়া সন্তুষ্ট নহেন—নূতন উপমার অনুসন্ধান করেন—তাহাদিগকে আমরা পরামর্শ দিই, যে এক্ষণ অবধি নায়িকাগণকে পৃথিবীমুখী বলিতে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে। বুঝা-

হবে যে সুন্দরীর মুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্র ক্রোশ নহে—কিছু কম চারি সহস্র ক্রোশ!

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ মাত্র—ত্রিশ সহস্র যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরতা অতি সামান্য—এপাড়া ওপাড়া। ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্য্যন্ত রেইলওয়ে যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল গেলে, দিনরাত্র চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান যায়।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্ত্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা চন্দ্রাদিকে ২৪০০ গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও ঐসকল দূরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি। চন্দ্র যদি মেমারিষ্টেশ্যনে আসিয়া বাস করিতেন, তাহা হইলে কলিকাতাবাসীরা যাঁহাকে যেমন স্পষ্ট দেখিতেন, ত্রিংশৎ সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী চন্দ্রকে জ্যোতির্ব্বিদেরা এক্ষণে তেমনি স্পষ্ট দেখিতেছেন।

এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে, চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায়, যে তিনি হস্ত পদাদি বিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্ম্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয় গিরি পরিপূর্ণ জড়পিণ্ড। কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা—কোথাও গভীর গহ্বর রাজি। চন্দ্র যে উজ্জ্বল, তাহা সূর্য্যালোকের কারণে। আমরা পৃথিবীতেও দেখি যে যাহা রৌদ্রপ্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্রপ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই

জানে যে চন্দ্রের কলায় কলায় হ্রাস বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। সে তত্ত্ব বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে স্থান উন্নত সেই স্থানে রৌদ্র লাগে—সেই স্থান আমরা উজ্জ্বল দেখি--যে স্থানে গহ্বর, অথবা পর্ব্বতের ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সে স্থলগুলি আমরা কালিমা পূর্ণ দেখি। সেই অনুজ্জ্বল রৌদ্রশূন্য স্থান গুলিই "কলঙ্ক"—অথবা "মৃগ"—প্রাচীনাদিগের মতে সেই গুলিই "কদম তলায় বুড়ী, চরকা কাটিতেছে।"

চন্দ্রের বহির্ভাগের এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে তাহায় চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার পর্ব্বতাবলী ও প্রদেশ সকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং তাহার পর্ব্বত মালার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। বেয়র ও মাল্লর নামক সুপরিচিত জোতির্ব্বিদ্ দ্বয় অন্যূন ১০৯৫ টি চান্দ্র পর্ব্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্ব্বতের নাম রাখিয়াছে "নিউটন" তাহার উচ্চতা ২২,৮২৩ ফিট। এতাদৃশ উচ্চ পর্ব্বত শিখর, পৃথিবীতে আন্দিস্ ও হিমালয় শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চান্দ্র পর্ব্বত সকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিম্বারোজো নামক বৃহৎ পার্থিব শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশৎ গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত।

চান্দ্র পর্ব্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগ্নেয় পর্ব্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয় পর্ব্বত শ্রেণী অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল রন্ধ্র সকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল প্রাপ্ত

হইয়া কোন কালে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্রং বিবর বিশিষ্ট,—কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্ন ভিন্ন, দগ্ধ, পাষাণময়। হায়! এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল?

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসতি আছে কি? আমরা যতদূর জানি, জল বায়ু ভিন্ন জীবের বসতি নাই; যেখানে জল বা বায়ু নাই, সেখানে আমাদের জ্ঞানগোচরে, জীব থাকিতে পারে না। যদি চন্দ্রলোকে জল বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে; যদি জল বায়ু না থাকে, তবে জীব নাই, একপ্রকার সিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে।

মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গতি করিবে। ইহাকে জ্যোতিষে সমাবরণ (Occultation) বলা যাইতে পারে। নক্ষত্র চন্দ্রকর্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে; তৎপরে চন্দ্রশরীরের পশ্চাতে লুকাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পূর্ব্বমত উজ্জ্বল বোধ হইবে না; কেননা বায়ু আলোকের কিয়ৎপরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্তু আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না—তাহার কারণ মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজঃ হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এরূপ ঘটিয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একবারেই নিবিয়া যায়—নিবিবার পূর্ব্বে তাহার উজ্জ্বলতার কিছু মাত্র হ্রাস হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কখন এরূপ হইত না।

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ অতিদুরূহ—সাধারণ পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে না। এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণ-রেখা-পরীক্ষক (Spectroscope) যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় দূরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই বায়ুও নাই। যদি জল বায়ু না থাকে তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব। চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সম্বর্ত্তন করে, অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে পৌষ মাস হইতে, জ্যৈষ্ঠমাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ পৌষ মাসে দিন ছোট, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন তিনচারি ঘণ্টা বড়। যদি দিনমান তিনচারি ঘণ্টা মাত্র বড় হইলেই, এত তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চান্দ্র দিবসে না জানি চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়! তাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে—তজ্জন্য পার্থিব সন্তাপ বিশেষ প্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জলবায়ু মেঘ ইত্যাদি চন্দ্রে কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়, অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। বিখ্যাত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণকারীর পুত্র লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে চন্দ্রের কোন২ অংশ এত উষ্ণ, তত্তুলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে ফুটিতেছে, তাহাও শীতল। সে সন্তাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না—মুহূর্ত্ত জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না। এই কি শীতরশ্মি, হিমকর, সুধাংশু?

হায়! হায়! অন্ধপুত্রকে পদ্মলোচন আর কেমন করিয়া বলিতে হয়!”

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাষাণময়,—বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্ন ভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ, পাষাণময়,! জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, বায়ুশূন্য, মেঘশূন্য, বৃষ্টিশূন্য, —জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, † উত্তপ্ত, জ্বলন্ত, নরক কুণ্ডতুল্য! এই চন্দ্রলোক!

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাব্য গড়ে—বিজ্ঞান ভাঙ্গে।

শ্রীবঃ

* যদি কেহ বলেন, যে চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাঁহার আলোকের শৈত্য স্পর্শের প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিয়া থাকি। বাস্তবিক একথা সত্য নহে--আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা কিছুই অনুভূত করি না। অন্ধকার রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্না রাত্রি শীতল, একথা যদি কেহ মনে করেন, তবে সে তাঁহার মনের বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রালোকে কিঞ্চিৎ সন্তাপ আছে। সে টুকু এত অল্প যে তাহা আমাদিগের স্পর্শের অনুভবনীয় নহে। কিন্তু জান্তেদেশী, মেলনি, পিয়াজি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

† কেননা বায়ু নাই।

কণ্ঠমালা।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিন সন্ধ্যার সময় জেলখানার সম্মুখে এক খানি গাড়ি আসিয়া থামিল। সঙ্গে কয়েক জন অশ্বারোহী ছিল, তাহারা স্ব স্ব অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি হইতে পূর্ব্বতন জেলদারগা টিলন সাহেব মস্তক বাহির করিয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মেম মাথা তুলিয়া দোতালার বারেণ্ডা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তথায় তিনি যে সকল পুষ্পবৃক্ষ রাখিয়াছিলেন তাহা তদবস্থায়ই আছে। গাড়ির মধ্যে বালক বালিকারা কিছু দেখিতে না পাইয়া কেহ মেম সাহেবের বাহুপার্শ্ব হইতে, কেহ জেলদারগার স্কন্ধপার্শ্ব হইতে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমত সময় জেল-খানা হইতে আর একজন সাহেব আসিয়া টিলন সাহেবের হস্ত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইয়া উভয়ে কি কথা কহিতে২ জেল-খানায় প্রবেশ করিলেন।

মেম সাহেব মনে করিয়াছিলেন বিলাতি প্রথানুসারে অগ্রে তাঁহাকে সম্মান পুরঃসর নামাইবে; কিন্তু তাহা না করায় তিনি ক্ষুণ্ণমনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। শেষে একজন প্রহরী আসিয়া গাড়ওয়ানকে বলিল, "তুমি এখনও গাড়ি লইয়া যাইতেছ না কেন?" গাড়ওয়ান বলিল, "সাহেবের অপেক্ষা করি-তেছি!" প্রহরী উত্তর করিল, "সাহেব হাজতে গিয়াছেন, তাঁহার আর অপেক্ষা করা বৃথা, অতএব তুমি গাড়ি লইয়া চলিয়া যাও, এখানে গাড়ি রাখিবার আর হুকুম নাই।"

গাড়ওয়ান এই কথা মেম সাহেবকে জানাইবার নিমিত্ত কোচ বাক্সহইতে নামিতেছিল কিন্তু প্রহরী তাহাকে নামিতে দিল না;

আর দুই একজন প্রহরীর সাহায্যে অশ্বকে পীড়ন করিয়া গাড়ি চালাইয়া দিল। মেম সাহেব অর্দ্ধাঙ্গ বাহির করিয়া কতই নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাহা শুনিল না; শেষ কতক পথে যাইয়া অশ্ব থামিলে সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিয়া উঠিলেন "আমি তবে এখন কোথা যাব!" এই সময় একজন পথিক ইংরাজিতে বলিল "ভয় নাই, আমার সঙ্গে আসুন, আপনার নিমিত্ত গৃহ ভাড়া হইয়া আছে,তথায় আপনার সন্তান দিগের নিমিত্ত আহার সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে। মেম সাহেব বিস্ময় হইয়া পথিকের দিকে চাহিয়া রহিলেন; পথিক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল; মেম সাহেব চিনিলেন, এই ব্যক্তি বনের মধ্যে নোট দিয়াছিল; শম্ভু কয়েদির ন্যায় দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, কিন্তু অল্পবয়স্ক বয়সে ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনার নাম কি?" পথিক উত্তর করিলেন "আমার নাম সাগর সুত।"

মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "কে এ অভাগিনীর ভাবনা ভাবিয়া সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন?" সাগর সুত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, যিনি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তিনিই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে? সাগর সুত হাসিয়া বলিলেন এখন আমি বলিতে পারি না, পরে বলিব, এক্ষণে আপনি চলুন; এই বলিয়া গাড়ওয়ানকে গাড়ি চালাইতে অনুমতি করিয়া চলিলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ি আসিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে গাড়ি থামিল। মেম সাহেব মুখ বাহির করিয়া দেখেন একটি পুষ্পোদ্যান মধ্যে গাড়ি থামিয়াছে; সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া আলোক জ্বলিতেছে। সাগর সুত দ্বারে আসিয়া বলিলেন "অবতরণ করুন।" মেম

সাহেব অবতরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন আহারের দ্রব্যাদি সকল প্রস্তুত রহিয়াছে। মেম সাহেবের চক্ষে জল আসিল। সাগর সুত বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আপনি কাতর হবেন না; সাহেবের অযত্ন হইবে না, বালকদিগকে আহার করিতে বলুন, আপনি আহার করুন। মেম সাহেব চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বালকদিগকে আহারাসনে বসাইলেন কিন্তু আপনি বসিলেন না। সাগর সুত অনুরোধ করিলে মেম সাহেব কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তিনি হয় ত আহার করিতে পান নাই—কেমন করে আমি আহার করিব।" সাগর সুত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি জানিতাম না যে, হিন্দু সংসার ভিন্ন এপবিত্র কথা আর কোথাও শুনা যাইতে পারে। আমি আর প্রতিবাদ করিব না এক্ষণে আমি চলিলাম।"

এই সময় জেলখানায় একটি সামান্য ঘরে পূর্ব্বতন জেলদারগা টিলন সাহেব একা বসিয়া আছেন। সম্মুখে আলোক জ্বলিতেছে, এবং তথায় সামান্য প্রকার খাদ্য পড়িয়া রহিয়াছে, সাহেব তাহা স্পর্শও করেন নাই, হস্তে মস্তক রাখিয়া কি ভাবিতেছেন; ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে এবং দ্বারের বাহিরে একজন প্রহরী পদচারণ করিতেছে; মধ্যে মধ্যে একে তাকে ডাকিয়া কথা কহিতেছে; কথার প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্, তথাপি কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কথা কহিতেছে। হাসির বিষয় থাক্ বা না থাক্ তবু উচ্চ হাসি হাসিতেছে এবং কাহারও সহিত কথা কহিতে না পাইলে গীত গাইতে গাইতে পদচারণ করিতেছে আর এক একবার ঈষৎ হাস্যবদনে টিলন সাহেবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। টিলন সাহেব তাহা কিছুই লক্ষ্য

করেন নাই কিন্তু আপনাকে পূর্ব্বপ্রভুর রক্ষক মনে করিয়া প্রহরী আনন্দে, অহঙ্কারে, কতই ভঙ্গী করিতেছে।

নূতন জেলদারগার স্ত্রী পূর্ব্বতন জেলদারগার মেমকে দেখিয়াছিলেন। আহার করিতে বসিয়া স্বামীর নিকট হাসিতে হাসিতে তাহার ভঙ্গী, ঘাঘরার রং, নাসিকার গঠন ইত্যাদি নানা বিষয় উপলক্ষ করিয়া আত্মতুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিবস পরে জেলদারগা মেজেষ্টর সাহেবের সম্মুখে আনীত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক আসিল; কনেষ্টবলেরা আসামিকে লইয়া কাটগড়ায় তুলিল। আসামির কপোল বিন্দু বিন্দু ঘামিতে লাগিল, তাঁহার নাসাগ্র ঈষৎ রক্তবর্ণ, এক্ষণে অধিকতর রক্তিমাভ হইল। পূর্ব্বে তাঁহার মস্তকের সম্মুখ ভাগ কেশ শূন্য হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভাগের শ্বেতবর্ণ আরও শ্বেত দেখাইতে লাগিল। আসামি স্বভাবতঃ খর্ব্বাকৃতি, তাহাতে আবার তাঁহার বৃহদুদর আপন ভরে নতমুখ হওয়ায় তাঁহাকে আরও খর্ব্ব দেখাইতে ছিল। জেল দারগা দুই একবার ঘর্ম্ম মুছিয়া মেজেষ্টর সাহেবের দিকে চাহিলেন; সাহেব নতশিরে কি লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিলেন না। তাঁহার মুখ তুলিবার অপেক্ষায় সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, ক্রমে শব্দ মাত্রই রহিল না। মেজেষ্টর সাহেব ক্ষিপ্রহস্ত, কেবল তাঁহারই লেখনীর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ক্ষণেক বিলম্বে তাঁহার লেখা শেষ হইলে, তিনি লিখিত পত্র সরাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা তুলিলেন। জেলদারগার মুখে ভয় লজ্জা হাস্য দেখা দিল; তিনি পুনঃপুনঃ

অভিবাদন করিলেন। মেজেষ্টর সাহেব তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া মকদ্দমা আরম্ভ করিলেন।

পুলিস রিপোর্ট করে যে, জেলদারগা টিলন সাহেব শম্ভু কয়েদিকে স্বয়ং হত্যা করিয়াছেন। শম্ভুকে তাহার মেম বড় ভালবাসিতেন, একথা সর্ব্বত্র প্রকাশ ছিল। পুলিস সেই সুত্র ধরিয়া তদন্ত করায়, বিশেষতঃ নূতন জেলদারগার সাহায্য পাওয়ায় আর প্রমাণের অপ্রতুল রহিল না।

যখন মকদ্দমা আরম্ভ হয়, আসামি আপত্তি করিল যে, কলিকাতা হইতে তাঁহার কৌশলি উপস্থিত হন নাই; অতএব, যে পর্য্যন্ত কৌশলি না আইসেন সে পর্য্যন্ত মকদ্দমা স্থগিত থাকে। মেজেষ্টর উত্তর করিলেন যে, তোমার বিচার সুপ্রিমকোর্টে হইবে, সেই থানেই কৌশলির প্রয়োজন, এখানে আমি কেবল একবার প্রমাণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তদন্ত করিয়া দেখিব। ভাল প্রমাণ না থাকে মোকদ্দমা পাঠাইব না; অতএব এক্ষণে কৌশলির প্রয়োজন নাই।

এই সময় পেস্কার উঠিয়া বলিল, "আসামির কৌশলি পত্র লিখিয়াছেন যে, কোন বিশেষ কারণে তিনি আসিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে একজন উপযুক্ত উকিল পাঠাইয়াছেন। আসামি সেই উকিলের নামে ক্ষমতা পত্র লিখিয়া দিয়াছেন।" এই কথা সমাপ্ত হইবা মাত্রই একজন উকিল উঠিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক মেজেষ্টর সাহেবকে বলিলেন যে, আমিই আসামির পক্ষ সমর্থন করিব। আসামি বিস্ময়াপন্ন হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত পূর্ব্বক উকিলের দিকে চাহিয়া রহিল, আর কোন কথা কহিল না, মকদ্দমা আরম্ভ হইল।

প্রথম সাক্ষী বলিল, "একদিন সন্ধ্যার পর শম্ভুকয়েদি এই জেলদারগার ঘর হইতে আসিতেছিলেন, সিঁড়ির নিকট আমার

সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার পরই জেলদারগা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিলেন। কতক দূর গেলেই একটা গোলমাল হইল; তাহার পর শুনিলাম শম্ভু কয়েদি খুন হইয়াছে। কিন্তু খুন করিতে আমি স্বচক্ষে দেখি নাই।"

দ্বিতীয় সাক্ষী বলিল, "সেই গোলযোগে আমি আহত হই, আমার মাথায় কে আঘাত করে তাহা আমি জানিনা কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমি অচেতন হই। অদ্য কয় দিবস হইল আমার চেতন হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব কথা আমার কিছুই স্মরণ নাই। কেবল এই মাত্র অল্প স্মরণ হয় যে, আমি শম্ভুকে রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম তাহাতেই আমার এই দশা ঘটিয়াছে।

তৃতীয় সাক্ষী বলিল, "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি শম্ভু কয়েদিকে সাহেব আপন হস্তে খুন করিয়াছেন।" আর আর সকল সাক্ষীই ঐ কথা একবাক্যে বলিল। প্রথম দুইজন ব্যতীত সকলেই বলিল শম্ভুকে খুন করিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এবিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না; দর্শকদিগের মধ্যে সকলেই এই কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। আসামির উকিল উঠিয়া কত কি বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ সে দিকে কর্ণপাতও করিল না, বরং কেহ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল, কেহ বা গালি দিতে লাগিল. ক্রমে বিচারস্থানে বড় গোল হইয়া উঠিল। প্রহরীরা কতই চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই গোল থামিল না বরং তাহাদের তাড়নার চীৎকারে আরও গোল বাড়িয়া উঠিল। শেষে অসহ্য হইলে, মেজেষ্টর সাহেব স্বয়ং চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সেই শব্দে সকলেই নিঃশব্দ হইল। আর কোন কথা নাই, কোন শব্দ নাই,—যেন সকলে স্পন্দরহিত হইয়া মেজেষ্টর সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল। মেজেষ্টর "রায়" লিখিতে লাগিলেন। এই সময় ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ

হইল, যেন কে কাঁদিয়া ফেলে এইরূপ বোধ হইল, সে নিশ্বাস বৃষ্টির পূর্ব্বগামী বাতাসের ন্যায়। বাতাস উঠিলেই লোকে মেঘের দিকে চায়, সে নিশ্বাস শুনিলেই কাহার নিশ্বাস লোকে অনুসন্ধান করে; কিন্তু প্রথমে সে অনুসন্ধান বৃথা হইল; শেষে সকলেই দেখিল এক জন বাঙ্গালি ভদ্র লোকের পদমূলে এক-জন মেম সাহেব পড়িয়া অতি কাতরস্বরে বলিতেছে "আমাকে রক্ষা কর, আমার সন্তানদিগের উপায় কি হইবে?" ভদ্র লোকটি অগ্রসর হইয়া মেজেষ্টর সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইবামাত্র আসামি চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত কাঠগড়া হইতে লম্ফ দিবার চেষ্টা করায় প্রহরীরা তাঁহাকে ধরিল। তিনি তাহাদের সহিত মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই সময় ভদ্রলোকটি তাঁহার দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "টিলন সাহেব ক্ষান্ত হও, আর ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।" তাহার পর মেজেষ্টর সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আমি শম্ভুকয়েদি।" এই বলিয়া অঙ্গের আচ্ছা-দন ফেলিয়া দিলেন; জেলখানার জাঙ্গিয়া ও পিরান মাত্র রহিল। শম্ভু বক্ষে বাহু বিন্যাস করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। মেজেষ্টর সাহেব স্বয়ং অবাক্ হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর যে কয়েদিরা সাক্ষ দিতে আনীত হইয়াছিল তাহা-দের মেজেষ্টর সাহেব জিজ্ঞাসা করায় সকলেই বলিল যে, এই ব্যক্তিই শম্ভু কয়েদি বটে। তখন আবার দর্শকেরা গোলযোগ করিয়া উঠিল। পুলিস মিথ্যা মকদ্দামার সৃজন করিয়াছে বলিয়া সকলেই পুলিসের উপর রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে মেজেষ্টর সাহেব সকলকে ক্ষান্ত করিয়া জেলদারগাকে অব্যা-হতি দিলেন। জেলদারগা পরমাহ্লাদিত হইয়া মেজেষ্টর

সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া আপন প্রিয়তমার সহিত অতি উচ্চস্বরে কথা কহিতে কহিতে বিচার স্থান হইতে বহির্গত হইলেন।

শম্ভু কয়েদি জেলখানা হইতে পলাইয়াছিল বলিয়া গুরুতর অপরাধী হইয়াছে, তাহাকে বিশেষ দণ্ড দিবার আবশ্যক, এই কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত মেজেষ্টর সাহেব লিখিতে লিখিতে মাথা তুলিলেন, মাথা তুলিয়া দেখেন শম্ভু কয়েদি সেখানে নাই। শম্ভু কয়েদি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কেহ তাহা বলিতে পারিল না। প্রহরিগণ চারি দিকে ধাবিত হইল কিন্তু কেহ তাহার সাক্ষাৎ পাইল না। মেজেষ্টর সাহেব রাগান্বিত হইয়া অনেককে তিরস্কার করিলেন, অনেককে পদচ্যুত করিলেন। শেষে যে শম্ভু কয়েদিকে ধরিয়া আনিতে পারিবে বা তাহার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে তাহাকে একসহস্র টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে, এমত ঘোষণা দিবার অনুমতি করিয়া উঠিয়া গেলেন।

দর্শকেরা শম্ভু কয়েদির কথা কহিতে কহিতে স্বস্ব গৃহে গেল। বিচার স্থানে শম্ভু কোন সাহসে আসিল এবং কি রূপেই বা অদৃশ্য হইল এই কথাই সকলে বিশেষ রূপে আন্দোলিত করিতে করিতে গেল। ডাকাতের সাহস আর ডাকাতের কৌশল অসীম এই বলিয়া অনেকে আপন আপন কৌতূহল নিবারণ করিয়া গৃহে গেলেন। কেহ কেহ গৃহিণীর নিকট শম্ভুর পরিচয় দিতে দিতে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।
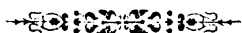
বাঙ্গালার শূর বংশ।

বিক্রমপুর অঞ্চলের কোন বিশেষ পণ্ডিত শূরবংশীয় রাজাদিগের নামাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। নাম গুলি আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম কিন্তু কোন্ গ্রন্থ হইতে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যিনি এই নামগুলি লিখিয়া গিয়াছেন অনেক দিন হইল তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে; তিনি কেবল এইমাত্র লিখিয়া গিয়াছেন যে,বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ঘটক দিগের মধ্যে এক্ষণে যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, যাঁহারা এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সেই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এই নামাবলীতে রাজাদিগের যে পরিচয় স্থানে স্থানে আছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে নিশ্চয় ঘটকদিগের গ্রন্থ হইতে এই নামগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

১। কবি শূর।

২। মাধব শূর।

৩। আদিশূর।

৪। ভূ শূর।

৫। দ্বিজ শূর।

৬। ক্ষিতি শূর।

৭। প্রভা শূর।

৮। স্বরা শূর।

৯। অনু শূর।

১০। হেমন্ত সেন।

১১। বিজয় সেন।

১২। বল্লাল সেন।

অনুশূরের পর বল্লাল সেনের পিতামহ হেমন্ত সেন রাজা হয়েন। পণ্ডিতবর লিখিয়া গিয়াছেন, অনুশূরের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার সন্তান সন্ততি কেহই ছিল না। বল্লাল সেন তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, রাজ্য তাঁহার হস্তেই ছিল অতএব মন্ত্রীর আসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। শূর বংশ হইতে কি প্রকারে রাজ্য সেন বংশে সমর্পিত হইল তাহা এপর্য্যন্ত জানা ছিল না। কিন্তু যে কারণ লিখিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে, সত্য হইলেও হইতে পারে।

এই নামাবলীতে আর গুটিকত কথা লিখিত আছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বল্লাল সেন কুলীনের সৃষ্টি করেন কিন্তু পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে ভূ শূর প্রথমে কুলীনের পদ সৃষ্টি করেন, বল্লাল সেন সেই কুলীন বংশীয় দিগের আট জনকে মুখ্য করেন। ৮০৩ বৎসর হইল, ৯০৪ শকে আদিশূর রাজা 'পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ১৪৯৯ শকে দেবীবর ঘটক তাঁহাদের সন্তান দিগের মেল বদ্ধ করেন।

মাসিক পত্র।

২য় খণ্ড।] বৈশাখ ১২৮২। [১ সংখ্যা।

ভ্রমরের আত্মকথা।

ভ্রমরের বয়ঃক্রম একবৎসর পরিপূর্ণ হইল। এই অল্পকাল মধ্যে ভ্রমর যেরূপ আদরিত হইয়াছে তাহা আমরা প্রত্যাশা করি নাই। ভ্রমর অতি নম্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; জন্ম-বার্ত্তা কোন সংবাদ পত্রে পাঠান হয় নাই, কুলা বাজাইতে কাহাকেও ডাকা যায় নাই; অথচ বাঙ্গালার পদ্মমাত্রেই ভ্রমরের বার্ত্তা পাইয়াছেন। এক্ষণে যেথানে পদ্ম সেই স্থানেই ভ্রমর। যে গৃহে ভ্রমর যায় না আমরা শুনিয়াছি সে গৃহে পদ্ম নাই কেবল শিমুল শর্ম্মারা বাস করেন।

অল্পকালমধ্যে ভ্রমর চট্টগ্রাম হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহাতেই বোধ হইবে ভ্রমর নিতান্ত দুর্ব্বল নহে।

ভ্রমরের গ্রাহক অনেক বাড়িয়াছে, নিত্য বাড়িতেছে; কিন্তু ভ্রমরের কলেবর বাড়িল না কেন, এই কথা অনেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা প্রত্যুত্তরে বলি, বয়স বাড়িলে কলেবর বাড়িবে।

অনেক সূক্ষ্মদর্শী বলিয়াছেন যে, ভ্রমর দুই একটি বড় কথা ছোট করিয়া বলিতে পারিয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন ছোটকথা বড় করিয়া বলিতে পারে নাই। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ভ্রমর বিশেষ আহ্লাদিত; ছোটকথা বড় করা আমাদের আধুনিক প্রথা—অপ্রতুলতার ফল। শূন্য পাত্রের শব্দ অধিক।

ভ্রমরের ত্রুটি অনেক। কিন্তু সেই সকল ত্রুটি সত্বেও যদি ভ্রমর কখন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত পাঠকদিগকে সুখী করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে ভ্রমর আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিবে; পাঠকদিগের সুখসাধন করা ভ্রমরের প্রধান অভিলাষ।

সুখসাধনের সঙ্গে হিতসাধন করা ভ্রমরের আর একটি অভিলাষ। পুরাকালিক পুরোহিতের ন্যায় ভ্রমর গ্রাহকদিগের হিতসাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। হিতসাধন করিতে না পারে হিতাকাঙ্ক্ষী চিরকাল থাকিবে।

বঙ্গে পাঠক সংখ্যা।

বাঙ্গালায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হিন্দু পুরুষ বাস করিতেছেন তন্মধ্যে ন্যূনাতিরেক তিন লক্ষ ব্যক্তি লিখিতে পড়িতে সক্ষম। যে দেশে এত লোক পড়িতে পারে সে দেশের ভাবনা কি? তুমি আপন শয়ন ঘরে বসিয়া সমাজ সম্বন্ধে কোন সঙ্গত কথা লিখিলে; তিন লক্ষ লোক তাহা পড়িল, তোমার সহিত একমত হইল। তিন লক্ষ লোক একমত! একথা শুনিলে সমুদ্রেরও ভয় হয়। সমুদ্রেরও বন্ধন ভয় আছে; একমত হইলে কাঠবিড়ালীরাও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।

বাঙ্গালায় তিন লক্ষ লোক পড়িতে পারে; বাঙ্গালার ভাবনা কি? যে স্থলে তিন লক্ষ পাঠক কিন্তু সেস্থলে পঞ্জিকা ভিন্ন কোন গ্রন্থের তিন হাজার মুদ্রাঙ্কন দেখিতে পাওয়া যায় না। সংবাদ বা সাময়িক পত্রের গ্রাহক দুই হাজারের অধিক নাই; প্রত্যেক গ্রাহক দিগের আত্মীয় মধ্যে যদি চারি জন করিয়া পাঠক অনুভব করা যায়, তাহা হইলে উর্দ্ধসংখ্যা দশ হাজার পাঠক হইবে। ইহার কারণ কি?

কতকগুলি লোক অল্প ইংরাজি পড়িয়াছেন বাঙ্গালা পড়িতে তাঁহাদের অপমান বোধ হয়। কতক গুলি লোকের ইংরাজিতে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা ইংরাজি মহাজন কৃত গ্রন্থের রসাস্বাদনে সক্ষম; সে সকল গ্রন্থ থাকিতে বাঙ্গালার আধুনিক অসার গ্রন্থ দ্বারা তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হয় না।

আর কতক গুলি লোক আছেন তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জনে বা অন্য বিষয়ে এত একাগ্র যে কোন গ্রন্থই তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। অনেক রসে তাঁহারা বঞ্চিত।

অবশিষ্ট অধিকাংশ লোকই পাঠ্য গ্রন্থ পাইলেই পড়িতে পারেন। পড়িতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি আছে, সময়ও আছে, কিন্তু পাঠ্য কিছুই তাঁহাদের হস্তগত হয় না। তাঁহারা যে সকল পল্লীগ্রামে বাস করেন তথায় গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। অন্যত্র হইতে যে তাহা আনিয়া পড়িবেন এতটা উদ্যোগ তাঁহাদের নাই। গ্রন্থ অনায়াসে প্রাপ্য হইলে তাঁহারা পড়িতে পারেন। যদি গ্রামে গ্রামে পাঠ্য পুস্তক অল্প মূল্যে পাওয়া যায় তাহা হইলেই বাঙ্গালার নূতন দিন উপস্থিত হইবে। একতার পথ পরিষ্কৃত হইবে। বাঙ্গালির নাম সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইবে।

বটতলার চরদিগকে স্থানে স্থানে বটতলার গ্রন্থ লইয়া যাইতে দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। যেখানেই তাহারা

গিয়াছে সেই খানেই তাহারা মনসার ভাবাণ, সত্যনারায়ণের কথা, কি মজার শনিবার, হায়রে সকের জলপান প্রভৃতি অপাঠ্য পুস্তক পড়াইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালি যেরূপ কাঙ্গালি পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধেও সেইরূপ। পড়িবার স্পৃহা আছে কিন্তু পড়িতে পায় না। বাঙ্গালার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দিগের পক্ষে এই এক সময়। এই সময় কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে অদ্ভুত মঙ্গল সাধন হইবে। যাঁহারা বাঙ্গালার তিন লক্ষ লোককে পড়াইতে পারিবেন তাঁহারাই বাঙ্গালার মহাজন।

অতএব সকলে চেষ্টা করুন, এবিষয়ে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না, যতটুকু চেষ্টা করা যাইবে ততটুকু সফল হইবে; চেষ্টা দ্বারা একজনকে পড়াইতে পারিলেও সফল গণিব। বটতলার দলকে যতই উপহাস করি তাহারা এবিষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়াছে। তাহারা অক্ষয় হউক, তাহাদের দল নিত্য বৃদ্ধি হউক, তাহারা বাঙ্গালার সমুদয় গ্রামে গতিবিধি করুক। ক্ষুদ্র পাঠ্য পুস্তক অপ্রাপ্য বলিয়াই তাহারা এক্ষণে অপাঠ্য পুস্তক পাঠায়, পরে সে দোষ থাকিবে না।

নূতন পঞ্জিকা একলক্ষ করিয়া ইদানীং বিক্রয় হয়। এই বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে উপরোক্ত কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। বটতলার যত্নে এই সংখ্যাক পঞ্জিকা বিক্রয় হইতেছে। সে যত্ন স্বার্থপরতাজনিত হউক, আর যাহাই হউক, সামান্য নহে। যে স্থলে এক লক্ষ পঞ্জিকা বিক্রয় হয়, সে স্থলে পাঠক সংখ্যা যাহা অনুভব করা হইয়াছে, তাহা অন্যায় নহে, তিন লক্ষের বরং অধিক হইবে। এই পাঠকদের নিমিত্ত পঞ্জিকা এক লক্ষ বিক্রয় হয়, কিন্তু অন্য পুস্তক এক হাজার বিক্রয় হয় না। পঞ্জিকার ন্যায় অন্য পুস্তক প্রয়োজনীয় না হইতে পারে,

কিন্তু সুখদ হইবার সম্ভাবনা। কেবল সুখদ হইলে কি হইবে, সুখদ গ্রন্থ দুর্ম্মূল্য, কাজেই বটতলার চক্ষুঃশূল।

ক্ষুদ্র গ্রন্থ যেখানে যাইবে কালে তথায় বড় গ্রন্থ পথ পাইবে। ক্ষুদ্র সংবাদ পত্র যেখানে পঠিত হইবে কালে তথায় বড় বড় সংবাদ পত্র পঠিত হইবে। অতএব গ্রন্থকার ও সংবাদ পত্র লেখক মাত্রেরই এবিষয়ে মনোযোগ করা উচিত; এবিষয়ে তাঁহারা সাহায্য করিলেই তাঁহাদের আপনার লাভ। সামান্য পত্রিকার গ্রাহক বাড়িলে প্রধান পত্রিকার গ্রাহক বাড়িবে। যে সকল সামান্ত পত্রিকা পল্লীগ্রামে নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া অল্প দি-নের মধ্যে লীলা সম্বরণ করিয়াছে তাহারা প্রধান পত্রিকার উপকার করিয়া গিয়াছে।

এক্ষণে কি উপায়ে বাঙ্গালার তিন লক্ষ লোকের হস্তে পাঠ্য পুস্তক সমর্পণ করা যায়। কি উপায়ে গ্রাম্য মুদি, গ্রাম্য চৌ-কিদার, ডাক হরকরা, মিসিওয়ালী, মুক্তাওয়ালী প্রভৃতি সকলেই এ বিষয়ে সহায়তা করে তাহার আন্দোলন আবশ্যক।

কণ্ঠমালা।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু কয়েদীর সন্ধান করিবার নিমিত্ত একজন মুসলমান দারগা বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিল। শম্ভু যে নিকটেই আছে, একথা তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল, অতএব নিকটবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে নানা বেশে, নানা ছলে, যাতায়াত করিতে লাগিল। ক্রমে রামদাস সন্ন্যাসীর সহিত তাহার আলাপ হইল, দারগা মনে করিল, রামদাস কোন ছদ্মবেশী "বদমায়েস।" কি নিমিত্ত

তাহার এরূপ সন্দেহ হইল, তাহা দারগা স্বয়ংও বুঝিতে পারিল না; অথচ তাহার সন্দেহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

রামদাস সুচতুর, দারগার সন্দেহ বুঝিতে পারিলেন। পাছে সেই সন্দেহ হইতে ভবিষ্যতে কোন বিপদ্‌ উপস্থিত হয় এই আশ-ঙ্কায় দারগার মন অন্য দিকে ফিরাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু শম্ভু কয়েদীর অনুসন্ধান ব্যতীত আর কোন বিষয়ে দার-গাকে অন্যমনস্ক করিবার উপায় নাই দেখিয়া শেষ শম্ভু কয়েদীর কথা উপস্থিত করিলেন। দারগা সে কথায় প্রথমে বিশেষ মনো-যোগ না করিয়া কেবল মাত্র বলিল, "শম্ভু আর কত দিন লুকাইয়া থাকিবে? ইংরেজের রাজ্য, তাহাকে ধরা পড়িতেই হইবে, সে বিষয়ে আর আমি বড় ব্যস্ত নহি।"

রাম। উত্তম, আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি বিশেষ ব্যস্ত, তাহাই তাহার অনুসন্ধানের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম।

দার। তবে তুমি কি তাহার কোন সন্ধান জান?

রাম। জানি বা না জানি, আপনি ত আর বড় ব্যস্ত নহেন।

দার। ব্যস্ত নহি বটে, কিন্তু তাহার সন্ধান করিতে পারিলে ভাল হইত, না পারিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

রাম। তবে কি না, আপনি অনুসন্ধান করিতে পারিলে আপনার সুখ্যাতি হইত, এক্ষণে অন্য দারগা অনুসন্ধান করিতে পারিলে তাহারই সুখ্যাতি হইবে। তাহা হউক, আপনার সুখ্যাতি অনেক আছে, এক কার্য্যে আপনি নিষ্ফল হইলে যে আপনার সকল সুখ্যাতি নষ্ট হইবে, কি অন্যে সফল হইলে যে আপনার অপেক্ষা সে উচ্চপদস্থ হইবে এমত নহে।

দার। তুমি কি শম্ভু কয়েদীর বিষয় কিছু জান?

রাম। বিশেষ কিছুই জানি না।

দার। তবু কি জান বল।

রাম। কই! আমি কিছুই জানি না।

দার। কিন্তু তোমার ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে, তুমি শম্ভুর বিষয় কিছু জান। যাহা জান তাহা যদি গোপন করিতে ইচ্ছা হয়, গোপন কর; সন্ন্যাসীর বেশ ধরিলে অনেক বিষয় গোপন করিতে হয়, অনেক বিষয় গোপন রাখিতে পারা যায়। এক্ষণে আমি চলিলাম, প্রয়োজন হইলে আবার আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।

রামদাস বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু দারগা কোন মতেই থাকিলেন না, উঠিয়া গেলেন। সেই পর্য্যন্ত রামদাস দেখিলেন, যে তিনি গ্রামান্তরে গেলে দুই একটী মনুষ্য অলক্ষ্যে তাঁহার অনুসরণ করে। কখন তাহারা নিকটে আইসে না অথচ চলিয়াও যায় না। রামদাস ভাবিলেন, "ইহারা দারগার চর; দারগা কি আমার পূর্ব্বপরিচয় পাইয়াছে? না, তাহা হইলে চর পাঠাইবার প্রয়োজন হইত না। আমি কোথা যাই, কাহার সঙ্গে আলাপ করি, এই সকল তত্ত্ব লইতে ধূর্ত্ত মুসলমান্ ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে, মনে করিয়াছে এই সকল তত্ত্ব লইলেই মহারাজের তত্ত্ব পাওয়া সহজ হইবে। ভাল, অদ্য হইতে আর আমি গ্রামান্তরে কি কোথায়ও যাইব না, দেখা যাউক, দারগা কি করে। কিন্তু আমি যে মহারাজের সম্বাদ জানি তাহা দারগা কিরূপে জানিল? যে রূপেই হউক তাহা নিশ্চয় জানিয়াছে, নতুবা এত লোক থাকিতে আমার উপর তাহার লক্ষ্য কেন হইবে। এক্ষণে উহার চক্ষে ধূলা দেওয়ার চেষ্টা করাবোধ হয় বৃথা হইবে। যদি দারগাকে ভুলান না যায় তবে কি কর্ত্তব্য, মহারাজের সন্ধান কি বলিয়া দিব? না—তাহা কখনই হইবে না। যিনি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, আমার নিমিত্ত এত দিন জেলে রহিয়াছেন, তাঁহার অনিষ্ট কখন করিব না। কখনই না। কিন্তু এক কথা আছে, সন্ধান বলিয়া দিলেই তাঁহার অনিষ্ট

কি হইবে? জেলে তিনি ছিলেন, আবার জেলে যাবেন, তবে আমরা তাঁহার প্রতিপালিত, তাঁহার আশ্রিত, যদি সন্ধান দিয়া কিছু উপকৃত হই, ক্ষতি কি! পতিত বৃক্ষের মূল কত কীটে খায়, যে কীট বৃক্ষপত্রে প্রতিপালিত হইয়াছিল, সে কীট এক্ষণে মূল-ভক্ষণে প্রতিপালিত হইবে, তাহাতে ক্ষতি কি? আর এক কথা আছে; যদি তিনি আপনি ধরা পড়েন, আর আপনার পরিচয় দেন, তাহা হইলেই ত আমি গেলাম। আর যদি আমি সন্ধান বলিয়া দিই তখন তিনি আত্মপরিচয় দিলে আমার কোন অনিষ্ট হইবে না; তখন মেজেষ্টর সাহেব মনে করিবেন, যে কয়েদী মুক্তি পাইবার লোভে অন্যকে দায়গ্রস্ত করিতেছে। তাহাতে আমার কোন বিপদ্ নাই, অতএব এই যুক্তি ভাল। আমিই মহারাজকে ধরাইয়া দিব।"

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রামদাস সন্ন্যাসী জাতিতে ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে মহারাজ মহেশ-চন্দ্রের সংসারে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজের মৃত্যুর পর যৎ-কালে মহারাণী পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন, রামদাস তাঁহার সঙ্গে থাকেন। লোকে বলিত রামদাসের পরামর্শানুসারে মহারাণী গৃহত্যাগিনী হয়েন; সে কথা কতদূর সত্য প্রকাশ নাই, ফলতঃ রামদাস মহারাণীর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু যাহারা রামদাসকে বিশেষ জানিত তাহারা বলিত রামদাস মহারাণীর পরম শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিতেন; মহারাণী তাহা জানিতেন না, কেহ তাঁহাকে জানাইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু একদিন তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছিল।

একটি চটিতে মহারাণীকে তিন চারি দিবস থাকিতে হই-

য়াছিল, শেষ দিন রাত্রে এক দল ডাকাত আসিয়া আক্রমণ করে, সেই দলের মধ্যে রামদাস ছিলেন। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া রামদাসের সহিত ডাকাতদিগের বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদ সূত্রে ডাকাতেরা আর একটি ডাকাতির মোকদ্দমায় তাঁহাকে সঙ্গী বলিয়া পরিচয় দেয়। রামদাস তখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে ধরা পড়িয়া বিচারালয়ে আনীত হইলেন। তাহার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ পাওয়ায় জজ সাহেব তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন। যে ডাকাতদিগের সহায়তায় রামদাস দণ্ড পাইলেন, তাহারা রামদাসের প্রকৃত নাম জানিত না। রামদাস আপনাকে শম্ভু বলিয়া তাহাদের নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহারা শম্ভু বলিয়া তাহাকে জানিত। নথিতেও রামদাস নাম উল্লেখ ছিল না। জজ সাহেবও রামদাসকে শম্ভু বলিয়া দণ্ড দেন।

দণ্ডাজ্ঞার পর যখন রামদাসকে জেলে লইয়া যায় তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। রামদাস চারিজন কনেষ্টেবল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিঃশব্দে যাইতেছেন এমত সময় একজন কনেষ্টেবল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কে আছে?" রামদাস কহিলেন "আমার আর কেহই নাই থাকিলে আমি জেলে যাইতে সম্মত হইতাম না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম জেল আমার পক্ষে মন্দ নহে; আর আমাকে অন্ন চিন্তা করিতে হইবে না যাবজ্জীবন একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নে থাকিব।"

আর একজন কনেষ্টেবল জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি তুমি

এই ডাকাতিতে লিপ্ত ছিলে না। রামদাস কেবল মাত্র বলিলেন, "না।" আর কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

কতক দূর আসিয়া রামদাস উদরের উপর হস্ত রাখিয়া কিঞ্চিৎ কষ্ট প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিকটে পুষ্করিণী আছে? একজন বলিল, আছে। রামদাস বলিলেন, সত্বরে সেই দিকে চল। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া কনেষ্টেবলগণ পথে দাঁড়াইল; রামদাস নিকটেই বসিলেন। প্রহরিগণ অন্যমনস্ক হইলে রামদাস বেগে পলাইলেন। "আসামী ভাগা" বলিয়া কনেষ্টেবলেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। আরও অনেকে তাহা-দের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল কিন্তু রামদাস দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে; কনেষ্টেবলগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া; কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছে এমত সময় কতকগুলি লোক একটা মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতেছিল। তাহারা দূরে কনেষ্টেবলদিগকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, আসামী এই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রামদাস বাস্তবিক সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তথায় এক ব্রহ্মচারী বসিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রামদাস তাঁহার গৈরিকবেশ দেখিবা মাত্র পাদমূলে পড়িয়া বলিলেন, প্রভো! আমায় রক্ষা করুন, আমি কয়েদী আমার পশ্চাতে কনেষ্টেবল আসিতেছে। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে উঠিয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম-দাস অতি সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন "আমাকে শম্ভু ডাকাত মনে করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছে। আমি জেলে যাইতে যাইতে পলাইয়াছি। আমি শম্ভু নহি আমার নাম রামদাস; মহারাজ মহেশচন্দ্রের ভৃত্য ছিলাম। এক্ষণে পথে পথে ভিক্ষা করি।"

ব্রহ্মচারী আপন পরিচ্ছদ রামদাসকে পরাইয়া বলিলেন, তুমি অদ্যাবধি রামদাস সন্ন্যাসী হইলে। আপনি রামদাসের পরিচ্ছদ পরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমি অদ্যাবধি শম্ভু কয়েদী হইলাম। এই সময় কনেষ্টেবলগণ দ্বারে প্রহার করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী রামদাসের কর্ণে দুই চারিটি কি কথা বলিয়া একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ দেখাইয়া দিলেন। কনেষ্টেবলরা দ্বার ভাঙ্গিয়া শম্ভু কয়েদীকে লইয়া গেল। কতক পথে গিয়া আপনাদের ভ্রম দেখিতে পাইল। ব্রহ্মচারী তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন "ভয় নাই, তোমরা চল, এখন আমিই শম্ভু ডাকাত।"

আমরা এপর্য্যন্ত যাহাকে শম্ভু কয়েদী বা শম্ভু ডাকাত বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়াছি, তিনি ডাকাত নহেন, রামদাসের পরিবর্ত্তে জেলে গিয়াছেন। রামদাস এক্ষণে সেই ব্রহ্মচারীকে আবার পুলিষের হস্তে সমর্পণ করিবার মনস্থ করিয়া দারগার অন্বেষণে গেলেন।

দারগার সহিত সাক্ষাৎ হইলে অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পর রামদাস বলিলেন, "আপনি আগামী পরশ্ব রাত্রি দুই প্রহরের সময় মন্দিরের নিকট আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কিন্তু সঙ্গে কাহাকেও লইয়া যাইবেন না। তাহা হইলে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন না। আর যদি একাকী যান তাহাহইলে সকল সন্ধান পাইতে পারিবেন।"

দারগা উত্তর করিলেন, তবে কি শম্ভু ডাকাত তোমাদের নিকট আছে? রামদাস বলিলেন যে, এক্ষণে শম্ভু কোথায় তাহা আমি জানি না কিন্তু আগামী পরশ্ব রাত্রে আমার সহিত মন্দিরে এক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, এমত কথা বার্ত্তা হইয়াছে। সেই ব্যক্তি যদি শম্ভু হয় তবে তাহাকে অনায়াসে

ধরা যাইতে পারিবে, কিন্তু প্রথমে দেখা চাই। আমি কখন শম্ভুকে দেখি নাই, সেই ব্যক্তি যদি শম্ভু হয় তাহাহইলে কোথা সে আপাততঃ বাস করিতেছে তাহা সন্ধান করিয়া লইতে পারিব। রামদাস সন্ন্যাসী বাস্তবিক শম্ভু কোথায় থাকে তাহা জানিতেন না। শম্ভু মধ্যে মধ্যে আসিতেন এবং যে দিবসে আসিবেন পূর্ব্বে তাহার স্থির থাকিত। শম্ভু বড় সাবধানী, পাছে লোক দেখিলে না আইসে এই আশঙ্কায় রামদাস অন্য লোক আনিতে দারগাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

দারগার নিকট হইতে বিদায় হইয়া রামদাস আসিতে আসিতে ভাবিলেন যে, "শম্ভু নিশ্চয় ধরা পড়িবে। ধরা পড়িলে আর তাঁহারে এখানে রাখিবে না; অবশ্য দ্বীপান্তরিত করিবে। তাহাহইলে এই ধন ঐশ্বর্য্য সকলই মোহান্তের হইবে। কিন্তু মোহান্ত যদি যায় তাহাহইলে সকলই আমার হস্তে পড়িবে। শৈলর কথা বৃথা, তাহারে রাখিলে রাখিতে পারি মারিলে মারিতে পারি। এক্ষণে কি উপায়ে মোহান্তকে স্থানান্তরিত করি।"

এই দিবস অপরাহ্নে মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদাস তুমি এত অন্যমনস্ক কেন?" রামদাস বলিলেন "আমি আপনার অদৃষ্ট ভাবিতেছি।"

মহা। অদৃষ্টের কি ভাবিতেছ?

রাম। এই ভাবিতেছি যে, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলাম কিন্তু অদৃষ্ট দোষে সেই সংসারের পাপ সঙ্গে সঙ্গে আসিল। এখানে সেই সংসারের কার্য্য করিতেছি। তবে, নিজের সংসার ত্যাগ করিয়া মহারাজের সংসার চালাইতেছি। তাঁহার অনুমতি পালন করিতেছি, তাঁহার কথায় বা মহাশয়ের কথায় কাহারে পীড়ন করিতেছি, কাহারও উপকার করিতেছি,

উপকার সংসারাশ্রমে থাকিয়াও করিতে পারিতাম, তবে সন্ন্যাসী হইয়া আমার কি ফল হইল।

মোহ। কই? আমার কথায় কাহারে পীড়ন করিতে হইয়াছে?

রাম। সময়ে সময়ে অনেক করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি যে দিবস শম্ভুকয়েদী খুন হইয়াছে এই কথা জেলখানায় রাষ্ট্র করিতে যাই, সে দিবস জেলখানায় বাস্তবিক দুই একজনকে প্রায় খুন করিতে হইয়াছিল। আপনি কাহাকেও মারিতে অনুমতি করেন নাই সত্য, কিন্তু না মারিলে কার্য্যোদ্ধার হইত না। অতএব আপনার অনুমতির নিমিত্ত সে অত্যাচার করিতে হইয়াছিল।

মোহান্ত অন্যমনস্ক হইলেন। রামদাস সময় পাইয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন; মোহান্ত কোনটির উত্তর না করায় রামদাস দেখিলেন যে, মোহান্ত তখনও অন্যমনস্ক রহিয়াছেন কোন কথাই শুনিতেছেন না অতএব ক্ষান্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে মোহান্ত বলিলেন, "আমি লোকের অনেক উপকার করিয়াছি; মহারাজের কার্য্য ভার না লইয়া বনে বসিয়া ধর্ম্মোপাসনা করিলে এত উপকার করিতে পারিতাম না।"

রাম। সে কথা সত্য, কিন্তু যে উপকারই আপনি কি আমি করিয়া থাকি তাহা অর্থের বলে করিয়াছি, অর্থ যাহার ধর্ম্ম তাহার; আমাদের ফল কি হইয়াছে? বিশেষতঃ অর্থোপার্জ্জিত ধর্ম্ম সংসারীর পক্ষে বিধি, আর আমাদের পক্ষে স্বতন্ত্র বিধি। আমি অনর্থক সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলাম; আশ্রমোপযোগী কোন কার্য্যই করিতে না পারায় পতিত হইতেছি, এই ভাবনা আমার বড় হইয়াছে; এক্ষণে আমি কি করি তাহাই ভাবিতেছি।

মোহান্ত অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, রামদাস তুমি সত্য বলিয়াছ, তোমার কথায় আমার চৈতন্য হইল, আমার আর এখানে এক দণ্ড থাকাও উচিত নহে!

রাম। বিশেষতঃ এখানে দুই এক দিনের মধ্যে স্ত্রীহত্যা হইবে। শৈল নামে যে একজন যুবতীকে মহারাজ আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাহাকে নদীতে নিঃক্ষেপ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আমি তাহাতে অস্বীকার করায় তিনি স্বয়ং সে কার্য্য সমাধা করিবেন বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শৈল জীবিত থাকিলে পৃথিবীর অনেক অনিষ্ট ঘটাইবে।

মোহান্ত কর্ণে হস্ত দিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "রামদাস, আর এসকল কথা শুনাইও না, শুনিলেও পাপ। আমি এক্ষণে চলিলাম, এস্থল ত্যাগ করিবার আয়োজন করি। এই চাবি লও, সমস্ত দ্রব্যাদি লও। তুমি মহারাজকে সকল বুঝাইয়া দিও, সকল বুঝাইয়া বলিও।

রাম। আপনি স্বহস্তে মহারাজকে এই চাবি দিয়া সকল বলিয়া গেলে ভাল হইত।

মহা। না, মহারাজ কি মোহিনী মন্ত্র জানেন; তিনি যাহাই বলেন, তাহাতেই আমাকে সম্মত হইতে হয়, কি জানি যদি আমার মতান্তর করিতে পারেন, আমার এই ভয়। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে যাওয়াই ভাল।

মোহান্ত উঠিয়া গেলে রামদাস একা বসিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে ভাবিতে লাগিল। কি পাপ, মোহান্তটা এত বড় নির্ব্বোধ, এত সহজে ইহাকে যে তাড়াইতে পারিব, তাহা কখনই ভাবি নাই। এখন দেখা যাউক ইহার পর কি হয়।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামদাস সন্ন্যাসী এই দিবস বিনোদকে আসিবার নিমিত্ত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কি জন্য তাঁহাকে আবশ্যক হইয়াছে, পত্রে তাহা কিছুই লিখিত হয় নাই। কেবল মাত্র লিখিত আছে "রাত্রি দুইপ্রহরের সময় মন্দিরের পূর্ব্বদিকে বটবৃক্ষমূলে আমার সহিত অতি অবশ্য সাক্ষাৎ করিবেন। দুইপ্রহরের পূর্ব্বে আসিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না; দুইপ্রহরের পরে আসিলে আপনি কোন বিশেষ সুখে এজন্মের মত বঞ্চিত হইবেন।"

পত্রখানি পাইয়া বিনোদ দুই তিনবার পাঠ করিলেন; কেন সন্ন্যাসী যাইতে বলিয়াছেন, তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না; আবার পত্র পাঠ করিলেন, তাহার পর পত্রখানির এপৃষ্ঠা ওপৃষ্ঠা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, শেষ পত্রখানি পূর্ব্বমত মুড়িয়া বস্ত্রাগ্রে বাঁধিলেন। তখন বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে। অনেক দূর যাইতে হইবে অতএব যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিনোদ স্বভাবতঃ শান্ত; ইদানীং আরও শান্ত হইয়াছেন; আর শোকে তাপ নাই, রাগ দ্বেষ নাই, কোন অভিলাষ নাই, একাকী কালাতিপাত করেন। পৃথিবীর শোভা আর বুঝিতে পারেন না, মেঘ দেখিলে আর মাতিয়া উঠেন না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত পুষ্পেরদিকে আর ফিরিয়া চান না, চন্দ্রোদয় হইলে আর বিচলিত হয়েন না। কেবল মাত্র এক দিবস ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশে একটি নক্ষত্রকে একা জ্বলিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। শয্যা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিয়া সেই নক্ষত্রটি দেখিয়াছিলেন। হয়ত নক্ষত্রটি একাকী জ্বলিতেছে বলিয়া তাহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন; অথবা নক্ষত্রটির সহিত

আপনার সাদৃশ্য অনুভব করিয়া তাহার নিমিত্ত এত কাতর হইয়াছিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় সন্ন্যাসীর সাঙ্কেতিক মন্দিরের নিকট বিনোদ উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি বটবৃক্ষ আর দুই একটি করবীর ঝাড় রহিয়াছে; তাহার অব্যবহিত পরেই নদীর বিশালবক্ষ চন্দ্রকিরণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। নদীর গম্ভীর গর্জ্জন বিনোদের কর্ণে শোকধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; ক্রমে সেই শব্দে বিনোদের অন্তর ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন দিবসে কি শোকাবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যেন তাহার তরঙ্গ এখনও অন্তরে উছলিতেছে। বিনোদ তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ঘটনাই স্মরণ হইল না, অথচ তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। বিনোদ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সেই সন্তাপিত অন্তরে বিনোদ ধীরে ধীরে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটি করবীর বৃক্ষপার্শ্বে যাইয়া দেখিলেন, দুই জন দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছে; তাহাদের দেহ নদীবক্ষে চিত্রিত রহিয়াছে। বিনোদ বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া অলক্ষ্যে তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন। একজন বলিতেছে, "আমার বড় শীত করিতেছে, আমি আর এখানে দাঁড়াইতে পারি না, কেন আমাকে আনিলে বল, নতুবা আমি চলিয়া যাই।" অপর ব্যক্তি হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি যাবে কোথা? তোমার আর স্থান কোথা? তোমার স্থান এই নদীগর্ভে, ইচ্ছা হয় যাও।" প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল, "উপহাস রাখ, আমার মত দুর্ভাগিনীকে উপহাস করিলে আর তোমার কি লাভ?" বিনোদ চিনিলেন, এ তাঁহার শৈল, সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতেছে।

রামদাস সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি উপহাস করি নাই। প্রকৃত কথাই বলিয়াছি, ঐ নদীগর্ভে তোমার স্থান তাহার অন্যথা হইবে না, এখনই তাহা জানিতে পারিবে।"

শৈ। কেন, নদীগর্ভে আমার স্থান? কে বলে? কাহার সাধ্য?

রাম। আমি বলি, আমার সাধ্য।

শৈ। কে তুই? কোথাকার কে তুই, নচ্ছার? ঝাঁটা পেটা করিব জানিস্ না।

রাম। গালি দেও, তোমার সময় অল্প। আর সময় অধিক থাকিলেই বা কি হইত; জীবনধারণ কি কষ্ট তাহাও ত দেখিলে?

শৈল অতি মৃদুভাবে আপনাপনি বলিতে লাগিল, আমার বয়স অল্প, তাহাই মরিতে ইচ্ছা নাই। আমার বড় সাধ আবার সংসার করি।

রাম। কাহার সঙ্গে? বিলাস বাবুর ত শেষ দশা; দুই পাঁচদিন আর তাঁহার বিলম্ব। বিনোদ বাবুর আশা ত তুমি করই না। করিলেই বা কি হইবে?

শৈ। কেন?

রাম। তিনি আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন, যে "আমার প্রতিমার বিসর্জ্জন আমি আপনিই করিব।" অদ্য এখনই তিনি তোমায় বিসর্জ্জন করিতে আসিবেন।

শৈল আর কথা কহিল না, ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তক বক্ষে ঢুলিয়া পড়িল। রামদাস একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিলেন, মনে মনে বলিলেন, বিনোদ এলেন না, তাঁহার সময় অতীত হইয়াছে আর বিলম্ব কেন করি। তাহার পর শৈলকে বলিলেন, শৈল তোমার সময় উপস্থিত। শৈল কথা কহিল

না। শৈলের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, তথাপি শৈল কথা কহিল না; অঙ্গ দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, শৈল সেইরূপ রহিল। তাহার পরই সম্মুখে গগনভেদী একটি চীৎকার হইল। "সন্ন্যাসী কি করিলে ?" বলিয়া সঙ্গে২ পশ্চাতে আর একটী চীৎকার হইল। সন্ন্যাসী চমকিয়া স্কন্ধ ফিরাইলেন, পশ্চাতে কেহই নাই। নিম্নে নদী দেখিতে মস্তক নত করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে আর একটি চীৎকার মিশাইয়া গেল, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আবার পশ্চাতে মস্তক ফিরাইলেন, কেহই নাই; তৎক্ষণাৎ আবার নদী প্রতি চাহিলেন কেহই নাই। স্রোত ছুটিতেছে, নদী গর্জ্জিতেছে, আর কেহই নাই; কেবল একটি ভীষণ পক্ষী নদীবক্ষ দিয়া উড়িয়া গেল। বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। শৈল এই মাত্র যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সেই স্থানের প্রতি চাহিলেন। শৈল এই মাত্র ছিল, এই মাত্র কথা কহিয়াছিল, শৈল আর সেখামে নাই; সন্ন্যাসী আবার নদীর দিকে মস্তক নত করিলেন এই সময় পূর্ব্বমত চীৎকার তাঁহার অনুভব হইল; চীৎকার কোথা হইতে হইল? পশ্চাতে দেখিলেন, পার্শ্বে দেখিলেন, শেষ ঊর্দ্ধে চাহিলেন; ঊর্দ্ধে চন্দ্র তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, নক্ষত্রগণ নদীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, নদীর যে স্থানে শৈল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, নক্ষত্রগণ যেন ঠিক সেই স্থানের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

করবীর অন্তরালে বিনোদ নাই। শৈলকে বাঁচাইবার নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে বিনোদ জলে ঝাঁপ দিয়াছেন। সন্ন্যাসী পশ্চাতের চীৎকারে বিনোদের গলা চিনিতে পারেন নাই।

নক্ষত্রের প্রতি।

১

মেঘাচ্ছন্ন অমা নিশা ;—আঁধার আকাশে,
ভেসে যায় মেঘ কালো, তার মাঝে করি আলো,
বসিয়া তারকা এক মৃদু মৃদু হাসে।
কভু বা লুকায় মেঘে কভু বা প্রকাশে।

২

"কে তুমি তারকা, আজি দেখা দিলে মোরে,
কেন এ অভাগা নরে, জ্বালাইব মনে করে,
খেলিতেছ লুকাচুরি কাদম্বিনী কোরে।
তিতাইছ কেন মোরে নয়নের লোরে।

৩

তব মত এক তারা হৃদয় অম্বরে,
কত দিন ফুটেছিল, হঠাৎ সে লুকাইল,
জনমের মত কাল অনন্ত সাগরে।
পাগল তখন হতে আমি তার তরে।

৪

তুমিত লুকায়ে পুনঃ আপনা প্রকাশ,
লুকায়ে সে একবার, কেন না বাহিরি আর,
হাসিলনা তব মত সুমধুর হাস।
কেন সে ত্যজিল তার আবাস আকাশ।

৫

গেছে বটে ত্যজে ;—কিন্তু স্বপন কৃপায়,
হৃদাকাশে আসি হাসি, ফুটে দুখতম নাশি,
কিন্তু যবে যায় ত্যজে স্বপন আমায়,
তখনি সে তারা মোরে ত্যজিয়া পলায়।"

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যাত্রা।

যাঁহারা আধুনিক যাত্রার নৃত্য গীত সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারা এক প্রকার মহাপুরুষ। আবার যে মহাত্মারা অভিনেতৃগণের বেশ ভূষা দেখিয়া, বা কথা বার্ত্তা শুনিয়া মোহিত হয়েন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। যাত্রার রাণী পরিচ্ছদে মেতরাণী। কেলুয়া ভুলুয়ার সঙ্গে যে মেতরাণী আইসে যাত্রার রাণীর প্রয়োজন হইলে সেই উঠিয়া দাঁড়ায়; মেতরাণীর পর রাণীর পদ আমাদের বর্ত্তমান সমাজে অসঙ্গত নহে। বোধ হয়, কথায় বার্ত্তায় রাণী ও মেতরাণীতে বড় প্রভেদ নাই, পরিচ্ছদে কিছু থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু যাত্রাওয়ালারা তাহা বড় জানে না; তাহারা রাণী কখন দেখে নাই, আপনাদিগের পরিবার দেখিয়া রাণীর ভাব ভঙ্গী অনুভব করিয়া রাখিয়াছে, প্রয়োজন হইলে আপন পরিবারের অনুকৃতি সাজাইয়া দেয়। দর্শকেরা সেই রাণীকে অন্য স্থানে দেখিলে হয় ত জেলেনী কি মালিনী ভাবিতেন, কিন্তু যাত্রায় তাহাকে রাণী ভিন্ন অন্য ভাবিবার উপায় নাই; তবে মধ্যে মধ্যে কার্য্য গতিকে তাহাকে কখন মেতরাণী, কখন খেমটাওয়ালী, কখন বাজিকর বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহা পরিচয়ে বুঝিয়া লইতে হয়, পরিচ্ছদে নহে। কোন অবস্থাতেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন হয় না, রাণী, মেতরাণীর এক পরিচ্ছদ। সকল অবস্থাতেই সালুর শাটী বা ঢাকাই শাটী।

রাজার পরিচ্ছদ আরও চমৎকার; ছিন্ন ইজার, মলিন চাপকান্, আর তৈলাক্ত জরীর টুপি। সেই পরিচ্ছদে নকিব বা জমাদার সাজিয়া আসিয়াছিল, আবার সেই পরিচ্ছদে স্বয়ং রাজাও আসিলেন। একজন ইংরেজ গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন যে, পরিচ্ছদই লোকের পরিচায়ক। কে যোদ্ধা, কে পদাতিক, কে

জজ, কে শিল্পী, তাহার পরিচয় পরিচ্ছদে পাওয়া যায়। এই কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু আমাদের যাত্রা সম্বন্ধে ইহা খাটে না। আমাদের যাত্রায় কি রাজা, কি দাস, সকলেই এক পরিচ্ছদ-ধারী। চাপকান্ তাহার মধ্যে প্রধান। বাজীকরের "বন মানুষের হাড়" স্পর্শ মাত্র সকলের পরিবর্ত্তন করে, সেইরূপ যাত্রাকরের চাপকান্ পরিধান মাত্র, সকলের রূপান্তর করে। রাজা সাজিতে হইবে, চাপকান আবশ্যক। নৃসিংহদেব সাজিতে হইবে, সেই চাপকান আবশ্যক। হনুমান্ সাজিতে হইবে, আবার সেই চাপকান আবশ্যক। বুঝি চাপকান পরিলে হনুমানের মত দেখায়।

আমাদের যাত্রাকরেরা ইতর লোক। যাত্রাওয়ালা না হইলে তাহারা হয়ত ভূমিকর্ষণ করিত, বা নৌকা চালাইত কিম্বা ভার-বহন করিত, তাহাদের নিকট উৎকৃষ্ট কিছুরই প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু একবার সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি কতকগুলি যুবা বাবু যাত্রাকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা অপর যাত্রাকরদিগের ছিন্ন মলিন পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া মার্জ্জিতরুচির উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; আমরা আহ্লাদিত চিত্তে তাহা দেখিতে গেলাম; পথে শুনিলাম, সীতার বনবাস অভিনয় হইতেছে, আমাদের আরও আহ্লাদ হইল। যাত্রার স্থানে গিয়া দেখি, মোগলাই পাগড়ি মাথায়, আলবার্ট চেন শোভিত, চস্‌মা নাকে, হাইকোর্টের উকিলের ন্যায় কতকগুলি লোক কথা বার্ত্তা কহিতেছে। পরে শুনিলাম, তাঁহাদের মধ্যেই একজন রাম, একজন লক্ষ্মণ, আর সকলে পারিষদ। আমরা কপালে হাত দিয়া বসিলাম। সুশিক্ষিত যুবারা ভাবিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র হাইকোর্টের উকিল সদৃশ ছিলেন। তিনি চস্‌মা নাকে দিতেন, মুসলমান্ দিগের মত পাগড়ি মাথায় দিতেন, সাহেব-

দিগের মত আলবার্ট চেন পরিতেন। আমাদের অদৃষ্টই মূল!

আর একবার একদল কেরানির অভিনীত যাত্রায় দেখা গিয়াছিল, সীতা রেসমের রাঙ্গা রুমাল মাথায় বাঁধিয়া নাচিতেছেন। সূর্য্যের কিরণ লাগিলে মেচোবাজারের অধিবাসিনীরা যেরূপ ভঙ্গীতে রুমাল মাথায়দিয়া চিবুকনিম্নে গ্রন্থি দেয়, সীতা সেইরূপে রুমাল বাঁধিয়াছিলেন। আমরা একজন যুবা বাবুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়াদিলেন, যে রাত্রে সূর্য্যকিরণের ভয় নাই, রুমাল সে জন্য বাঁধা হয় নাই, তবে ওষ্ঠলোম ঢাকিবার নিমিত্ত ওরূপ করিয়া বাঁধা হইয়াছে।

যেরূপ পরিচ্ছদ, তাহার অনুরূপ কথাবার্ত্তা। রাণীই হউন, আর মেতরাণীই হউন, একই পরিচ্ছদ; রাণীই হউন, আর মেতরাণীই হউন, একরূপ কথাবার্ত্তা। পরস্পরের যে প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইলে পরস্পরের কথা স্বতন্ত্র হইবে, তাহা যাত্রাকরেরা বড় জানে না; যাত্রাকরেরা কেন? অনেক আধুনিক নাটক প্রণেতারাও তাহা বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা মনে করেন বুঝেন, দেখা গিয়াছে, তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বুঝেন যে, কথাবার্ত্তা স্থলে স্বতন্ত্র অবস্থার লোককে স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করান। তাঁহারা কোন ইতর লোককে কথা কহাইতে হইলে ইতর ভাষায় কথা কহাইয়া থাকেন, কোন ভদ্রলোককে কথা কহাইতে হইলে সাধু ভাষা প্রয়োগ করান। কিন্তু যে স্থলে উভয়েই ভদ্রলোক কি উভয়েই ইতর লোক, উভয়েই এক প্রকার ভাষা ব্যবহার করে, সে স্থলে বড় গোলযোগ হয়; ভাষার মর্ম্মও এক হইয়া পড়ে।

স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্বতন্ত্র গতি, স্বতন্ত্র কথা। তাহাদের ভাষা এক হইতে পারে কিন্তু ভাষার মর্ম্ম স্বতন্ত্র। সেই স্বতন্ত্রতা আমাদের দেখাইয়া দিলে আমরা বুঝিতে পারি কিন্তু তাহা স্বয়ং

দেখাইতে পারি না। তাহা কেবল প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা দেখাইয়া দিতে পারেন।

আমাদের যাত্রাকরেরা প্রতিভাশালী নহে, তাহাদের নিকট এ সকল নির্ব্বাচনের প্রত্যাশা করি না। এমন বলি না যে, শ্রীরামচন্দ্রের মত তাহারা কথা কহিতে পারিবে, বা লক্ষ্মণ কথা কহিলে, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃতি একেবারে লক্ষ্য হইবে না। যাত্রায় কি গ্রন্থে বক্তাদিগের প্রকৃতি রক্ষা করা অতি কঠিন।

এক্ষণে আমাদের যাত্রায় কিরূপ কথা বার্ত্তা হইয়া থাকে, দেখা যাউক। প্রকৃতিপ্রভেদ জ্ঞান দূরে থাকুক, যে কথোপকথন হইয়া থাকে তাহা শুনিলে বিরক্ত হইতে হয়। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণে তাহা দেখান যাইতেছে।

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে জানকীকে বনে পাঠাইলেন। জানকী পূর্ণগর্ভা, পদব্রজে কতকদূর গমন করিয়া বড় ক্লান্তা হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "লক্ষ্মণ আর যে আমি চলিতে পারি না।"

'লক্ষ্মণ। কি বলিলেন মা জানকী, আর আপনি চলিতে পারেন না?

'জানকী। না লক্ষ্মণ, আর আমি চলিতে পারি না। আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়াছে।

'লক্ষ্মণ। সে কিরূপ, প্রকাশ করিয়া বলুন।"

সে কিরূপ, তাহা ত জানকী প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আবার কি অধিক প্রকাশ করিয়া বলিবেন? তথাপি লক্ষ্মণ বলিতেছেন, "প্রকাশ করিয়া বলুন।" বোধ হয় এই "প্রকাশ করিয়া বলুন" কথার অর্থ গীত গাইয়া বলুন। "এস্থলে প্রকাশ করিয়া বলুন" কথায় কাহার না রাগ হয়? জানকী গাইলেন, "গর্ভবতী নারী,

চলিতে কি পারি, হইয়াছে অঙ্গ অবশ।" গীতে নূতন কথা আর কিছুই প্রকাশ হইল না; জানকী পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, গীতে কেবল তাহাই প্রকাশ করিলেন, তবে গীতের কি প্রয়োজন ছিল? একভাব উপর্য্যুপরি দুই তিনবার শুনিতে গেলে আর তাহাতে অন্তর আর্দ্র হয় না, তখন সীতার নিমিত্ত দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক, বরং আবার রাগ জন্মে। যাত্রাওয়ালার পরিশ্রম বিফল হয়। যাত্রা যে "জমে না" তাহার কারণ এই।

এই সংক্রান্ত আর একটি কথা আছে, এক কথা লক্ষ্মণকে দুই তিনবার বলায় হঠাৎ বোধ হয়, লক্ষ্মণ কিছু বধির। আবার তাহার পরে মনে হয় যাত্রায় রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি সকলেই এইরূপ কিছু কিছু বধির; সকলকেই এক কথা দুইবার তিন বার করিয়া বলিতে হয়; একবার এদিকে মুখ ফিরাইয়া এক বার ওদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে হয়। কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া না বলা হউক বক্তা আপনি ঘুরিয়া ফিরিয়া বলেন। আর, যদি যাত্রার দলের লক্ষ্মণ বধির না হন, তবে তিনি বড় নির্ব্বোধ ব্যক্তি। জানকী বলিলেন, "আর আমি চলিতে পারি না।" এই সামান্য কথা তাঁহার বুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারিল না; তিনি সেই কথা পুনরুক্ত করিয়া ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "কি বলিলেন, মা জানকী, আর আপনি চলিতে পারেন না?" সীতা আবার বুঝাইয়া দিলেন, "না লক্ষ্মণ, আর আমি চলিতে পারি না।" তথাপিও লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিলেন না, তখনও লক্ষ্মণ আবার বলিতেছেন, "সে কিরূপ প্রকাশ করে বলুন। বুদ্ধিমান্ শ্রোতা মাত্রেরই এরূপ লক্ষ্মণ অসহ্য। লক্ষ্মণের "কি বলিলেন," কথাটীই অসঙ্গত।

কথা বার্ত্তার এই একটি উদাহরণ লইয়া আমাদের এত সময় গেল, কাজেই এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইতে পারিল না।

ভ্রমর

মাসিক পত্র।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল। ১৪ সংখ্যা।

কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনে লোকের আর বড় রুচি নাই, জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বলেন যে, "কীর্ত্তনে টপ্পার মজা পাওয়া যায় না, উহার ভাষা বুঝা যায় না সুরও ভাল লাগে না।"

কীর্ত্তন যে কেন ভাল লাগে না তাহার মূল কারণ "কীর্ত্তনের ভাষা বুঝা যায় না।" ভাষা বুঝিলে সুরও ভাল লাগিত, "টপ্পা" অপেক্ষা অধিক "মজাও" পাওয়া যাইত।

কীর্ত্তনের ভাষা অতি সরল, কেবল তাহার গুটিকত কথা এক্ষণে আমাদের মধ্যে আর ব্যবহার নাই; এই গুটিকত কথা অমৃত ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।* আমাদের মধ্যে

---

* এইস্থলে কয়েকটী কথার অর্থ সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশিত করা গেল। ইহা দ্বারা অনেক সাহায্য হইতে পারে।

দিঠি—দৃষ্টি	পেখিনু—দেখিনু
বিহি—বিধি	লোর—চক্ষের জল
গেহা—গৃহ	সোই—সেই

অনেকে আইরিস বালাড্স (Irish Ballads) পড়িবার নিমিত্ত আয়র্লণ্ড দেশের অপ্রচলিত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু নিজ দেশের রত্নভোগ করিবার নিমিত্ত দুইটা পুরাতন কথার অর্থ সংগ্রহ করেন নাই। যদি তাঁহারা এই সামান্য শ্রমস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রম নিতান্ত বৃথা হইবে না।

এক্ষণে কীর্ত্তনের আদর নাই বলিয়া ক্রমে কীর্ত্তন লোপ পাইতেছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় কীর্ত্তন কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত আছে। কলিকাতাঞ্চলে কীর্ত্তন একেবারেই নাই, ঢপের গীতকে তথায় কীর্ত্তন বলে। তথাকার অনেকে ঢপ শুনিয়া কীর্ত্তনের প্রতি দেশ প্রকাশ করেন।

আবার অনেকের কৃষ্ণ বিষয়ক গীতে বিদ্বেষ আছে। তাঁহারা বলেন রাধাচরিত্র নীতিবিরুদ্ধ। রাধা একের পত্নী হইয়া অন্যকে ভাল বাসিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার গল্প পবিত্র সংসারে অপাঠ্য, অশ্রাব্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ পবিত্র সংসারে রাধাকলঙ্কিনী অপরিচিতা? তাঁহার পরিচয়ে কোন্ সংসারে অনিষ্ট ঘটিয়াছে? যদি রাধা কলঙ্কিনীর নাম আমরা বাঙ্গালা হইতে উঠাইয়া দিই, তথাপি অনেক কলঙ্কিনীর নাম

আন্—অন্য	ঝাপল—ঢাকিল
বৈঠল—বসিল	মুরছি—মূর্চ্ছা
ভেল—হইল	কৈছন—কেমন
শুনইতে—শুনিতে	বাট—পথ
মাসা—মাস	বরিখা—বৎসর
দেহা—দেহ	পাস—নিকট
মঝু—আমার	যবহুঁ—যেপর্য্যন্ত
পয়ান—পলায়ন	ঠাম—স্থান
অবহুঁ—এখন	কোর—কোল
আওব—আসিবে	জনু—যেন
সাঙন—শ্রাবণ	নিয়ড়—নিকট

থাকিবে। কলঙ্কিনী গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়; একা রাধার নাম উঠাইয়া কি হইবে? কীর্ত্তনের কলঙ্কিনী অপেক্ষা পাড়ার কলঙ্কিনী অধিক অনিষ্ট করে। রাধা কলঙ্কিনী বলিয়া যাঁহারা কীর্ত্তন শুনেন না, তাঁহারা সাবধানী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা প্রায় কণ্টকের ভয়ে গোলাপ ত্যাগ করেন।

কীর্ত্তনে কবিত্ব আছে, এইজন্যই বাঙ্গালির পক্ষে কীর্ত্তন আদরের ধন হওয়া উচিত। সুখদ রস বাঙ্গালির যত হৃদয়গ্রাহী এত আর অন্য কোন দেশীয়দিগের নহে। তাহার কারণ কি, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু কথাটী সত্য। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বাঙ্গালির অন্তঃকরণ অতি কোমল; এত দয়া, এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত আহ্লাদ আর কোন দেশীয় দিগের মধ্যে দেখা যায় না। যে অন্তঃকরণ কোমল সেই অন্তঃকরণই রসের আধার; কেবল কাব্য রস নহে, অন্তঃকরণ কোমল হইলে সুখদ রস মাত্রেই অধিকার জন্মে।

বাঙ্গালি এত রসপ্রিয় কেন, বাঙ্গালির অন্তঃকরণ এত কোমল কেন, জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কোন উত্তর দিতে সক্ষম নহি। দেশবিশেষের গঠন দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত, অধিবাসীদিগের স্বভাব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; যে দেশে কেবল প্রস্তরময় কঠিন পর্ব্বত, ফল নাই, ফুল নাই সে দেশের লোকের অন্তঃকরণ অতি কঠিন বলিয়া তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালির অন্তঃকরণ যে কেন কোমল তাহা প্রতিপন্ন করা যায়। বঙ্গালার মৃত্তিকা পর্য্যন্ত কোমল, পর্ব্বত নাই, পাহাড় নাই, একখানি কঠিন প্রস্তর পর্য্যন্তও নাই; সর্ব্বত্রেই ফল ফুল, সকল দ্রব্যই নয়নরঞ্জক। কাজেই বাঙ্গালির অন্তঃকরণ সতত প্রফুল্ল সতত রসপূর্ণ।

যে দেশে "কঠিন মাটী" বা যে দেশ কেবল পর্ব্বতময় সে

দেশের অধিবাসীরা বহুকষ্টে শস্যোৎপাদন করে, বহুশ্রমে জীবন ধারণ করে। পরিশ্রমে বলবৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু অধিক পরিশ্রমে রসগ্রাহিণী শক্তিকে দুর্ব্বল করে। যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় পরিশ্রম বাড়িতেছে, সেই পর্য্যন্ত সকল রসেই বাঙ্গালির প্রবৃত্তি কমিতেছে; কিন্তু তথাপি বাঙ্গালায় যে পরিমাণে রসপ্রিয়তা রহিয়াছে তাহা আর কুত্রাপি নাই।

আমরা বলিয়াছি, বাঙ্গালির অন্তঃকরণ কোমল। কোমল বলিয়া বাঙ্গালির শোক অধিক। না কাঁদিলে কাব্য জন্মে না। ইংলণ্ড স্বাধীন, কখন কাঁদে নাই, ইংলণ্ডের কাব্য সামান্য; ইংরাজিতে যাহাকে Poetry বলে, ইংলণ্ডে তাহা অতি অল্প। আয়র্লণ্ড পরাধীন, অনেক কাঁদিয়াছে এই জন্য ইংলণ্ড অপেক্ষা আয়র্লণ্ডে Poetry অধিক। স্বাধীনতার নিমিত্ত আমরা কখন কাঁদি নাই, স্বাধীনতা আমরা কখন গ্রাহ্যও করি নাই, কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ কোমল, কাঁদিতে পারি; অন্যের নিমিত্ত অনেক কাঁদিয়া থাকি এইজন্য আমাদের দেশে Poetry বা রস অধিক। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় Poetry শব্দের অনুরূপ কোন কথা পাই নাই বলিয়া রস শব্দ প্রয়োগ করিলাম। কিন্তু রস শব্দে অনেকে সামান্য রস বুঝেন, অনেকে আবার আদিরস ভাবেন। রসিক শব্দের অর্থ আরও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে!

আর এক কথা। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, পৌত্তলিক ধর্ম্ম কাব্য রসোদ্দীপক। এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কাব্য রস অধিক হওয়া সম্ভব, কেন না আমরা পৌত্তলিক। বাঙ্গালায় যখন সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তখন এদেশে কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। পরে যখন তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচলিত হইল, তখনকার কবি একা জয়দেব। কিন্তু তিনি নিজে তান্ত্রিক ছিলেন না। ঘোর তান্ত্রিক কেহ

কখন কবি হয় নাই। তাহার পর যখন বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম বাঙ্গালায় পরিবৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল তখন গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, চণ্ডী-দাস প্রভৃতি অনেক কবি জন্মগ্রহণ করেন। কাশীদাস, কৃত্তি-বাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, প্রভৃতি পরস্পর সকলেই বৈষ্ণব না হউন তাঁহারাও এই সময়ের ব্যক্তি। আবার এই সঙ্গে যদি নালুনন্দলাল, হরুঠাকুর, নিতাইদাস, রামবসু প্রভৃতিকে গণনা করা যায় তাহা হইলে আমাদের কবির সংখ্যা অল্প হইবে না। তান্ত্রিক সময় কিছুই ছিল না, আবার বৈষ্ণবাধিকারে অসংখ্য কবির আবির্ভাব হইল, ইহাদ্বারা বোধ হয় যে পৌত্তলিক ধৰ্ম্ম-মাত্রই কাব্যরসোদ্দীপক নহে। পৌত্তলিক ধৰ্ম্ম যে রসোদ্দী-পক ইহার প্রমাণ আমাদের দেশে কেবল বৈষ্ণব ধৰ্ম্মে বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে।

যশোদার পবিত্র স্নেহ, রাধিকার অকৃত্রিম প্রেম, রাখালদিগের সখ্য ভাব বাঙ্গালায় নিষ্ফল হয় নাই, ইহার ফল মহাজন কবি। তান্ত্রিক ধৰ্ম্মে কোন সুখদ মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে পায় না, বরং তাহা অঙ্কুরেই নষ্ট হয় এই জন্য তান্ত্রিক ধৰ্ম্মের সময় বাঙ্গালায় কবি ছিল না।

আমাদের দেশে যত শ্রেষ্ঠ কবি জন্মিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণবিষয়ক রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অধিক এবং তাহারাই অন্য কবির মধ্যে প্রধান। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র এই চারি জন লব্ধ-নামা কিন্তু তাঁহাদের সকলেই মহাজন নহেন; কেহ বাল্মীকির খাতক, কেহ ব্যাসদেবের খাতক, কেহ বা সকলেরই খাতক। এই কথা কত দূর সত্য তাহা আপাততঃ দেখাইবার স্থানাভাব। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে সকলেই মহাজন নহেন কিন্তু যাঁহারা

মহাজন তাঁহারা সকলের নিকট পরিচিত নহেন; কেন না আমরা সকলেই গুণগ্রাহী নহি।

আমরা বলিয়াছি যে, বঙ্গকবিদিগের মধ্যে বৈষ্ণব কবিরা শ্রেষ্ঠ আবার বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে যাঁহারা কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আরও শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা বিচার করিতে গেলে কবির কার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হয় কিন্তু এত কথার পর এক্ষণে সে আলোচনা যে সকলের আর ভাল লাগে এমত বোধ হয় না; তথাপি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে।

কোন কবি পৃথিবীর বাহ্যবস্তু চিত্র করেন, কেহ বা মনুষ্য-হৃদয় চিত্র করেন। যিনি বাহ্যবস্তু চিত্র করেন তাঁহার কার্য্য কতক সহজ। তিনি নীল আকাশ দেখিয়াছেন, জলপূর্ণ নবমেঘ দেখিয়াছেন, কোমল পুষ্প দেখিয়াছেন, ঘোর অন্ধকার দেখিয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই চিত্র করেন। কিন্তু যে কবি মনুষ্যহৃদয় চিত্র করেন তাঁহার কার্য্য কঠিন। তিনি যাহা চিত্র করেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা তাঁহাকে অনুভব করিয়া লইতে হয়। যিনি বাহ্য বস্তু বর্ণনা করেন তিনি অবিকল বর্ণনা করিতে পারিলেই তাঁহার প্রশংসা, আবার তাহাতে কল্পনা মিশাইতে পারিলে আরও প্রশংসা। সাদৃশ্য কল্পনাই তাঁহার প্রয়োজনীয়। সন্ধ্যার সময় নক্ষত্র অল্প অল্প দেখা যাইতেছে, কোনটি দেখা যাইতেছে আবার কোনটি দেখা যাইতেছে না এই বলিলে হয় ত বর্ণনা সম্পন্ন হইত কিন্তু তাহাতে কবিত্ব থাকিত না। এস্থলে ফুলের সহিত নক্ষত্রের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া নক্ষত্র "ফুটিতেছে" বলিলে কবিত্ব রক্ষা হইল। তদ্রূপ, আকাশের সহিত সমুদ্রের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া "আকাশে শশী ভেসে যায়" বলিলে

রস হইল। উপমায় ও সাদৃশ্য কল্পনায় কালিদাস পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। তৎকৃত রঘুবংশের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটী এই গুণে বিশেষ বিখ্যাত।

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং তদেব নৈসর্গিক মুন্নতত্বম্
ন কারণাৎ স্বাদ্বিভিদে কুমারঃ প্রবর্ত্তিতো দীপইব প্রদীপাৎ।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। পিতার ন্যায় অবিকল পুত্র হইল যেন দীপশিখা হইতে দীপশিখা জন্মিল।

এ সকল উপমা, রূপক, কল্পনা, কবিত্ব সকলই সুন্দর; ইহার কবিরাও ক্ষমতাবান্ কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা যাঁহারা মনুষ্য-হৃদয় চিত্র করেন তাঁহারা আরও ক্ষমতাবান্। তাঁহারা নূতন সৃষ্টি করেন। তাঁহারা মনুষ্য হৃদয় দেখেন নাই বুঝিয়াছেন। যাহা দেখা নাই তাহার অবিকল চিত্র হয় না কিন্তু যাহা বুঝা গিয়াছে তাহার স্বরূপ চিত্র হইতে পারে। যদি কোন মনুষ্য-হৃদয় অবিকল চিত্রিত হইতে পারিত তাহা হইলে যে মনুষ্য আছে বা ছিল তাহারই অনুকরণ হইত মাত্র, নূতন কিছুই হইত না। কিন্তু যে মনুষ্যহৃদয় কখন ছিল না, এই কবিরা তাহাই চিত্রিত করেন। এইরূপে সীতার উৎপত্তি। সীতা কাহারও গর্ভে জন্মান নাই বাল্মীকি তাহা আপনিই বলিয়া দিয়াছেন। সীতা জনকের কন্যা, জননীর নহে। সীতা বাল্মীকির মানস কন্যা, বিধাতার সৃষ্টি নহে; অথচ সৃষ্টা মানবী অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠা। এত পতিভক্তি, এত প্রণয়, এত ক্ষমা, এত সহ্য, এত অভিমান, এত নম্রতা কখন মানবীর হয় নাই। এ পৃথিবীতে কখন সীতার তুল্য স্ত্রীলোকের পদস্পর্শ হয় নাই।

এইজন্য বলিতেছিলাম বাহ্য বস্তুর চিত্রকর অপেক্ষা, হৃদয় চিত্রকর শ্রেষ্ঠ। যে কবিরা কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন তাঁহারা

হৃদয়চিত্রকর। তাঁহারা রাধার হৃদয় চিত্র করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় রাধার সকল অন্তর্বৃত্তি চিত্র করেন নাই; কেবল তাঁহার প্রণয় চিত্র করিয়াছেন। সেই চিত্র এত সম্পূর্ণ যে তাহা সচরাচর দেখা যায় না; প্রণয়ের অতি সূক্ষ্ম উচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত যেন অণুবীক্ষণে দেখিয়া চিত্রিত হইয়াছে।

কতকগুলি গীত উদ্ধৃত করিয়া উপরোক্ত কথা প্রতিপন্ন করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল কিন্তু নিকটে গ্রন্থ না থাকায় তাহা হইল না; বারান্তরে চেষ্টা করা যাইবে, আপাততঃ কেবল দুই একটি গীতাংশ যাহা স্মরণ হইল তাহাই সন্নিবেশিত করা গেল। আমরা যাহা বলিতেছিলাম, এই গীত কয়েকটী তাহার অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ নহে, অথচ নিতান্ত মন্দও নহে। প্রথমতঃ কৃষ্ণের নিমিত্ত রাধার অবস্থা বর্ণন।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসাইয়া পরে॥

"ভূষণ খসাইয়া পরে" এই পরিচয়টি অসাধারণ ভাব ব্যঞ্জক। এতদ্দ্বারা মনের অবস্থা যে কতদূর প্রকাশ হইয়াছে, আক্ষেপের বিষয় তাহা সকলে বুঝিতে সক্ষম নহে। যে কথা দশ পরিচ্ছেদ লিখিলেও প্রকাশ হইত না, তাহা তিনটি কথায় প্রকাশ হইয়াছে।

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমত যোগিনী পারা॥

এলাইয়া বেণী, খুলয়ে গাঁথনি, দেখয়ে খসাইয়া চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে, কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়, কালিয় বন্ধুর সনে॥

মেঘ, কেশ প্রভৃতির বর্ণে কৃষ্ণের বর্ণ সাদৃশ্য স্মরণ থাকিলে এই গীতের অর্থ ও সৌন্দর্য্য বুঝা যাইবে।

কৃষ্ণবিরহে রাধা যখন জানিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত, সেই সময়ের উক্তি—

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিও মোর নাম দুই চারি॥
* * * *
সখীগণ গণইতে লইও মোর নাম॥
এই সব অভরণ দিও পিয়া ঠাম।
জনমের মত মোর এই পরণাম॥

এই গীতটি বিদ্যাপতির বলিয়া পরিচিত কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ইহা তাঁহার রচিত না হইলেও তাঁহার তুল্য ব্যক্তির রচিত বটে। "যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি। সেখানে লিখিও মোর নাম দুইচারি।" তাহাতেও রাধার সুখ, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কৃষ্ণ সেই নাম অবশ্য পড়িবেন, পড়িলে রাধাকে স্মরণ হইবে, রাধার তাহাই সুখ; হয়ত রাধার নিমিত্ত একটু নয়নাশ্রু মুছিবেন, রাধার আরও সুখ। "এই সব অভরণ দিও পিয়া ঠাম।" অভরণ দেখিলে কৃষ্ণ চিনিতে পারিবেন, রাধার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, একান্ত না জিজ্ঞাসা করেন, তথাপি রাধাকে তাঁহার স্মরণ হইবে, রাধা আর নাই অভরণ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিবেন, অভরণ রহিয়াছে সে রাধা নাই, ভাবিয়া কাঁদিতেও পারেন এই মনে করিয়াও রাধা সুখী; রাধা মরিতে বসিয়াও কৃষ্ণ প্রেমের

অভিলাষী। জীবিতে তাহা পাইলেন না, মরিলে পাইবেন এই আশায় রাধার সুখ।

আবার "সখীগণ গণইতে লইও মোর নাম" অর্থাৎ আমি মরিলেও নাম করিও। সখীগণের যখন একে একে নাম হইবে সেই সঙ্গে আমার নাম করিও। আমি মরিয়াছি বলিয়া আমায় ভুলিও না, যাহাদের সঙ্গে একত্রে আমি থাকিতাম, ভ্রমিতাম, কৃষ্ণের নিমিত্ত কাঁদিতাম, আমার নাম তাহাদের সঙ্গ ছাড়া করিও না।

যাঁহাদের রসবোধ নাই তাঁহাদের উদ্দেশে আমরা এই গীতগুলির অর্থ করিতে গিয়া বোধ হয় গীতের রসভঙ্গ করিয়াছি, রসজ্ঞের নিকট তন্নিমিত্ত আমরা ক্ষমাপ্রার্থী রহিলাম
একটী গীত আমাদের স্মরণ হইয়াছে, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এবার তাহার অর্থ করিতে চেষ্টা পাইব না, গীতটী এতই সহজ যে নিতান্ত অরসিক ব্যক্তিরও রসগ্রহ হইবে বলিয়া আমাদের ভরসা আছে। আমরা এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতটীর ন্যায় এ গীতটিও মৃত্যুকালীন রাধার উক্তি।

কইও কানুরে সই কইও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রহিল এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বঁধুরে এই সব নিবেদন॥

কীর্ত্তনের গীতমাত্রই যে এইরূপ রসপূর্ণ এমত নহে, কীর্ত্তনের রচয়িতা মাত্রই যে কবি তাহাও নহে। এক্ষণকার "বাদনদারের" ন্যায় ইতর লোকেও অনেক কীর্ত্তন "বাঁধিয়া" গিয়াছে, সেই সকল অপকৃষ্ট গীত বৈষ্ণবেরা যত্ন করিয়া রক্ষা করিয়াছে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক্ষণে ভক্তিরস অধিক, কাব্য রস অল্প। কোন্ গীতটী ভাল কোন্ গীতটি মন্দ, তাহা বিচার করা বোধ হয় তাহাদের বড় আর সাধ্য নাই। কীর্ত্তন যাহাদের ব্যবসা তাহাদের ত কথাই নাই, শ্রোতা যে গীতে প্রশংসা করেন, তাহারা সেই গীত ভাল বিবেচনা করে। তাহাদের নিজের রুচি শ্রোতাদিগের ন্যায় অপকৃষ্ট। পদকল্পলতিকা যাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি আরও অপকৃষ্ট। বটতলার এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে, কীর্ত্তন তথায় যাইয়া "কেতাবওয়ালা" দিগের গুণে অস্পর্শনীয় হইয়া আসিয়াছে। সংগ্রহকারেরা রসপূর্ণ গীত মাত্রই প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে অতি অপকৃষ্ট পদগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তথাপি পদকল্প-লতিকায় যাহা পাওয়া যায়, মুদ্রাঙ্কিত আর কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না, আমরা যে গীত কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও পদকল্পলতিকায় আছে।

কণ্ঠমালা।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলকে বিসর্জ্জন করিয়া রামদাস সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ বিলম্বে অতি অন্যমনস্কে আপন কুটীর সম্মুখে আসিলেন। স্ত্রীহত্যা করিয়াছেন বলিয়া অন্যমনস্ক নহেন; শৈলকে নদীতে নিক্ষিপ্ত করিবার সময় পশ্চাতে কে চীৎকার করিয়াছিল, এই চিন্তায় তিনি

অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। যেই চীৎকার করুক তাঁহার একবার বোধ হইয়াছিল সে ব্যক্তি যেন পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া শৈলের সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দিয়াছে, কেন না সেই সময় শুভ্রবর্ণ কি এক পদার্থ বিদ্যুদ্বৎ পশ্চাৎ হইতে ছুটিতে দেখিয়াছিলেন, আর তাহার বেগতাড়িত বাতাস সন্ন্যাসীর অঙ্গে লাগিয়াছিল। এই ঘটনা তাঁহার নিশ্চয় স্মরণ নাই কেবল এক একবার সন্দেহ হইতেছিল মাত্র কিন্তু সে বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছিলেন না।

সন্ন্যাসী কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যে স্থান হইতে শৈলকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, সেইদিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। তাহার পর কুটীরের দ্বার মুক্ত করিলেন; কুটীরে দীপ ছিল না; অন্ধকারে তথায় প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বোধ হইল, তথায় আর কেহ বসিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিয়া সত্বর উঠিয়া অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল। সন্ন্যাসী ক্ষণেক দ্বারে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিলেন, তাহার পর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আলোক জ্বালিয়া দেখিলেন, গৃহে কেহ নাই। অতএব ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রা আসিল না। শয়ন করিয়া সন্ন্যাসী নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একবার হঠাৎ উঠিয়া আলোক পুনর্জ্জালিত করিয়া দীপ হস্তে বহির্গত হইলেন। মোহান্তের কুটীরে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। মোহান্ত তাঁহাকে চাবি দিয়া গিয়াছেন কিন্তু ধন কোথায় তাহা বলিয়া যান নাই, সন্ন্যাসীও তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। এক্ষণে সেই সন্ধানে সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন; কখন প্রাচীরে, কখন হর্ম্ম্যতলে আঘাত করিয়া কিরূপ শব্দ হয় কর্ণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

সন্ন্যাসী অতি বিষাদিত অন্তঃকরণে দীপ হস্তে আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন; আসিবার সময় আর একবার নদীর দিকে দৃষ্টি করিলেন। যেস্থান হইতে শৈলকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন সেই স্থানে দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত পথে দাঁড়াইয়া, দীপালোক হস্তদ্বারা আবরণ করিয়া আবার সেই দিকে চাহিলেন; তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল যে, তথায় একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কে সে ব্যক্তি তাহা অনুসন্ধান করিতে আর তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল না, সেই দিকে যাইতেও আর তাঁহার বড় সাহস হইল না। কিঞ্চিৎ চঞ্চল পদবিক্ষেপে আপন কুটীরাভিমুখে গেলেন। চাঞ্চল্যে দীপ নিবিয়া গেল। এই সময় শব্দে বোধ হইল যেন কে আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া নিকট দিয়া দ্রুতবেগে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে। সন্ন্যাসীর অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কুটীরে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দীপ জ্বালিলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হর্ম্ম্যতলে জলসিক্ত ক্ষুদ্র পদচিহ্ন রহিয়াছে!

সন্ন্যাসী পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিলেন, পদচিহ্ন দেখিয়া আর সে ভয় রহিল না। ভাবিলেন, অবশ্য কোন মনুষ্য আসিয়াছিল। কিন্তু জলের চিহ্ন দেখিয়া কিছু সন্দেহ হইল। সন্ন্যাসী আবার বহির্গত হইয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল; যে স্থান হইতে শৈলকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই স্থানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। নদী অতি গভীর গর্জ্জন করিতেছে যেন অতি রাগভরে কাহাকে তিরস্কার করিতেছে। সন্ন্যাসী ফিরিলেন; ফিরিবার সময় যত দূর দেখা যায় একবার নদীকূল নিরীক্ষণ করিলেন। কোথায়ও শবভুক্‌পক্ষী কি কুক্কুরের জনতা দেখিতে

পাইলেন না। সন্ন্যাসী শেষে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেখানে শৈল রক্ষিত হইয়াছিল সেই কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ক্ষণেক দাঁড়াইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিলেন। তাহার পর কি মনে ভাবিয়া যে ঘরে মাধবী রক্ষিতা হইয়াছিল সেই ঘরের দিকে চলিলেন। হঠাৎ দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন; দ্বার খোলা রহিয়াছে। দ্রুতবেগে গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখেন, তথায় মাধবী নাই, মাধবী পলাইয়াছে। সন্ন্যাসীব মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। পূর্ব্ব দিন যখন মোহান্ত তাঁহার হস্তে ধনাগারের চাবি দিয়া চলিয়া গেলেন, তখন সন্ন্যাসীর সুখের আর সীমা ছিল না। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের আপনাকে একমাত্র অধিকারী জানিয়া মাধবীকে বিবাহ করিবেন মনঃস্থ করিয়াছিলেন; মাধবী সুন্দরী, সতী, নম্র-স্বভাবা, আবার অতি প্রধান কুলোদ্ভবা, মাধবী স্ত্রীজাতির মধ্যে রত্নবিশেষ। নর্ত্তকী বলিয়া তাহার একমাত্র কলঙ্ক কিন্তু মাধবী কখন নৃত্য করে নাই; মাধবীর পিতৃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহারাজ তাহাকে নর্ত্তকী বলিয়া গোপনে রাখিয়াছিলেন, সে সকল কথা সন্ন্যাসী জানিতেন। অতএব তাহাকে বিবাহ করিবার কোন বাধাই ছিল না। সন্ন্যাসী ভাবিয়াছিলেন মাধবী দেবদুর্ল্লভা, মাধবী ঘরনী না হইলে ঐশ্বর্য্য বৃথা। পূর্ব্বরাত্রে সন্ন্যাসী বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে মাধবী কোন উত্তর দেয় নাই, কেবল নতশিরে মাথার কাপড় টানিয়া মুখাবরণ করিয়াছিল। সন্ন্যাসী তাহাই সম্মতির চিহ্ন বিবেচনা করিয়া আহ্লাদে যখন চলিয়া যান, তখন দ্বাররুদ্ধ করিয়া যাইতে তাঁহার স্মরণ হয় নাই। মাধবী এই সুযোগে পলাইয়াছিল।

সন্ন্যাসী বুঝিলেন যে, দ্বার মুক্ত ছিল বলিয়াই মাধবী পলাইতে সক্ষম হইয়াছে। অতএব দ্বারের প্রতি অতি কঠোর

দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু সেই দৃষ্টির তীব্রতা লৌহদ্বার কিছুই বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পক্ক ভ্রূকেশ নানা ভঙ্গীতে অবনত হইয়া চক্ষুকূপদ্বয় প্রায় আবরণ করিয়াছে। তাহার অন্তরাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিপাত দেখিলে বোধ হয় যেন লতাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র গর্ত্ত হইতে কোন হিংস্র কীট বিষক্ষেপ করিতেছে। মাধবী এই দৃষ্টিতে ভয় পাইত; শৈল এই দৃষ্টিতে হাসিত।

মুসলমান দারগা শম্ভু কয়েদীর তত্ত্ব লইতে রাত্রে আসিবার কথা ছিল কিন্তু আসিল না। সন্ন্যাসী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিলেন, শেষ আপন কুটীরে যাইয়া শয়ন করিলেন। পরে কয়েক দিন সন্ন্যাসী অতি বিষাদিতান্তকরণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ধনাগারের চাবি পাইয়াছেন কিন্তু ধন পান নাই, মাধবী পলাইয়াছে, শম্ভু কয়েদী ধরা পড়ে নাই। এইসকল ঘটনা সন্ন্যাসীর বিষণ্নতার কারণ। রামদাস নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন, সম্পূর্ণ সুখ মনুষ্যের অদৃষ্টে ঘটে না।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চারি পাঁচ দিবস পরে এক দিবস প্রাতে সুরগ্রামবাসীরা সুসজ্জ হইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন; তথায় বিলাস বাবুর বিচার হইবে বড় সমারোহ। পথিমধ্যে দলে দলে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "বিলাসের নিশ্চয় ফাঁসি হইবে।" কেহ বলিতে লাগিল "ফাঁসি কি মুখের কথা! বিলাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ কি আছে?" প্রথম বক্তা বলিল, "প্রমাণ অবশ্যই আছে, প্রমাণ না থাকিলে কি মেজেষ্টার সাহেব দায়রা সোপর্দ্দ করেন। বিলাস আপনিই স্বীকার করিয়াছে আবার চৌকীদার খুন করিতে দেখিয়াছে।" দ্বিতীয় বক্তা বলিল,

"চৌকীদার সহস্রবার দেখুক, প্রমাণ না থাকিলে কিছুই হইবে না; এক্ষণকার আইন বড় শক্ত।" প্রথম বক্তা ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তুমি কি মূর্খ! আবার কি প্রমাণ চাও? তবে প্রমাণ কাহারে বলে তাহা জান না।" দ্বিতীয় বক্তা আরও ক্রুদ্ধভাবে চীৎকার করিয়া বলিল, "কি! আমি মূর্খ? আমি প্রমাণ চিনি না? বল দেখি তুমি কয়জন মোক্তারের বাটী গিয়াছ? কয়জন মোক্তারকে চেন? আমার অপেক্ষা তুমি প্রমাণ বুঝিয়া থাক? প্রমাণ মুখের কথা আর কি? অমনি বলিলেই হয় না; বাড়ী বসিয়া অন্নধ্বংসাইয়া প্রমাণ শিক্ষা হয় না, মোক্তারদের সহিত আলাপ করিলে তবে প্রমাণ শিক্ষা হয়, অন্যে হয় না।"

এই সময় আর এক দলের মধ্যে মহা বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, বিনোদকে শাবল ফেলিয়া মারিয়াছে। কেহ বলিতেছে মুখে বালিষ চাপিয়া মারিয়াছে। ক্রমে বাগ্‌যুদ্ধ হইতে মল্লযুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া আর সকলে যোদ্ধাদিগকে নিরস্ত করিয়া দিল। সকলেই ক্ষণেক কাল পরস্পর আপনাপন মনে বিনোদের কথা, শৈলের কথা, আপনার স্ত্রী বা কন্যার কথা, বা অন্য কোন কথা চিন্তা করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে একটি বালক মাতৃদত্ত দুইটি পয়সা লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে যাইতেছিল। সকলে নিরস্ত হইলে বালকটি আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এই পয়সায় কি কিনিব?" পিতা উত্তর করিলেন, "সন্দেশ কিনিও।" বালক "আচ্ছা" বলিয়া নাচিতে নাচিতে সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল। যে বক্তার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, যাঁহার সহিত মোক্তারদিগের আলাপ আছে, যিনি প্রমাণ কাহারে বলে ভাল জানেন, বালকটি তাঁহারই পুত্র। বালকটি আবার পিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"বাবা! দুই পয়সায় ফাঁসি কিনিতে পাওয়া যায় না?" পিতা বলিলেন, "না" পুত্র পুনরায় অতি স্নেহভাবে বলিল, "বিলাস বাবুর ফাঁসি হবে, বাবা, তোমার ফাঁসি কবে হবে?" বালকের এই প্রশ্নে সকলে হাসিয়া উঠিল। পিতা অপ্রতিভ ও রাগান্ধ হইয়া বালককে প্রহার করিতে লাগিলেন। বালকটি কি অপরাধ করিয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চীৎকারস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পিতা আরও প্রহার করিতে লাগিলেন। সঙ্গীরা আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা করিলে বালক কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিল। পিতা তাহার প্রতি আর লক্ষ্য না করিয়া ফাঁসি দেখিতে নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা বালককে দুই একবার ডাকিয়া বালকের পিতার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। সকলেই ভাবিলেন বালক অধিক দূর যাইবে না শীঘ্রই ফিরিবে। কিন্তু বালক আর ফিরিল না। কতক দূর হইতে সকলে দেখিলেন বালক একটি স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে উঠিয়া যাইতেছে। স্ত্রীলোকটি যে কে, তাহা কেহ অনুভব করিতে পারিলেন না; সে বিষয়ে আর কেহ বড় অনুসন্ধানও করিলেন না; সকলেই নগরাভিমুখে চলিলেন। নগরের নিকটে যাইয়া দেখেন সেই স্ত্রীলোকটি অতি দ্রুত পদবিক্ষেপে তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতেছে। চকিতের মধ্যে তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি যুবতী কিন্তু অবগুণ্ঠনবতী; শীর্ণা অথচ বলিষ্ঠা; কেহ তাঁহারে চিনিতে পারিলেন না। বালকের পিতা একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সন্তানকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?" অবগুণ্ঠনবতী কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। পিতা সঙ্গে সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। সকলেই তাঁহারে বলিল চিন্তা নাই, যুবতী পরিচিতা না হইলে তোমার বালক উহার ক্রোড়ে যায় নাই।

সে একাই বাটী ফিরিয়া যাইতে পারে তাহার নিমিত্ত কোন ভাবনা নাই। পিতাও তাহা বুঝিলেন। শেষে সকলে একত্রে বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। বিচার তখন আরম্ভ হইয়াছে। সমুদায় সাক্ষীর "জবানবন্দী" হইয়া গিয়াছে। বিলাস বাবু যোড় করে নতশিরে দাঁড়াইয়া আছেন, চারিদিকে কনেষ্টেবলগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গ্রামবাসীরা বহু যত্ন করিতে লাগিল কিন্তু লোকের জনতাপ্রযুক্ত কেহই অগ্রসর হইতে পারিল না। কিন্তু সেই লোকারণ্য মধ্যে অবগুণ্ঠনবতীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। জজ সাহেবও পুনঃপুনঃ তাঁহার প্রতি চাহিতেছিলেন।

সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেলে, বিলাস বাবুকে জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমার কিছু বলিবার আছে?" বিলাস বাবু একবার বাম পদে একবার দক্ষিণ পদে ভর দিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ অস্থির হইলেন কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না। জনেক কর্ম্মচারীর দ্বারা জজ সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বিনোদকে খুন করিয়াছ?" বিলাস বাবু ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া জজ সাহেবের দিকে চাহিলেন, কিন্তু জজ সাহেব তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অমনি নতশির হইয়া দাঁড়াইলেন। জজ সাহেব ভাবিলেন এব্যক্তি নিশ্চয় অপরাধী তাহাই আমার দিকে চাহিতে পারিতেছে না।

কর্ম্মচারী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বিনোদ বাবুকে হত্যা করিয়াছ?"

বিলাস প্রথমতঃ মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলেন, পরক্ষণে স্পষ্টস্বরে বলিলেন,"হুঁ খুন করিয়াছি—অন্ধকার রাত্রে খুন করিয়াছি।"

জজ। কিরূপে খুন করিলে?

বি। যে রূপে লোকে খুন করে অর্থাৎ অর্থাৎ—

জজ। কোন অস্ত্রদ্বারা খুন করিয়াছিলে ?

বি। না অস্ত্র নহে—হাঁ অস্ত্র বই কি—শাবল দ্বারা—

জজ। শাবল দ্বারা কোথা আঘাত করিয়াছিলে?

বি। শাবল দ্বারা কোথায়ও আঘাত করি নাই।

জজ। তবে কিরূপে খুন করিলে?

বি। পদদ্বারা তাহার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিলাম।

জজ। তবে শাবলের কথা কেন বলিতেছিলে ?

বি। শাবল আমার হাতে ছিল।

জজ। তোমায় তৎকালে কেহ দেখিয়াছিল ?

বি। দেখিয়াছিল।

জজ। কে দেখিয়াছিল?

বি। তাহা জানি না।

জজ। এই চৌকিদার দেখিয়াছিল?

বি। দেখিয়াছিল, ঐ ত আমায় বাঁচায়?

জজ। কেন, তোমার কি হইয়াছিল ?

বি। আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম।

জজ। কেন মূর্চ্ছা গিয়াছিলে?

বি। ভয়ে।

জজ। কিসে ভয় পাইয়াছিলে ?

বি। প্রাচীরের উপর চৌকিদারকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম।

জজ সাহেব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই সময় অবগুণ্ঠনবতী ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আপন মুখাবরণ মুক্ত করিয়া অতি পরিষ্কার স্বরে বলিল, "ধর্ম্মাবতার এব্যক্তি

বাতুল, ইহার কোন কথাই বিশ্বাস করিবেন না, খুন আমি করিয়াছি।"

বিলাস বলিয়া উঠিল "হাঁ হাঁ খুন এই করিয়াছে এই শৈল।" নাম মাত্রে সকলের দৃষ্টি শৈলের উপর পড়িল; শৈল পাণ্ডুবর্ণা, ভয়ঙ্করা, শীর্ণা, সুন্দরী। শৈলের পরিচয় পূর্ব্বে রাষ্ট হইয়াছিল, সেই রাক্ষসীকে দেখিবার নিমিত্ত একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। শত শত লোক তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, শৈল দৃক্‌পাতও করিল না। কনেষ্টবল দিগের তাড়নায় কলরব কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, শৈল পূর্ব্বমত আবার বলিল, "খুন আমি করিয়াছি, আমার প্রতি ফাঁসি আজ্ঞা হউক।"

জজ সাহেব একাল পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া এক দৃষ্টে শৈলের প্রতি চাহিয়াছিলেন। শৈল মৃত্তিকার নিম্নে বহু দিবসাবধি বাস করিয়া বিবর্ণা হইয়াগিয়াছিল। জজ সাহেব সেরূপ বর্ণ কখন মনুষ্যের দেখেন নাই। মনুষ্যের এই নূতন বর্ণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। শৈলের পুনরুক্তি শুনিয়া মোকদ্দমার দিকে আবার মনোনিবেশ করিলেন।

জজ। কে তুমি, তোমার নাম কি?

শৈ। আমার নাম শৈল দেবী।

জজ। যিনি হত হইয়াছেন তিনি তোমার কে ছিলেন?

শৈ। আমার স্বামী ছিলেন!

জজ। তাঁহাকে কে খুন করিয়াছে?

শৈ। আমি খুন করিয়াছি।

"মিথ্যা কথা! আমি হত হই নাই, আমি এই জীবিত রহিয়াছি" বলিয়া আর একব্যক্তি জজ সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার গ্রামবাসীরা চিনিতে পারিয়া একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমাদের বিনোদ!" আবার বিচার গৃহে মহাকলরব পড়িয়াগেল। কেহ কাহারও নিবারণ শুনে না।

আগন্তুক ব্যক্তির নাম, ধাম পরিচয় লইয়া জজ সাহেব মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিলেন। এ মিথ্যা মোকদ্দমা কেন উপস্থিত হইল তাহার তদন্ত করিবার নিমিত্ত অনুমতি করিলেন। বিলাস বাবুকে খালাস দিবার সময় জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ফাঁসি যাইবার নিমিত্ত এত কেন ব্যস্ত হইয়াছিলে?"

বি। ফাঁসিতে আমার বড় ভয়।

জজ। তবে কেন খুন করিয়াছি বলিতেছিলে?

বি। তাহা আমি জানি না।

এইরূপ শৈলকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া দেখেন শৈল সেখানে আর নাই।

মোকদ্দামা শেষ হইয়া গেলে বিলাস বাবুকে সঙ্গে লইয়া সুরগ্রামবাসীরা অপরাহ্নে আপনাদিগের গ্রামাভিমুখে যাইতেছে, এমত সময় মাঠের মধ্যে একজন সঙ্গী বলিল, "বুঝি শৈল আসিতেছে।" সকলেই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল সত্যই শৈল আসিতেছে। বিলাস বাবু সে দিকে চাহিলেন না। শৈল আর অবগুণ্ঠনবতী নাই, শৈল ফণিনীর ন্যায় সদর্পে ক্রমে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল; একবার তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষও করিল না।

দেখিতে দেখিতে শৈল দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় নদীর কূলে উপস্থিত হইয়া একটি নির্জ্জন কুটীরে প্রবেশ করিল। আর একটি স্ত্রীলোক কক্ষান্তরে গৃহকার্য্য করিতেছিল; শৈলকে ক্লান্ত দেখিয়া ব্যজন হস্তে অতি ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। শৈল শয্যায় বসিয়া স্থিরনেত্রে দীপশিখা দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গিয়াছিলে?" শৈল দীপ দেখিতে দেখিতে উত্তর দিল, "নগরে—সাহেবের কাছে।"

সঙ্গিনী। কেন?

শৈ। মরিবার নিমিত্ত।

স। ও সকল কথা মুখে আনিও না, কোথায় গিয়াছিলে?

শৈ। আমি ফাঁসি যাইবার নিমিত্ত জজ সাহেবের কাছারিতে গিয়াছিলাম; শুনিয়াছিলাম অদ্য একজনের ফাঁসি হবে। তাহাই সেখানে গিয়া বলিলাম—

স। কি বলিলে?

শৈ। যাহা বলিবার।

স। তোমার বলিবার কি ছিল?

শৈ। বলিলাম, "আমি খুন করিয়াছি।"

স। তাহার পর?

শৈ। আর একজন বলিল, হাঁ শৈলই এই খুন করিয়াছে।

স। তাহার পর?

শৈ। তাহার পর আর যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। তুমি দেবতা চিনিতে পার?

স। কে দেবতা দেখেছে যে চিনিতে পারিবে।

শৈ। লোকে বলে দেবতারা এই পৃথিবীতে মনুষ্য হইয়া জন্মান।

স। সেকালে তাহা হইত, এখন আর সেকাল নাই।

শৈল অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কালসাপ কি উদ্ধার হয়?"

স। সাপের আবার উদ্ধার কি?

শৈ। কেন? তুমি কালীয়দমন যাত্রায় শুন নাই?

স। শুনেছি, দেবতায় কি না পারেন। কিন্তু সেকালে দেবতারা সকল করিতেন।

শৈ। অদ্যাপিও করেন, অনেক মনুষ্য মানুষ নহে, দেবতা।

প। হাঁ, মানুষ নাকি দেবতা!

শৈ। তবে কি?

শৈল এই কথাটি চীৎকার করিয়া বলিল। সঙ্গিনী মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন যে, শৈলের চক্ষুর্দ্বয় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে; অতি বিকটভাবে দীপের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। সঙ্গিনী অতি মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "শৈল, ভগিনি, কি দেখিতেছ? অমন করিয়া রহিলে কেন? ছি! দিদি মুখ ফিরাও।" সঙ্গিনী দেখিল শৈল কোন কথাই শুনিতেছে না, চক্ষের পলকও ফেলিতেছে না; চক্ষুর ক্রমে বিকৃতি হইতেছে। সঙ্গিনী অতি ভীতা হইয়া উঠিয়া গেল, কক্ষান্তরে গিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে শৈলের ঘরে অতি উচ্চ হাসি শুনিয়া সঙ্গিনী আবার দৌড়িয়া আসিল; দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখে শৈল শয়ন করিতেছে। সঙ্গিনী চক্ষের জল মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কেমন আছ?"

শৈ। বেশ আছি।

স। বাতাস দিব?

শৈ। দেও।

সঙ্গিনী নিঃশব্দে বাতাস দিতে লাগিল। সকলেই বুঝিয়া থাকিবেন সঙ্গিনী পূর্ব্বপরিচিতা মাধবী।

কাতরা ময়ূরী।

১

নূতন বরষাগমে বিমল গগন,
নব-নীল-মেঘ-দলে ঢাকিত যখন,
দেখেছি পূরবকালে, কাল-জল-ধর-কোলে,
সোহাগে চপলাধনী করিত নর্ত্তন;
তুমিও শিখিনী কত নাচিতে তখন।

২

মাতিয়া প্রেমের ভরে কতই নাচিতে,
ললিত-নিকুঞ্জ লতা চরণে দলিতে,
আমোদে পেকম খুলে, গ্রীবা তুলে হেলে দুলে,
উলটি চন্দ্রক-মালা ঢলিয়া পড়িতে,
ফিরে ঘুরে কাল-মেঘ আবার দেখিতে।

৩

হায়রে কলাপ-বর্তি বন বিলাসিনি!
বল বল এবে তুমি কেনরে মলিনী?
কি হ'য়েছে? কোন্ দুখে—আছরে বিরস মুখে?
হারা'য়েছ কোন্ নিধি? বল বল শুনি,
কেন অনশনে ক্ষয় করিছ পরাণি?

৪

ঐ দেখ সেই মেঘ আকাশের কোলে,
সুনীল-গভীর-বেশে ফিরে দলে দলে;
নবীন-নীরদ-বুকে থাকিয়া পরম সুখে,
সেই ত চপলা বধূ লুকায়ে বিরলে,
থেকে থেকে উকি দিয়া জগত উজলে!

৫

সেই মেঘ সেই তুমি সকলি ত তাই,
তবে বল দেখি, তব কি ছিল কি নাই?
অথবা [illegible] াখা যে কারণে ঝরে আঁখি,
ও মেঘে তোমার আর অধিকার নাই!
তাই বলে উদাসিনী হ'য়েছ সদাই,

শ্রীরাজকৃষ্ণ মিশ্র।
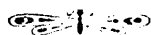
মাসিক পত্র।

আষাঢ়, ১২৮২ ।   [১৫ সংখ্যা।

আমি।

আষাঢ় মাস—নিদাঘের অসহ্য যন্ত্রণায় গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সামর্থ্য অভাবে, আমার পৈতৃক একটী অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহে, দ্বার রুদ্ধ করিয়া একখানি ভগ্ন তালবৃন্তসহায়ে, একখানি চৌকীর উপর শয়ন করতঃ কিছুকাল নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিলাম। ভক্তবৎসলা দেবী আমার ভক্তিমত্তায় প্রীতা হইয়া, পুত্রবাৎসল্যে আমার ক্লেশ দূরীকরণার্থ আমাকে ক্রোড়ে ধারণ জন্য আমার শয্যোপরি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন কিন্তু আমার সুকোমল সুকৃষ্ণ শয্যার সুগন্ধেই হউক, বা তন্নিবাসী কীটাদির মধুর সম্ভাষণেই হউক, অথবা নিদাঘ হইতে শঙ্কা প্রযুক্তই হউক, অগত্যা আমার নিকট হইতে অপসৃতা হইয়া অন্যত্র স্থানান্বেষণে তৎপরা হইলেন। আমি দেবীর অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুন্নমনে কিছুকাল তালবৃন্তখানির সহিত প্রণয় করতঃ একবার মনে মনে চিন্তা করিলাম "এক্ষণে আমি আর কি করিতে পারি?" তখন "আমি" এই কথায় হঠাৎ মনঃ-

ক্ষেত্রে বিকাশ মাত্রই আমার বুদ্ধিহ্রদ তৎক্ষণাৎ একটী অভূত পূর্ব্ব তর্কতরঙ্গে আলোড়িত হইল। তখন আমি, আমিতত্ত্বের মীমাংসায় এককালে অভিনিবিষ্ট হইলাম। আমার সুমার্জ্জিত বুদ্ধি কিছুকাল দর্শনশাস্ত্রে নিয়মিত হইলে, দক্ষিণহস্তভূষণ অঙ্গুলি গুলি আর স্থির থাকিতে পারিল না; তাহারা একসময়েই সকলে কণ্ডুয়িত হইল। আমি তখন অগত্যা লেখনীধারণপূর্ব্বক অঙ্গুলিকণ্ডুয়ন বিনোদন ও আমি তত্ত্বের নিরাকরণ উভয়কর্ম্মই সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই সংসারসমুদ্রে প্রবমান ক্ষুদ্র কীটস্বরূপ মনুষ্যবৃন্দের মধ্যে আমি এই শব্দটী সকলেরই নিকট আদৃত। এসংসারে কি ধনী কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি সুবুদ্ধি কি নির্ব্বোধ, কি রাজা কিপ্রজা,সকলেরই ধারণা যে, আমিই সংসারে একজন, সকলেই জানেন অন্যাপেক্ষা আমি কোন না কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। যিনি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজোপাধিক তিনি জানেন আমি হর্ত্তা, আমি কর্ত্তা, আমি পাতা, আমি বিধাতা; ভোগ্য সকলই আমার, ইহলোকে আমিই একা ভোক্তা; আমি সকলেরই উপাস্য,ভূলোক আমার উপাসক মাত্র। মহাত্মা মন্ত্রীমহাশয় জানেন, আমারই সুবদ্ধিপরিচালিত হইয়া এই রাজ্য পরিপালিতা হইতেছে; এই কোটী২ জীবের আমি তত্ত্বাবধারক, আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধির অবিষয়ীভূত এ ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নহে, ইহলোকে আমিই এক জন। এই যে সিংহাসনারূঢ়, ছত্রদণ্ডধারী, যাঁহাকে লোকে প্রধান পুরুষ জ্ঞান করিয়া থাকে ইনি কেবল আমার ক্রীড়া পুত্তলিকা মাত্র। আমি ইচ্ছানুসারে ইঁহাকে নাচাইতেছি, ফিরাইতেছি, ঘুরাইতেছি, উঠাইতেছি, বসাইতেছি, শোয়াই-তেছি; যখন ইচ্ছা করিব তখনই কল বন্ধ করিয়া কলের পুতুল কর্দ্দমে নিক্ষেপ করিব। মদোদ্ধত, মহাবীর, অস্ত্রশস্ত্রে সুনি-

পূর্ণ প্রয়োগ সংহারবেত্তা, রণদক্ষ সেনাপতি মহাশয় জানেন আমারই বাহুবলরক্ষিত হইয়া এই বিশাল রাজ্য মনুষ্য বাসোপযোগী হইতেছে। আমি না থাকিলে রাজা প্রজা এই নাম কোথায় অন্তর্হিত হইত। এই সমাজসাগরে আমিই একটী ভাসমান ভেলা স্বরূপ, আমাকে অবলম্বন করিয়াই সকলে এই অকূল সাগরের কূল প্রাপ্ত হইতেছে অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ। আবার বিচার কর্ত্তা কি দণ্ডপ্রণেতা মহাশয় জানেন আমিই সমাজের মূলভিত্তি; আমি লোকের ধন মানের রক্ষক, আমার প্রযুক্ত নীতি উদ্ভাবিত না হইলে সংসারের কোন মঙ্গলই সাধিত হইত না। আতপতণ্ডুলভোজী দেশীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানেন, "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন" সেও আমি। ঐরূপ পুরোহিত জানেন গ্রহের বিঘ্নবিনাশক আমি। অপর, কৃষক ভাবে রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, সকলের অন্নদাতা আমি। জোলা ভাবে, লোকে অন্নদাতাই হউন, আর যাহাই হউন, দুনিয়ার আক্রদার আমি অর্থাৎ এজগতে আমিই লজ্জানিবারণ। আর চৌকিদারের ত কথাই নাই, তাঁহার স্ত্রী সমাজের প্রধান আমি। এইপ্রকারে রাজা হইতে ক্ষুদ্র প্রজা কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই জানেন সংসারে আমিই একজন।

এই আমি শুদ্ধ একালে আমাদিগেরই মধ্যে প্রচলিত নহেন। ইনি সর্ব্বকালে সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই আশ্রয় করিয়াছেন। কোনং স্থলে কোন কোন মহাত্মার ব্যবহৃত আমি শব্দ আবহমান কাল ভূমণ্ডলে অতুল্য বলিয়া আদরিত হইতেও দেখা যাইতেছে। মহাভারতে অর্জ্জুনকে উপদেশকালীন শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্ব ঘটেই আমি" এই বাক্য প্রতিপাদনার্থ যে বাক্য গুলিন বলিয়াছেন, তাহা ইহলোকে অদ্যাপি ভগবদ্গীতাখ্যা ধারণানন্তর ভারতোজ্জ্বল করিতেছে। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত মধ্যেও আমি শব্দের অভাব

নাই; এ সকলে কোথাও "সোঽহং" কোথাও "শিবোঽহং" ইত্যাদি মূর্ত্তিতে আমি বিরাজমান। পুরাণকর্ত্তা বেদব্যাসও "আমিই সাক্ষাৎ নারায়ণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর অধমতারণ পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ দেবও সেদিন নবদ্বীপে ভক্তমহলে "মুক্তিসেই" বলিয়া প্রেমের ধ্বজা উড়াইয়াছেন; আরও যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও আমি ছাড়া নহে; তাই বলিতেছি এই আমি কেবল আমাদের আমি নহে, ইহা সকল সময়ে সকলেরই আমি।

সময়ান্তরে এই আমিতে অবস্থান্তরও সংঘটিত হইয়াছে; যেদিন বিখ্যাত ভ্রমণকারী কলম্বসের মনে "আট্‌লাণ্টিকের পারে আছে" উদিত হইয়া, কথা রাজসমক্ষে প্রস্তাবিত হইলে তিনি উপহাসভাজন হন, সেদিন তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, আমি ইহা আবিষ্কার করিব, সেই এক আমি। ব্রাহ্মণের অত্যাচার-পীড়িত ভারতবাসীদিগকে অবলোকানন্তর বৌদ্ধদেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "ইহাদের দুঃখবিমোচন আমি করিব" সেও এক আমি। আর একবার পরশুরাম বলিয়াছিলেন, পৃথিবী আমি নিঃক্ষত্রিয়া করিব, সেও এক আমি। এইরূপ নানাস্থানে নানা মূর্ত্তিতে বিরাজিত নানা প্রকার আমি।

বর্ত্তমান সময়ে আমরাও আমি মন্ত্রের মূর্ত্তি বিশেষের উপাসনা করি। আমাদিগের মধ্যে প্রথমে লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিতে করিতে যবন কর্ত্তৃক বঙ্গ আক্রান্তের সম্ভাবনা দেখিয়া ভবিষ্যদ্বেত্তাদিগের নিকট "যবনেরা বঙ্গ অধিকার করিবে" শ্রবণ মাত্রই চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া উচ্চরবে মহাপুরুষের ন্যায় বলিলেন যে, "আমি বৃদ্ধ, আমি কি করিব, আমার যুদ্ধোদ্যোগ সম্ভবে না, আমি পলায়ন করি।" তাহাও এক আমি। যখন সপ্তদশ যবন কর্ত্তৃক রাজপুরী আক্রান্ত শুনিয়া, রাজার পলায়নের

পর পাত্র মিত্র সকলেই তৎপথাবলম্বী হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন যে, "অগ্রে আমি অগ্রে আমি" তাহাও এক প্রকার আমি। আর এই যে বঙ্গীয় যুবক মহোদয়ের সহিত একটি কর্ম্মের প্রার্থনায় কহিতেছেন "আমি বি এ, আমি এম এ, আমি এত সার্ভিস করিয়াছি, আমি এত কাগজ লিখিতে সক্ষম, আমি এত পথ অতিবাহনে পটু," ইহাও অসামান্য আমি। আমাদিগের বর্ত্তমান মহাপুরুষের মধ্যে কেহ কেহ কোন উপায়ে রাজপুরুষের নিকট প্রাপ্ত ভারত নক্ষত্র, রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, আখ্যা ধারণানন্তর মনে করেন যে," আমি" অসাধারণ সেও এক আমি। আর কেহ কেহ কোন সুযোগে কোন প্রধান লোকের সহিত একাসনে উপবেশন বা একত্রে দুই চারিপদ ভ্রমণানন্তর মনে করেন যে, "কৃতকৃতার্থ আমি" তাহাও এক আমি। কেহ কেহবা কোন উপায়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কোন ইংরেজ স্বাক্ষরিত, দুই চারি অঙ্গুলি পরিমিত, একখানি কাগজ বাক্সবন্দী করিয়া মনে ভাবেন "ভারতমধ্যে একজন আমি" তাহাও আমি। কোন কোন মহাত্মা কষ্টে স্বষ্টে অন্যলিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলনানন্তর একটি প্রবন্ধ সংবাদ পত্র মধ্যে প্রকাশ করণানন্তর মনে করেন "মহাপুরুষ আমি" তাহাও আমি। এতদ্ব্যতীত কেহ সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া আমি, কেহ নাটক লিখিয়া আমি, কেহ কাহাকে গালি দিয়া আমি, কেহ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া আমি, কেহ দুই চারি পাত ইংরেজি পড়িয়া আমি, কেহ না পড়িয়া তাহা ছুঁইয়াই আমি, কেহবা কিছু না করিয়া কেবল কাহারও প্রসাদা দুই চারি গ্রাশ ব্রাণ্ডী টানিয়াই আমি। আরও নানাপ্রকার আমি আছে। তন্মধ্যে এইযে বেলা আড়াই প্রহরের সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে লেখনী হস্তে বামকরতলোপরি বাম গণ্ড স্থাপিত করণানন্তর কি লিখিব কি লিখিব মনে ভাবিতে

ভাবিতে বৃথা মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছি ইহাও এক অপূর্ব্ব আমি। অদ্য আর অধিক আমিতে কাজনাই; কেবল আমার-মত আমি দিগকে আমি আর একটি কথা বলিয়া বেদব্যাসের বিশ্রাম করিয়া, আমার স্বরঞ্জিত হংসপুচ্ছ লেখনীর বিশ্রাম-সাধনে প্রবৃত্ত হই।

ভাই আমির দল! তোমরা আমি আমি অভিমান কর তাহাতে হানি নাই, এবং কেহ তাহাতে অসন্তুষ্টও নহে। কিন্তু ভাই! এই আমি আর এক প্রকারে ভাব দেখি—ভাব দেখি পরোপকারে আমি একজন। যখন দেখিতে পাও তোমার সম্মুখে কোন ক্ষুধাতুর অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া তোমার নিকট কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রর্থনা করি-তেছে,তুমি তখন বিনা কটাক্ষে সেস্থান পরিত্যাগ না করিয়া,ভাব দেখি যে, আমি ইহাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান করি, ভাব দেখি যে একাত্মস্বরূপ সমদুঃখসুখ এ—এবং আমি। যখন দেখিতে পাও কোন আশ্রয়হীন,রুগ্ন পথপ্রান্তে নিপতিত হইয়া করুণ স্বরে,পরি-দেবিতাক্ষরে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে, তখন ভাব দেখি, আমি সাধ্যমত ইহার সাহায্য করি, ভাব দেখি ইহার শুশ্রুষাবিধান করি, ভাব দেখি একাত্মস্বরূপ সমদুঃখ সুখ এ—এবং আমি। যখন দেখিবে দেশমধ্যে হীনাবস্থগণ উন্নত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উত্যক্ত, পীড়িত, অপহৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দীনভাবে উপায়ান্তর বিরহে ক্ষুণ্ণমনে বিলাপপরায়ণ হইতেছে, তখন একবার তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাহাদের দুঃখ নিবারণে বদ্ধপরি-কর হইয়া, ভাব দেখি যে, একাত্মস্বরূপ সমদুঃখ সুখ এ—এবং আমি। হে আমিভাবাপন্নগণ! এইরূপ আমিই আমি; এ আমিতে কাহার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে আমি বিদ্বান্, আমি বুদ্ধিমান্, আমি কৃতকর্ম্মা, আমি ক্ষণজন্মা, আমি মান্য, আমি ধন্য, এরূপ আমি আমি নহে।

আর একটি কথা। ভাই! সকল কার্য্যেই আমি আমি কথাটী ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ভাই, ইহা অপেক্ষা আর একটি বড় ভাল কথা আছে। কথাটী তোমার ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু কথাটী বড় মিষ্ট। আর তোমার ব্যবহৃত আমি কথার সহিত প্রভেদও অল্প। এক বার আমি এই কথার স্থলে আমরা উচ্চারণ করিয়া দেখ দেখি। দেখ দেখি কত সুখী হইবে। একবার উচ্চরবে বল দেখি আমরা বাঙ্গালি, আমরা বঙ্গদেশ বাসী, আমরা সাহসহীন, তেজোহীন, বিদ্যাহীন, আমরা বিদেশীয়ের উপহাসভাজন, আইস আমরা আমাদিগের কলঙ্ক দূরীভূত করি, আইস বাঙ্গালি নাম পৃথিবীতে আদরণীয় করি, আইস ভাই ভাই জ্ঞান করিতে শিখি, আইস মায়ের সুপুত্র হই, আইস মায়ের মুখোজ্জল করি, আইস আমি ছাড়িয়া সকলে একবার আমরা বলিতে শিখি।

কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানের প্রতি জনক জননীর স্নেহ, নায়ক নায়িকার বিশুদ্ধ প্রণয়, সখিত্ব, প্রভৃতি সকলই পর্য্যায়ক্রমে তাহাতে বর্ণিত আছে। তাহা একবার শুনিলেই অনেককে অশ্রুপাত করিতে হয়। যেমন কীর্ত্তনের কবিত্বশক্তি অতুল্য, তদ্রূপ কীর্ত্তনের সুরও অতুল্য। যদি কীর্ত্তনের গীত না গাইয়া শুদ্ধ সুর গাওয়া যায়, তাহাহইলেও হৃদয় আর্দ্র হয়। আবার তাহাতে যদি কথা যুক্ত করিয়া গাওয়া যায় তাহাহইলে ত কথাই নাই। আপনি যে কথা সর্ব্বদা ঘরে বাহিরে শুনিতেছেন, তাহা যদি

কীর্ত্তনস্বরে গীত হয়, তবে সে কথা যে ভাবে সেই সুরে গীত সুরে হইবে, সেই ভাব আপনার হৃদয়ে অবিকল চিত্রিত করিবে। কবিত্বের ক্ষমতা এই যে, যখন যেমন ভাবে ইহা লিখিত হয়, অবিকল সেই ভাব পাঠক কিম্বা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে চিত্রিত করে। এই ক্ষমতা যতদূর কীর্ত্তনে দেখিতে পাওয়া যায়, ততদূর আধুনিক অন্য কোন পুস্তকে কিম্বা গীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুরেরও কার্য্য কবিত্বের ন্যায়। কবিত্বশক্তি যেমন যে ভাবে লিখিত হয়, পাঠকের মনে তদনুরূপ ভাব অঙ্কিত করে, সুরও তদ্রূপ যে ভাবে গীত হয় শ্রোতৃগণের মনে তদনুরূপ ভাব উদ্দীপন করে। আবার মনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থার সহিত স্বতন্ত্র সুর গীত হয়। মন যখন আনন্দিত, সে সময়ের সুর স্বতন্ত্র; যখন দুঃখিত, সে সময়ের সুর স্বতন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক গীতপ্রণেতৃগণ তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আনন্দিতাবস্থার সুর দুঃখিতাবস্থায় দুঃখিতাবস্থার সুর আনন্দিতাবস্থায় গান করায় সে গীত তাহাতে কবিত্ব থাকিলেও বিষময় বলিয়া বোধ হয়। কীর্ত্তন গীতপ্রণেতৃগণ সুবিবেচক ও মার্জ্জিতরুচি ছিলেন। তজ্জন্য কীর্ত্তনে উক্ত প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

"সখীরে" এ কথাটি আপনি কতবার শুনিয়াছেন, আর শুনিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু ইহা কীর্ত্তন সুরে রোদনাবস্থার গীত গীত হইলে আপনি অবশ্য কাঁদিবেন। প্রথমে না কাঁদিলেও আপনার রোদনের উদ্যম হইবে, পরে তাহাতে বাক্যসংযোজনা হইলে ("সখীরে সো মুখ চাঁদ") আপনার হৃদয় উছলিয়া উঠিবে—হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিতে থাকিবে—শরীরের মাংসপেশী, অস্থি, শিরা সকল মধ্যে "সখীরে সো মুখ চাঁদ" ধ্বনিত হইবে। আবার তাহাতে বাক্যসংযোগ হইলে আপনার মনের ভাব পূর্ব্বা-

পেক্ষা বলবান হইবে; আপনাপনি নয়ন ভেদ করিয়া অশ্রু বাহির

যতরূপ রাগিণী সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের গানের নিমিত্ত বিখ্যাত সঙ্গীতবেত্তৃগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কীর্ত্তনের তাহা নহে; কীর্ত্তন যে সময় গীত হউক না কেন, যে ভাবে গীত হইবে, সেই ভাবে মন অধিক আকৃষ্ট হইবেক। আকাশ গর্জ্জিতেছে; ভ্রমর কৃষ্ণঘনক্রোড়ে চঞ্চলা খেলিতেছে; কৃষ্ণাম্বরা যামিনী; মেঘ ফাঁক করিয়া দুই একটি তারকা সুন্দরী উঁকি মারিতেছে, এ সময় কীর্ত্তন গাও; আপনার মন আকৃষ্ট হইবে। মধ্যাহ্ন সময়ে মার্ত্তণ্ড ময়ূখজাল প্রধাবিত; সূর্য্যকিরণে বসুন্ধরা হাসিতেছে; কীর্ত্তন গাও; তোমার মন আকৃষ্ট হইবে। তুমি খট্টায় নিদ্রিত; বসন্ত মরুৎ পুষ্পদাম দোলাইয়া তাহার সৌরভ তোমার নাসিকায় আনিয়া দিতেছে; যামিনী-সুষুপ্তা; এসময় কীর্ত্তন গাও; যদি সে ধ্বনি কিঞ্চিন্মাত্র তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তুমি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিবে। কিন্তু উপরোল্লিখিত সময়ে অন্য কোন সুরের গান গায়িলে বোধ হয় তোমার তত দূর মিষ্ট লাগিবে না।

শোকসন্তপ্ত লোকদিগের যত দূর কীর্ত্তন ভাল লাগে এত দূর তোমার আমার ভাল লাগে না। তাহার কারণ শোকাতুর ব্যক্তিরা কাঁদিয়া তাহাদিগের শোকের শমতা করিতে ইচ্ছা করে। কীর্ত্তন কাঁদাইবার গীত, সুতরাং শোকাভিভূতের অন্তর্দ্দেশে যে শোকবহ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে, তাহার অনুরূপ সে বাহ্যিক দেখিতে পায়, দেখিবামাত্র কাঁদিয়া ফেলে। তাহার তখন অভিনেতৃদিগের দুঃখ হৃদয়ে স্পষ্ট অঙ্কিত হয়। তৎকালে কীর্ত্তন যতদূর তাহার হৃদয়গ্রাহী হয়, ততদূর তোমার আমার

হইবে না। সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে যতদূর চিত্রিত হইবে তত-দূর তোমার আমার হৃদয়ে কখনই হইবে না।

কথিত আছে কীর্ত্তনের সুর কৃষ্ণের প্রপৌত্র কর্ত্তৃক রচিত হয়, এবং মহাদেব কর্ত্তৃক গীত হয়। এই গীত শ্রবণনিমিত্ত কৈলাসে সুরগণ কৈলাসাধিপতি কর্ত্তৃক সভাতলে আহুত হন। সেই সভার মধ্যে স্বয়ং মহাদেব উপবিষ্ট হইয়া গীতারম্ভ করেন। অনন্ত অমরাবতী বিধূনিত করিয়া, মন্দাকিনী উছলিয়া, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোকাদি কম্পিত করিয়া মহাদেবের সুর উঠিল। গীত শুনিয়া দেবগণ নিস্তব্ধ, ক্রমশঃ সকলেই জল হইয়া গেলেন। স্বয়ং মহাদেবের হস্ত হইতে সপ্ততন্ত্রী বীণা খসিয়া পড়িল। রজত আসন হইতে দেবাদিদেব নিম্নে পতিত হইলেন; রজতগিরিসন্নিভ কলেবর অচেতন; জটাভার আলুলায়িত; ফণিপাশবদ্ধ শার্দ্দূল চর্ম্মাম্বর খসিয়া পড়িল। কীর্ত্তন যে কতদূর মিষ্ট তাহা এই গল্প প্রমাণ করিবে।

আমরা বলিয়াছি, কীর্ত্তনে জননীর স্নেহ, নায়ক নায়িকার অনুরাগ, সখিত্ব, ইত্যাদি নানাবিধ ভাব পরিপূর্ণ মিষ্ট গীতি আছে। এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে এক একটি গীত কত দূর মিষ্ট বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য আমরা কতক গুলি গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

জননীর স্নেহ ও সখিত্ব আধুনিক কীর্ত্তনে আছে। পুরাকালীন কবিদিগের কীর্ত্তনে তাহা নাই। সুতরাং সে সকল গীত আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিব না। প্রথমে একটি শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ গীত দেখুন।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥

রাই এমন কেনে বা হৈল।
গুরু দুরু জন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল।
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসাঞা পরে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়য়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা।

আর্য্যজাতির চিত্রপট।

দেবীর বরণ।

বিজয়া দশমীর দিন কোন ভাগ্যবান্ বঙ্গবাসীর গৃহিণী আপন কন্যা ও পুত্রবধূ সঙ্গে লইয়া গিরীশনন্দিনীকে বরণ করিবার নিমিত্ত চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সকলেই ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া মৃত্তিকায় বসিলেন। আজি শ্রীশ্রীদুর্গার বিসর্জন—আজি বৎসরের মত ৮ চণ্ডীমণ্ডপ আঁধার হইবে। আজি গৃহস্থের মন বৎসরের মত নিরানন্দ হইবে এই ভাবিয়া গৃহিণী নয়নের জলে ভাসমানা। ক্ষণপরে অঞ্চলের দ্বারা চক্ষুর জল মুছিয়া একতান মনে ভক্তিভাবে ভগবতীর পাদপদ্ম ধ্যান পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনী ও পুত্রবধূও পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। সকলেই কল্যাণ কামনার পর প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মানা হইয়া দেবীর মূর্ত্তি ও চিত্রপট দেখিতেছেন। নন্দিনী জননীকে সম্বোধন করিয়া চালচিত্রের পুত্তলিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল মা, ঐ যে কতকগুলি দেবকন্যে কতকগুলি মুনিকন্যে কতকগুলি রাজকন্যের মাঝখানে

একটি দুঃখিনী মেয়ে মড়ার মত পড়িয়া রহিয়াছে তাহার শিয়রের কাছে বসে এক রাজরাণীর মত যে কে কাঁদিতেছে, ও কোন দেবতা জানিস্।

জননী—সবজানি মন দিয়ে শোন। সতী পতিনিন্দায় আপন শরীর পাত কল্যেন তবু পতি নিন্দে সহ্য কত্তে পাল্যেন না। যাঁর চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্যে দেখ্‌লি তিনি প্রসূতি, সতীর মা। আর আর দেবকন্যে মেয়ে মানুষগুলি, যারা বিরস মনে, দুঃখিত ভাবে অবাক্ হয়ে রয়েছে তারা সতীর বোন।

নন্দিনী—মা সতীর পতি নিন্দে কে কল্যে?

জননী—বাছা, সে অনেক কথার কথা এক দণ্ডে সারবার যো নেই রাত্রিতে সব বল্‌ব।

পুত্রবধূ ননদিনীর হস্তধারণ পূর্ব্বক আস্তে২ কহিল ওদিকে দেখ এক দেবতার মুখ ছাগলের মত। ঠাকুরুন্‌কে জিজ্ঞাসা কর্ না ভাই?

নন্দিনী—মা ঐ যে ও পাশে ছাগল মুখো ও কোন দেবতা?

"বাছা তুই দেখ্‌ছি আজি আমায় অন্তঃকরণ স্থির করে একবার মা দুর্গার পাদপদ্ম ধ্যান কত্তে দিলি নে। তোরা ঠাকুর দেখ আমি একবার মাদুর্গার রাঙ্গা পাদুখানি বুকের মাঝে রাখি মনের মাঝে তুলি, সমুদায় প্রতিমে খানির ছবি মনে করে নিই।" এই বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এই বারে গললগ্নীকৃতবাসা ও ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন "মা দুর্গে দুর্গতিহারিণি পতিতপাবনি ভবভয়ভঞ্জিনি মা মুকতুলে চেয়ো এদাসীর মনস্কামনা যেন সিদ্ধি হয়।"

"বৌমা ঠাকুর বরণ কর গিরিবালা আঁচল দিয়া মা দুর্গার মা লক্ষ্মীর মা সরস্বতীর, কার্ত্তিক ও গণেশঠাকুরের পাদপদ্ম মুছিয়ে বৌমার আঁচলে বেধে দে।"

গৃহিণী—পুত্রবধূর প্রতি—মা আহ্লাদীর মেয়ে কিছু জান না। আগে কি বরণের কুলো নেয়, আগে ঠাকুরের কপালে সিন্দুর দিতে হয়, হাতে পানের খিলি সন্দেশ দিতে হয়। কার্ত্তিক গণেশের চখে কাজল দিতে হয়, সকলের হাতে পান সন্দেশ দিতে হয়। তবে বরণ করে।

গিরিবালা। মা, আমি আগে বরণ করি।

জননী। না তোর আগে বরণ কত্তে নেই।

গিরিবালা। কেন মা।

জননী। বৌমা ঘরের লক্ষ্মী। আমার লক্ষ্মী আমার পুত্রের বৌ পাবে। তুই তোর শ্বাশুড়ীর লক্ষ্মী পাবি, তাই আগে তোর বরণ কত্তে মানা আছে। যার বৌ না থাকে তার লক্ষ্মী তার মেয়ে পায়। এখন তুই বরণ কর। বরণের পর হুলাহুলী ধ্বনি হইল। বাদ্যকরগণ শোকসূচক বিসর্জনের বাদ্য বাজাইল। সকলের চক্ষু পুনর্ব্বার জলে প্লাবিত হইল। চক্ষু মুছিয়া আবার প্রতিমার দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হইল।

নন্দিনী—মা বল্‌না কে ঐ ছাগল মুখো দেবতা।

জননী। উনি দক্ষরাজা। সতীর বাপ। শিবের শ্বশুর—উনি সতীর পতিনিন্দে করেছিলেন বলে সতীর শাপে ছাগল মুণ্ড হয়ে আছেন। পতিপ্রাণা সতী কি সুন্দর কি অমায়িক পতিভক্তি দেখিয়েছেন দেখ দেখি। আর অতগুলি দেবকন্যে দেখ্‌ছিস সতীর রূপের কাছে ইহারা কেউ কি দাঁড়াতে পারিত, কদাচ না; কেবল পতি নিন্দা সহ্য কত্তে না পেরে কালীমূর্ত্তি হয়ে গিয়েছেন। চিত্তির কর কেমন এঁকেছে। আহা সাক্ষাৎ পতিব্রতা ধর্ম্ম যেন ঐ খেনে জাজ্বল্যমান রয়েছে।

নন্দিনী। মা দক্ষরাজা কেন জামাই নিন্দে কল্লেন।

ছাগল মুণ্ডু হোলো লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা কচ্চে না—এঃ চেয়ে যে মরণ ভাল।

জননী। দক্ষরাজ দেবতা, লোকে তাঁরে প্রজাপতি বলে। চন্দ্র তাঁর জামাই। সাতাইশটী মেয়ে ঐ দেখ একবারে চন্দ্রকে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। কশ্যপ মুনিও তার একজন জামাই। ইহার সঙ্গে তেরটী মেয়ের বিয়ে দেন। তাঁহারা সতীর পার্শ্বে বসে রোদন কচ্চেন। সতী সকল বোনদের মধ্যে বয়সে ছোট। দক্ষরাজার ছোট জামাই শিব। দক্ষ মনে কল্যেন যজ্ঞ কর্বোন শিবকে নেমন্তন্ন দেবেন না সতীকে যজ্ঞের সময় আনবেন না। ত্রিসংসারে সকলের নেমন্তন্ন হোলো—কেবল শিব ও সতীর নেমন্তন্ন হলো না।

নন্দিনী—সতী ও শিবের অপরাধ কি যে নেমন্তন্ন হোলো না?

জননী—ঘরে খাবার নেই বলেই বাদ দেওয়া হোলো। বিশেষ জামাই পাগল ছত্রিশকোটী দেবতা ঝি বৌ নিয়ে সেজে গুজে এসে আমোদ প্রমোদ কর্ব্বে; আপনার জামাই এমন সময় পাগলামী কল্যে পাছে মনে ক্লেশ ও রাগ হয় বোল্যে আগেই একেবারে নেমন্তন্ন বাদ হয়েছে।

নন্দিনী—বেশ, বিনি নেমন্তন্নে সতী কেন গেলেন?

জননী—কেন গেলেন তা শোন।

রোহিণী প্রভৃতি ভগিনীগণ আসিয়া কহিলেন সতী চল যজ্ঞ দেখিতে চল বিলম্ব কচ্ছো কেন। কৈ তোমার ত কোন সাজ-গোজ দেখ্‌ছিনে। সতী কহিলেন দিদী তোমাদের ভগিনী-পতিকে বাবা পাগল বলে নেমন্তন্ন দেন নাই। তা কেমন করে যাব তাঁর অপমান করে যেতে পারিনে। রোহিণী প্রভৃতি সাতাইশ ভগিনী একবাক্যে কহিলেন বাবা ভুলে গিয়ে থাকবেন

তা না হলে সংসারে কাকেও বল্‌তো বাকি নেই কেবল ছোট জামাইকে ভুল হবে তা কদাচ হতে পারে না। সতী কহিলেন আমরা ভিক্ষে করে খাই ছাই ভস্ম মাখি ষাঁড়ের পিঠে চড়ে বেড়াই দেখে বাবার ঘৃণা হয়েছে তাই নেমন্তন্ন দেন নাই। দিতি, অদিতি, কদ্রু, বিনতা প্রভৃতি ভগিনীগণ আসিয়া কহিলেন তুই আমাদের ছোট বোন না তোরে না দেখলে মনের খেদে বাঁচবেন না কত আপশোষ কর্ব্বেন। বাপমার কাছে মেয়ের আবার মান অপমান কি, গেলেই হলো—বাবা ভুলে গিয়ে থাক্‌বেন, মা জান্‌তে পেলে এমনটা হতো না। তা যা হউক পিতার যজ্ঞ দেখ্‌তে যেতে হইবে। সতী কহিলেন আচ্ছা পিতা গ্রাহ্যি করুন বা না করুন আমি মেয়ে, আমার কাজ আমি কর্ব্বো বিনি আভানে যাব। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যাব না। শিবের অনুমতি নিয়ে যাব। তোমরা যাও।

সতী শিবকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া দক্ষযজ্ঞ দেখিতে যেতে অনুমতি পেলেন।

আহা কিরূপ দেখিলাম! দেখ ষাঁড়ের উপর ঐ যে ত্রিনয়নী জটাভার এলিয়ে পোড়েছে সোণার বরণ যেন পুড়ে গিয়েছে। মুখখানি বাসি পদ্মের মত শুকিয়ে গিয়েছে মনে কি ভাবিতেছেন।

কি আশ্চর্য্য চিত্তির করেছে। বোধ হচ্ছে যেন এ শরীরে মন প্রাণ নেই, তা যেন শিবের কাছে রেখে বাপ মার সামগ্রী অঙ্গখানি তাঁহাদিগকে দিতে যাচেন। আমরি কি ভাব দিয়েছে।

দক্ষরাজের সম্মুখে যেমন সতী উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন পোড়াকপালে বাপ অমনি বল্যেন তুই হতভাগী এখানে কেন। তুই বিধবা হ, তখন তোরে প্রতিপালন করিব। সে হতভাগা পোড়াকপালে গাঁজাখোর পাগলকে নিমন্তন্ন দিই

নাই তবু তোকে পাঠিয়েছে, বেটার মান অপমান কিছু বোধ নাই। সতী আর পতিনিন্দে সহ্য করিতে না পেরে কানে আঙ্গুল দিলেন। দক্ষকে কহিলেন, পিতঃ! আমার সাক্ষাতে শিবের নিন্দে করো না। সংসারে স্ত্রীজাতির পক্ষে—এই বলিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। তথাপি দক্ষ নিন্দা করিতে লাগিলেন। সতী অমনি পিতাকে শাপ দিলেন, পিতঃ! যে মুখে তুমি আমার পতি নিন্দা কল্যে যদি আমি পতিব্রতা হই তবে অবিশ্যি তোমার ও মুখের শাস্তি হইবে। তোমার মুখ যেন—এই বলিয়া সতী দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

শিব সতীর দেহ পরিত্যাগ সমাচার পেয়ে দক্ষের বাড়ী এসে সতীর জন্যে অনেক খেদ কল্যেন। ভূত প্রেতগণ দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে গেল। দক্ষের প্রাণবধ করিল। প্রসূতি সতীশোকে পতি-শোকে কাতর হয়ে মহাদেবের কাছে দাঁড়ালেন। স্তব স্তুতি কত্তে লাগলেন। মহাদেব প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হয়ে আবার দক্ষের প্রাণদান কল্যেন,কিন্তু পতিব্রতা সতী যা বলেছিলেন তা অন্যথা হলো না। নন্দী একটা ছাগলের মাতা বসিয়ে দিলে।

পতিব্রতা সতী সাধ্বীর নিকট তার পতিনিন্দা কল্যে কি হয় তাই সংসারের লোককে দেখাবার জন্যে দক্ষরাজ ছাগমুণ্ড নিয়েছেন। লজ্জা হয়েছে বৈ কি, কিন্তু কি করেন লোক রক্ষা কত্তে হবে ত। যে আপনি বিধি দেয় সে যদি আপনি আপনার কথার মত কাজ না করে তবে লোকে তাকে মান্‌বে কেন। দক্ষরাজা আপনি শাস্ত্র করেছেন। স্ত্রী লোকের পতিসেবা বড় ধর্ম্ম যে ব্যক্তি পতির নিন্দা করে তার মুখ দর্শন কত্তে নেই। দক্ষরাজও ভাবিলেন যেমুখে পতিব্রতা সতীঝির অন্তরে বেদনা দিইছি, সে পাপ মুখ পরিত্যাগ করাই উচিত বলে ছাগমুণ্ড নিয়ে একপ্রকার চুপচাপ করে আছেন।

নন্দিনী—তুমি যা যা বল্লে ঠিক যেন এখনি হোচ্ছে কি চমৎকার পট লিখেছে। ঐ দেখ মুনি ঋষি দেব দানব অসুর কেউ সুখী নেই সকলেরই মুখচূণ হয়ে গিয়েছে। সব ভয়ে জড়সড়। ঐ দেখ ভূত প্রেত গুলা দক্ষরাজের কি দুর্গতি করেছে। মহাদেবের মন যেন ভেঙ্গে গিয়েছে তার শরীর যেন প্রাণ শূন্নিকরে চিত্তির করেছে। আবার দক্ষরাজের যজ্ঞনাশে মহাদেবকে যেন প্রলয়-ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি করে চিত্তির করেছে। বোধ হচ্ছে আধখানি অঙ্গ নেই আধখানি মূর্ত্তি একেবারে প্রলয় কালের আগুন, জটাগুলা যেন বজ্রের মত শব্দ কচ্ছে, আর যেন অনবরত বিদ্যুতের আগুন বেরুচ্ছে। পাঁচটামুখ কি ভয়ঙ্কর, বাপ! যেন সংসারটাকে একেবারে গ্রাস কর্ত্তে বসেছে। মা, সতী শিবকে বড় ভালবাসিতেন না।

জননী—বাছা, কেবল একজনের ভালবাসায় ভালবাসার আঁট বসে না। স্বামী স্ত্রীর পরস্পর ভাব চাই।

নন্দিনী—সুয়ামীর ভালবাসা আগে।

জননী--তাত হবেই—মেয়েমানুষ ত স্বামীকে ভাল বাসবেই স্বামীছাড়া পৃথিবীতে স্ত্রীর আর কি ভালবাসার জিনিস আছে. ---দেখ দেখি মহাদেব মহামায়াকে কত ভাল বাসেন। দেখ মহাদেব মহামায়ার শরীরটে নিয়ে কি কাণ্ড কচ্যেন দেখনা এখনও ভুল্‌তে পারেন নাই। প্রণয়ের জিনিস কোন খানে রেখে ঠিক থাক্‌তে পাচ্চেন না।

শান্তিজল গ্রহণ।

চিত্রপট দর্শনে পিতৃভক্তির উদ্রেক।

এক্ষণে শুভক্ষণ শুভলগ্ন শান্তির সময় হইয়াছে সমুদায় পরিবার ও আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব দিগকে ডাক। পুরোহিত

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদেশ অনুসারে সকলেই ৺ চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত। সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনাপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভূমিতেই উপবিষ্ট হইলেন। স্ত্রীজনেরা প্রতিমাপার্শ্বে সম্পর্ক বিবেচনায়, বয়ঃক্রম বিবেচনায় যথারীতি বৃদ্ধাগণকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া পা ঢাকিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি কোলে করে বসিলেন; পুরুষগণ ও কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক বালকগণ প্রতিমার অপরপার্শ্বে বসিলেন।

পুরোহিত ঠাকুরমহাশয় দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযুগল সংযত করিয়া ভক্তিভাবে দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিসর্জন দিতে মন যে একান্ত অনিচ্ছুক ও সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে সেই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অনবরত অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এখন সকলের মনেই কেমন এক অপূর্ব্ব ভাব জন্মিয়া গেল, সকলেই হতাশ। ভাবুকমাত্রেরই হৃদয়ে শোক উপস্থিত হইল নয়ন হইতে অবিরত বারিধারা পতিত হইতে লাগিল।

পুরোহিত আবার সম্বৎসর পরে দেবীর আগমন প্রার্থনার মন্ত্রটী পাঠ করিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। এখন ভাবুকের মনে, ভক্তের মনে, স্নেহবান্ ব্যক্তির মনে প্রবোধ জন্মিল। সংসারের লোকে বুঝিল ক্ষণেক সুখ ক্ষণেক দুঃখ নিরন্তর সুখ নাই নিরন্তর দুঃখও নাই। আশা ও প্রবোধ এই দুই বস্তুদ্বারা মানবমন আবৃত আছে। নতুবা মানবমন যে প্রকার ক্ষণভঙ্গুর ইহাকে এক নৈরাশ্যই সঞ্চূর্ণ করিয়া ফেলিত।

পুরোহিত নীরাজনবিধি সমাপ্ত করিয়া শান্তিজল দ্বারা সকলের মস্তক সেচন করিলেন। তাঁহার মুখবিনির্গত শান্তি-শব্দ ও স্বস্তি শব্দগুলি যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপস্থিত মানব মণ্ড-

লীর অন্তঃকরণে প্রবেশ করিল। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। সকলেই আহ্লাদে গদ্‌গদ। সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীকে প্রণাম পুরঃসর আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্ত্রীজনেরা ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

পুরোহিত ঠাকুর ছাত্রগণকে নূতন পাঠ দিবেন। শক্রোত্থা-নের পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য-সন্তানগণের পাঠ বন্ধ হয়। এখন যেমন কালেজের ও স্কুলের ছেলেরা পরীক্ষার অবসানে ছুটীর পর আসিয়া যে পাঠ আরম্ভ করে, তাহাকে নূতন পাঠ বলিয়া ধরে, তেমনি শাস্ত্রব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্যসন্তানগণ ভাদ্রমাসে যখন শক্রোত্থান হয় তখনি আর পাঠ করে না। অবকাশ গ্রহণ করে সেই অবধি দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত নূতন পাঠ পড়ে না। বিজয়া দশমীর দিন হইতে আবার নূতন পাঠ আরম্ভ করে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছাত্রগণকে রামায়ণের পাঠ দিলেন। সকলেই পুনর্ব্বার গণেশের ও সরস্বতীর বন্দনা করিয়া অধ্যা-পকের চরণগ্রহণ করিলেন। পরে সকলেই যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, সাদরসম্ভাষণ, আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক প্রতি-মার চিত্রপট দেখিতে লাগিলেন।

একটী ছাত্র আর একজন প্রবীণ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিল দাদা ঐ যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রী রামকে হাত নেড়ে যেন কি বারণ করিতেছে উনি কে, আমাকে বল না।

বয়োজ্যেষ্ঠ—উনি কৌশল্যা রামের জননী। রাম পিতাকে সত্যব্রত রাখিবার জন্য রাজ্যভোগ বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন স্বীকার করিয়াছিলেন। জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। কৌশল্যা বারণ করিতেছেন। চিত্র দেখে আমার বোধ হচ্চে যেন কৌশল্যা কথা কহিতেছেন। রামকে

বনে যাইতে নিষেধ কচ্ছেন। রাম যেন উত্তর করিতেছেন পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। কৌশল্যা যেন বলিতেছেন পিতা অপেক্ষা মাতা গৌরবে সহস্র গুণ অধিক। রাম যেন কহিতেছেন পিতা আবার জননীর গুরু সেই হেতু পিতৃ আজ্ঞা মাতৃ আজ্ঞা অপেক্ষা বলবতী এইটী দেখাইতেছেন।

কৌশল্যা রামের প্রতি খেদ করিয়া কহিলেন বাছা তোর নিষ্ঠুর রাম নামের মত কাজ কল্লি। আমি আগে জান্‌লে তোর নাম রাম রাখিতে দিতেম না। রেণুকার ছেলে বাপের কথায় মায়ের মুণ্ডুচ্ছেদ করেছিলেন। তুই যদি আমার মাতা কেটে ফেল্‌তিস্‌ তাহল্যে আমার ততদুঃখু হতো না। বাছা দেখ দেখি আজি কোথায় রাজমাতা হব তা না কোথায় আজি পথের ভিখারিণী ও পুত্র শোক হলো এখন আমার মরণই ভাল, এই কথা বলিতে বলিতে শোকসাগর উছলিয়া উঠিল চেতনা লোপ পাইল; আমার জ্ঞান হচ্যে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আমার মরণই ভাল, এই কথা বলিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। তাই পরম দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়াছেন।

ও দিকে আর একটা ছবিতে দেখ কৌশল্যাকে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। চেতনা নাই। আহা! ঐপট খানা কেমন চিত্র করিয়াছে লক্ষ্মণের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতায় সম্প্রীতি থাকেনা। দেখুক এক বার আসিয়া দেখুক রাম লক্ষ্মণে কিরূপ সৌহার্দ্য; জগতে কি এমন আছে! লক্ষ্মণের ছবিটী কেমন চমৎকার করিয়াছে। লক্ষ্মণ যেন রামকে কহিতেছেন স্ত্রীজিত পিতার এরূপ অন্যায় বাক্য কদাচ প্রতি-

পালন করিবার আবশ্যকতা নাই। পিতা ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যাকার্য্য বোধ নাই শাস্ত্রানুসারে এরূপ ব্যক্তির আজ্ঞা প্রতিপালনের আবশ্যকতাই নাই। বরং তাহার ঐ রোগশান্তির চেষ্টা করা উচিত।

ওদিকের আর একখানা পট দেখ। রাম যেন লক্ষ্মণকে কহিতেছেন ভাই আমি তোমার শাস্ত্র মানিলাম কিন্তু আমার মনকে কি প্রকারে প্রবোধ দিব। পিতা যখন বিমাতার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাঁহাকে দুইটী বর দিবেন যদি এখন তিনি না দেন তবে সত্যচ্যুত হইবেন। সংসারে পিতাই সাক্ষাৎ দেবতা। তিনিই এদেহ মন ও আত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা। পুত্রগণ পিতার ছায়ামাত্র; তিনি মিথ্যাবাদী হইলে আমরাও মিথ্যাবাদী হইব। জগতে আমাদিগকে পামর বলিবে। বিশেষতঃ আমি বিমাতার মনে, পিতার মনে, জগতের লোকের মনে খেদ রাখিতে ইচ্ছা করি না। সত্যই পরম ধর্ম্ম আমিও পিতার নিকট ত্রিসত্য করিয়াছি বনে যাইব।

আর একদিকে আর একখানা পট দেখ। রাম ও লক্ষ্মণ মুনিবেশে সীতাসমভিব্যাহারে বনে যাইতেছেন। রামের চরণ ধারণপূর্ব্বক কি কহিতেছেন বুঝিয়াছ?

কনিষ্ঠ ছাত্র—না,—

জ্যেষ্ঠ—রামের শোকে দশরথের মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া রামলক্ষ্মণ সীতাদেবীর নয়ন হইতে অবিরত বারিধারা পতিত হইতেছে। ঐ দেখ ভরত কত অনুনয় বিনয়বাক্যে রামকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রামের মুখ দেখে বোধ হচো রাম কদাচ চতুর্দ্দশ বৎসর মধ্যে রাজ্যগ্রহণ করিবেন না—ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন। ভরত জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া রাজ্যভার গ্রহণে স্বীকৃত নন।

তিনি রামের পাদুকাকে প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া রাজ্যপালন করিতেছেন। আহা কি পরমাশ্চর্য্য রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ দেখ আকৃতি দেখিলে নিশ্চয় বিবেচনা হইবে পৃথিবীতে যদি কেহ জ্যেষ্ঠের প্রতি অনুজের ভক্তি দেখাইবার প্রমাণস্থল চাহে তবে লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের মূর্ত্তি দেখুক সাক্ষাৎ জ্যেষ্ঠভক্তির অবতার দেখিতে পাইবে।

যাহারা পৈতৃক বিভব লইয়া সহোদরের সঙ্গে বিবাদ করে তাহারা দেখুক বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সঙ্গে কত সম্প্রীতি, ভরত ও রাম পরস্পর রাজ্যলোভ বিষয়ে কেমন নিস্পৃহ। পরস্পরের প্রতি কেমন অচলা ভক্তি অমায়িক স্নেহ।

ঐ দেখ পুরু স্বীয় পিতা যযাতিকে আপনার যৌবন প্রদান করিয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়াছেন। পিতৃভক্তি নিদর্শন ঐখানে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অন্য পুত্রগুলি যাহারা পিতৃ আজ্ঞা পালন করে নাই তাহারাও ঐ খানে দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু কি চমৎকার ব্যাপার উহাদিগকে দেখিতে ঘৃণা বোধ হইতেছে। পুরুর জরাদেহকে পরম পবিত্র ও জাজ্বল্যমান ধর্ম্মের অবতার বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। জগতের কেহ যদি পিতৃভক্তির আদর্শ রাখিতে ইচ্ছা করে তবে পুরুর আকৃতি মানসপটে চিত্র করিয়া রাখুক।

পুরু সহস্র বৎসর জরা ভোগ করিবেন এত বড় কঠিন ব্যাপারে পুরুর অন্তঃকরণ কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এমন কি সুদৃঢ় ছবি খানি দেখিলে মনের মধ্যে কত অপূর্ব্ব ভাবই উদয় হয়। দেখ ভাই যতপ্রকার দুঃখ আছে জরা তার অপেক্ষা দুঃখ সংসারে দ্বিতীয় নাই। জরাগ্রস্ত ব্যক্তি জীবন্ মৃতের তুল্য। পুরু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এতাদৃশ সুদীর্ঘ কাল মধ্যে এক দিনের জন্যও পিতার প্রতি

বিরক্ত অথবা অসন্তুষ্ট হন নাই। ব্রহ্মাণ্ডের লোককে পিতৃভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য পিতৃভক্তি স্বয়ং শরীরী হইয়া পুরুরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

শরৎশশী।

(১)

শরতে সোনার শশী কি সুন্দর শোভে রে!
হাসিছে গগনোপরে, পুলকে প্রেমের ভরে,
পূর্ণশশী সুধারাশি হাসি মনোলোভে রে।
সুনীল বিমল নভঃ, ক্ষীণজ্যোতি তারা সব,
শশী-প্রেমালোকে তারা লুকাইছে এবে রে,
শরতে সোনার শশী কি সুন্দর শোভে রে!

(২)

তোমারে শরৎশশী, আমি বড় ভাল বাসি
প্রেমানন্দ-নীরে ভাসি যখনই নেহারি,
কিবা তব রূপরাশি অনম্বর বিহারী!
নিবাইয়া তারকারে, ভাসাইছ প্রেমাসারে,
তোমার গগনদেবে রূপরাজি প্রসারি,
কত শত শুভ্র মেঘ শোভিছে সারি সারি!

(৩)

মরি কি মধুর হাসি হাসিছ গগনে রে,
রজনী হৃদয়ে ধরি, হাসিছ বদন ভরি,
হাসাইছ গিরিবন, ত্রিজগত জনে রে;
প্রতিদিন নানা দেশে, যামিনীরে বধুবেশে,

দেখাইছ অহঙ্কারে প্রফুল্ল আননে রে,
কাঁদিতে হইবে শেষে হাসিছ এখনে রে।

(৪)

আবার প্রাবৃট্-কালে, নবীন নীরদ জালে
মধুর কাঞ্চন কান্তি বপু তব ছাইবে,
প্রচণ্ড পবন শ্বাস অবিরত ধাইবে,
দিন দিন পল পল, ঝরিবে জলদ জল,
যামিনী তোমার আর দেখা নাহি পাইবে।
এদশা তোমার কিন্তু কিছুদিনে যাইবে।

(৫)

আমার এদশা সখে! চিরকাল রহিবে,
অনন্ত জীবন বুঝি এ পরাণ দহিবে;
কাঁদিতেছি অবিরল, ফুরাবেনা অশ্রুজল
দুরন্ত যন্ত্রণা মোর অন্ত কভু নহিবে,
ধরি এ জীবন কাল এ বরষা বহিবে।
শুনিয়াছি এ হৃদয়, কভু সুখ দুঃখ ময়,
এজগতে চিরদিন কিছুই না রহিবে
কেবল আমারি চিত চিরদুঃখ সহিবে।

(৬)

আর কি বরষা গিয়ে শরৎ আসিবেরে?
আমার হৃদয় শশী, হাসিয়া মধুর হাসি
আমার হৃদয়াকাশে আবার ভাসিবে রে!
প্রসারি সুস্নিগ্ধ কর উদিবে গগনোপর?
হাস্‌রে প্রেমের হাসি বড় ভাল বাসিরে
শরতে সোনার শশী! কি মধুর হাসিরে!

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ঘোষ